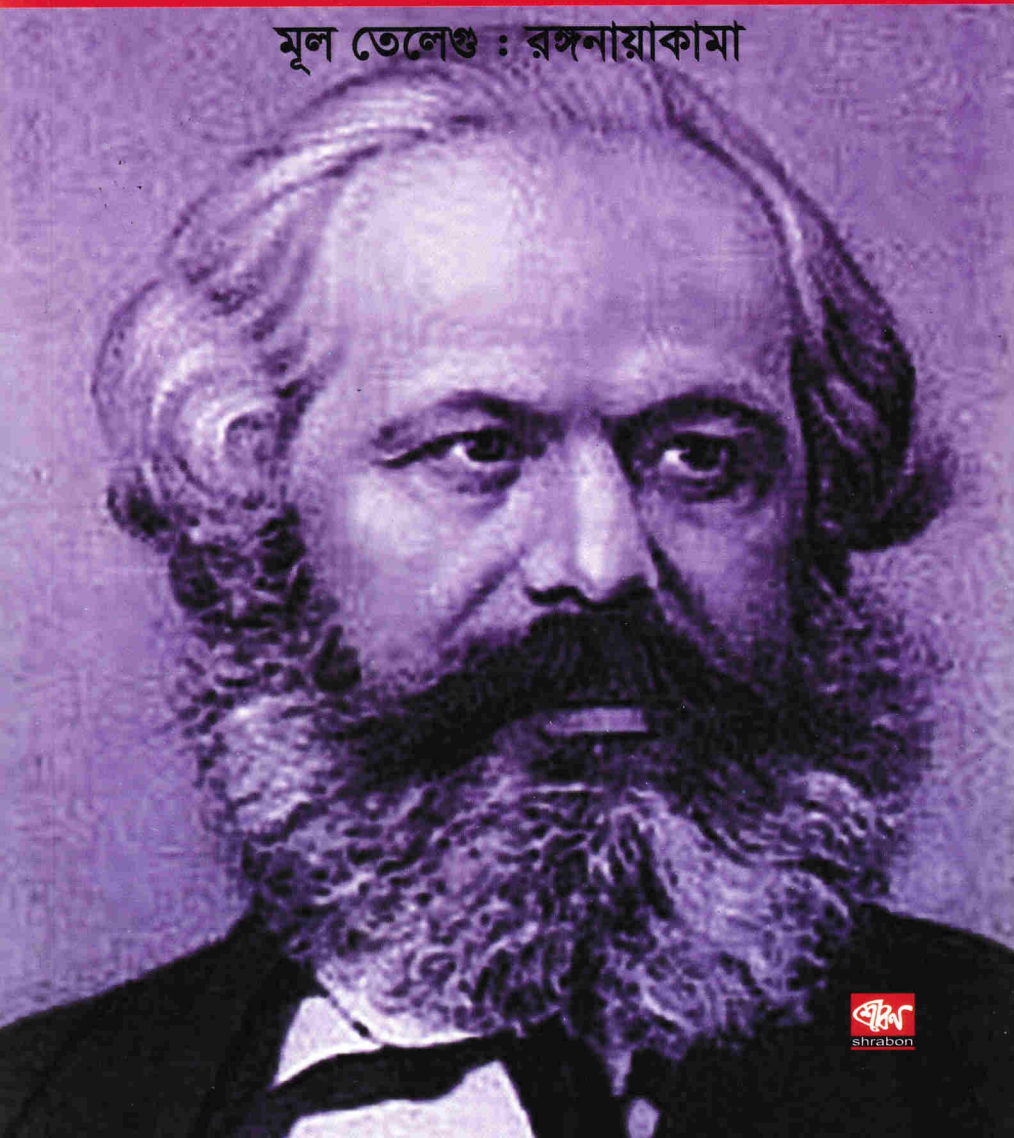
কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল

প্রাথমিক পাঠ

(পুঁজির সহজপাঠ প্রথম খণ্ড)

মূল তেলেগু : রঙ্গনায়াকামা



শ্রাবণ
shrabon

তেলেগুতে এই গ্রন্থ লেখার আগে আরএন ও বাপুজী মিলে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মূল *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের হুবহু তেলেগু অনুবাদ শুরু করেন, যা সমাপ্ত করতে প্রতিটা ২০ পৃষ্ঠার মোট ৭০টা নোট বই লেগেছে, এই কাজ সমাপ্ত করতে তাদের ৭/৮ বছর লেগেছে। তেলেগুতে তখন পর্যন্ত *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ অনুবাদ হয়নি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটা অনুবাদ হয়েছে। প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা এই অনুবাদ করেননি, মাতৃভাষায় বার বার পড়ে *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের মূল চিন্তাকে আত্মস্থ করতেই তারা এটা করেন। ইংরেজি অনুবাদও তারা বহুবার পড়েছেন, এভাবে এই গ্রন্থ যতদূর সম্ভব ভালভাবে আত্মস্থ করেই আরএন *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের প্রাথমিক পাঠ হিসেবে এই গ্রন্থ লেখায় হাত দেন। ভূমিকায় বাপুজী লিখেছেন, আরএন বলছেন– একজন উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এই প্রাথমিক পাঠ পড়ে ভাবতে পারেন, যেসব পাঠক খুব কমই জানেন তাদের কথা মাথায় রেখে এই বই লেখা হয়েছে, খুবই ভাল কথা, কারণ এটা আমার জন্য আনন্দেরই বটে। তবে একজন বোদ্ধা পাঠক যদি মূল ইংরেজি পাঠ পড়ে আরও জানতে চান, সেটা তো ভালই হবে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যেকোন নতুন বিজ্ঞান একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে যেমন একজন অল্পশিক্ষিত পাঠকের কাছেও তেমন। নতুন বিজ্ঞান একজন প্রবীণ বুদ্ধিজীবীর কাছে যেমন, একজন কিশোর ছাত্রের কাছেও তেমন। তাই এমন নতুন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সহজ পাঠ হিসেবে কোন প্রাথমিক পাঠ যদি লেখা হয়, সেটা এই দুই ধরনের পাঠকের কাছেই তো সুবিধাজনক হবে। যে কোনো বিষয় সহজে স্বল্প সময়ে জানতে পারাটাই তো ভালো।

শুরুতেই আরএন-এর বিবেচনায় ছিল কাদের উদ্দেশ্যে, কেন এই গ্রন্থ লিখতে হবে। মাধ্যমিক পাস বা তার নিচের পাঠকদের কথা মাথায় রেখেই তিনি এই গ্রন্থ লেখায় অগ্রসর হন। এক্ষেত্রে আরএন মূল *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে অনুসৃত ক্রমানুবর্তিতা কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। তারা বলছেন, ক্যাপিটাল গ্রন্থের তেলেগু অনুবাদ ও ইংরেজি অনুবাদ তারা বহুবার পড়েছেন, এই প্রাথমিক পাঠও তারা বারবার পড়েছেন এবং সময় পেলে এখনও পড়েন, তবুও যতবার পড়েন মার্কসের এই মহাকৃতি ততই সহজ হয়ে আসে। তাহলে একজন নতুন পাঠকের জন্য ক্যাপিটাল গ্রন্থ আত্মস্থ করতে কীভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে? এটা এক বিশাল প্রশ্ন।

অর্থনীতি

boinews24.com

shrabon prokashani
Since 1996

মূল্য: ২৫০ টাকা

ISBN 978-984-8827-62-8
978-9848827628

Follow us on
Shrabon prokashani

কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল

প্রাথমিক পাঠ

প্রথম খণ্ড প্রথম অংশ

মূল

রঙ্গনায়াকামা

তেলেগু থেকে ইংরেজি অনুবাদ

কে. ভি. আর.

এস. ভি. রাজ্যলক্ষ্মী

বি. আর. বাপুজি

বাংলা অনুবাদ

শেখর রহিম

মূল তেলেগু : রঙ্গনায়াকামা

কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল

প্রাথমিক পাঠ

অনুবাদ : শেখর রহিম

শ্রাবণ
shrabon

কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল : *প্রাথমিক পাঠ*

প্রথম বাংলা সংস্করণ :

ফেব্রুয়ারি, ২০১২

স্বত্ব : অনুবাদক

প্রচ্ছদ অলঙ্করণে

রবীন আহসান

পৃষ্ঠা বিন্যাস : বিবেকান্দ জয়ধর

শ্রাবণ প্রকাশনী

১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৮৬৫১১৬০

www.shrabonprokashani.com
shrabongraphic@yahoo.com

মূল্য : ২৫০ টাকা

US ৮ : ৫

ISBN : 978-984-8827-62-8

An *Introduction* to Marx's `Capital'

(in 3 volumes)

By Ranganayakamma

Volume 1, Part 1

First Published 1999, Published by : SWEET HOME PUBLICATIONS

1-95/1, Guttala Begampeta,

Jubilee Hills Post, HYDERABAD-500 033 (India).

(Phone : 040-311 7302)

উৎসর্গ

আইল্যায় বিধ্বংস্ত সুন্দরবন-সংলগ্ন
কয়রার গ্রামের বাড়িতে নিদারুণ দুর্দশার
জীবন নিয়ে দিশেহারা আমার
ছোট ভাই গফফার, তার মতো
এ দেশের হাজার হাজার প্রলেতারিয়েতের উদ্দেশ্যে

শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা সত্যিকারের রাজনৈতিক চেতনা হয়ে উঠতে পারে না, যদি না প্রত্যেকটি শ্রমিক স্বৈরাচার, অত্যাচার, হিংসাত্মক আচরণ এবং গালিগালাজের **ক্ষেত্রেই**, তা সে **যে-কোন শ্রেণী** সম্পর্কেই হোক না কেন, সাড়া দিতে শেখে।... শ্রমিক সাধারণের চেতনা সত্যিকারের রাজনৈতিক চেতনা হয়ে উঠতে পারে না, যদি না শ্রমিকরা বাস্তব এবং সর্বোপরি জীবন্ত (সমসাময়িক) রাজনৈতিক সত্য এবং ঘটনা থেকে **অন্য প্রত্যেকটি** সামাজিক শ্রেণীকে এবং এই **সমস্ত** শ্রেণীর মানসিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের অভিব্যক্তিকে বুঝতে শেখে; যদি না জনগণের সমস্ত শ্রেণী, স্তর ও দল-উপদলের জীবন ও কর্মের **সমস্ত** দিকগুলোর বস্তুবাদী বিশ্লেষণ ও বস্তুবাদী মূল্য নির্ধারণকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শেখে। যারা শ্রমিকশ্রেণীর মনোযোগকে, তার সমীক্ষা এবং তার চেতনাকে, সম্পূর্ণভাবে কিংবা এমনকি মূখ্যতও, শুধু তারই উপর কেন্দ্রীভূত করে তারা বিপ্লবী নয়; কেননা এর আত্মোপলব্ধি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে আধুনিক সমাজের সমস্ত ধরনের বা স্তরের শ্রেণীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপূর্ণ স্বচ্ছ উপলব্ধির সঙ্গে। এ উপলব্ধি আসবে রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে। তত্ত্বগত উপলব্ধি বলার চাইতে একে বাস্তব উপলব্ধি বলাটাই আরও সঠিক হবে। ...বিপ্লবী হতে গেলে একজন শ্রমজীবীকে অবশ্যই জমিদার, পুরোহিত, উঁচুদরের রাজকর্মচারী, কৃষক, ছাত্র এবং ভবঘুরে– এদের প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিষ্কার ছবি এঁকে রাখতে হবে মনের ভেতরে, কোথায় তাদের শক্তি এবং কোথায় দুর্বলতা সেটাও নিশ্চয় জানতে হবে তাকে, যে সব ধরতাই বুলি এবং প্রবঞ্চনাময় যুক্তির ছদ্মাবরণে প্রতিটি শ্রেণী তার স্বার্থপর প্রচেষ্টা এবং তার সত্যিকারের 'অন্তরটাকে' **ঢেকে রাখে** সেগুলোকে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে তাকে। নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন আইন কোন কোন স্বার্থকে প্রতিফলিত করে এবং কীভাবে করে সেটারও 'পরিষ্কার ছবি' বই থেকে মেলে না, মেলে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর ঘটনাগুলোর স্বরূপ-উদ্ঘাটন থেকে, আমাদের চারিপাশে এক সময়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর অনুধাবন করে; বিশেষ ঘটনা, সংখ্যাতথ্য, আদালতের দণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদির অর্থ কী তার ওপর হয়তো প্রত্যেকেই যার যার নিজের মতো ফিসফিসিয়ে আলোচনা করছে চারপাশে, সে সবের তৎপর অনুধাবনের মারফত।

—ভ. ই. লেনিন, *কী করিতে হইবে? কালেক্টেড ওয়ার্কস* (প্রথম প্রকাশ, ১৯০২)
রুশ ৪র্থ সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১২-৪১৩

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি : রঙ্গনায়াকামা ৯
ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশনার কথা ১১
ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে ১৩
প্রথম বাংলা সংস্করণের পূর্বভাষ ১৫

প্রথম অংশ
পণ্য এবং অর্থ

অধ্যায় এক
পণ্যের দুই উপাদান ৩৫
১. ব্যবহারিক মূল্য ৩৫
২. বিনিময় মূল্য ৩৯
৩. শ্রম পরিমাপের মাধ্যম কী? ৪৭
৪. জিনিস তৈরিতে ব্যয়িত 'মোট শ্রম' বলতে কী বুঝায়? ৪৭
৫. 'সামাজিক' শ্রম সময় এবং 'গড়' শ্রম সময় ৫১
৬. শ্রম কোথায় থাকে? ৫৬

অধ্যায় দুই
শ্রমের দ্বৈত চরিত্র যে শ্রম পণ্য উৎপাদন করে ৫৮
১. মূর্ত শ্রম ৫৮
২. বিমূর্ত শ্রম ৬৩
৩. বিভিন্ন শ্রমের মধ্যে সমতুল্যতা ৬৪
৪. জিনিস উৎপাদন এবং পরিভোগের জন্য কেবলমাত্র ব্যবহারিক মূল্য পরিমাপের প্রয়োজন হয়, কিন্তু মূল্য নয় ৬৫
৫. 'মূল্য' অর্থ একমাত্র 'শ্রম'! কিন্তু, 'শ্রম' অর্থ মূল্য বোঝায় না!! ৬৮
৬. জিনিস এবং পণ্য ৭০
৭. উৎপাদনশীলতা কী? ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময় মূল্যের সাথে এর সম্পর্ক কী? ৭২
৮. সামাজিক শ্রম সময় এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যকার সম্পর্ক ৭৬
৯. 'শ্রম বিভাজন' কথাটার অর্থ কী? কোথায় এর অবস্থান? ৭৭

অধ্যায় তিন
মূল্য রূপ ৮৫
১. কীভাবে আমরা একটা জিনিসের শ্রমকে দেখতে পাব? ৮৫
২. মূল্যের পরিমাণ ৯৩

অধ্যায় চার
মূল্যের প্রাথমিক রূপ ৯৬
১. মূল্যের প্রাথমিক রূপের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটা বিষয় ১০০

২. গুণগত সমতুল্যতা ১০১
৩. পরিমাণগত সমানুপাতিক রূপ ১০২
৪. মূল্যের 'প্রাথমিক' রূপের সীমাবদ্ধতা ১০৩

অধ্যায় পাঁচ
মূল্যের 'সম্প্রসারিত' রূপ ১০৪
১. মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের কয়েকটা দিক ১০৫
২. মূল্যের 'সম্প্রসারিত' রূপের সীমাবদ্ধতা ১১০

অধ্যায় ছয়
মূল্যের 'সাধারণ' রূপ ১১৪
১. মূল্যের সাধারণ রূপের কয়েকটা দিক ১১৭
২. 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'-এর অপর্যাপ্ততা 'মূল্যের সাধারণ রূপ'-এ কীভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়? ১২৫

অধ্যায় সাত
মূল্য রূপের 'আপেক্ষিক' এবং 'সমতুল্য' দিকের ক্রমবিকাশ ১৩২

অধ্যায় আট
অর্থ রূপ ১৩৭
১. অর্থ সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় ১৩৯
২. 'মূল্য'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধান ১৫৫

অধ্যায় নয়
পণ্যের পৌত্তলিকতা ১৬১

অধ্যায় দশ
পণ্য সঞ্চলন ১৭৯
১. অর্থের ভূমিকা ১৮০
২. পণ্যের সঞ্চলন ১৮২
৩. অর্থের 'চলাচল' ১৮৮
৪. 'সঞ্চলন মাধ্যম'-এর পরিমাণ ১৯০
৫. মুদ্রা এবং মূল্যের প্রতীক ১৯৮
৬. অর্থ সঞ্চয়ন ২০৪
৭. 'পরিশোধ মাধ্যম' হিসেবে অর্থের ভূমিকা ২০৭
৮. বিশ্বজনিন অর্থ ২১৩

পরিশিষ্ট-১ ২১৫
পরিশিষ্ট-২ ২১৮

লেখক পরিচিতি
রঙ্গনায়াকামা

ভারতের বিখ্যাত নারীবাদী রঙ্গনায়াকামা আরএন নামেই বেশি পরিচিত। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিম গোদাবাড়ি জেলার বোমিডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক একটা ছোট্ট প্রেস এবং সামান্য কিছু জমিই ছিল আয়ের একমাত্র অবলম্বন, তখন আরএন-এর পরিবার বসবাস করতো অন্ধ্রের মফস্বল শহর টাডিপালিগুডেম-এ। এখানকার এক স্কুল থেকে তিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে এসএসএলসি পাশ করেন। পরিবারের পক্ষে দূরের কলেজে পড়ানোর খরচ চালানো সম্ভব হয়নি, তাই এখানেই তার প্রাতিষ্ঠানিক লেখা-পড়ার সমাপ্তি ঘটে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় প্রথা মতে তার বিয়ে হয়, কিন্তু তার বিবাহিত জীবন টিকে ছিল মাত্র ১২ বছর। এর পর থেকে তিনি নিজের মতো করেই সন্তানদের নিয়ে হায়দেরাবাদ শহরে বসবাস করছেন। উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখার মধ্য দিয়েই তিনি লেখালেখির জীবন শুরু করেন। এ পর্যন্ত তার সমগ্র রচনা ৬০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

বাড়ির কাছেই ছিল মহিলাদের একটা লাইব্রেরি, পরিবারটা গরিব হলেও বাবার কারণে বাড়িতে ছিল পড়ার পরিবেশ, আরএন ৭-৮ বছর বয়সে এই লাইব্রেরি থেকে উপন্যাস ও বিভিন্ন গল্পের বই এনে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেল, ছোট্ট আরএন এভাবে পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লো। বাবা নিজের প্রেস থেকে 'পদ্মনয়াকা পত্রিকা' বের করতেন, ধর্মীয় এই পত্রিকায় বাবারই অনুপ্রেরণায় ছোট্ট আরএন-এর লেখা ছাপানো শুরু হলো।

সেদিনের সামন্তীয় পারিবারিক প্রথা মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিল, তাকে অস্বীকার করে আরএন সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বতন্ত্র পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন। এভাবে তিনি শৈশব থেকেই হয়ে ওঠেন এক ভিন্ন ধারার মানুষ, যিনি সেই ছোট বয়স থেকেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছেন। আরএন এভাবে লেখক হয়ে ওঠেন।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম উপন্যাস 'কৃষ্ণভেনি' প্রকাশিত হয়, এর আগে তার লেখা প্রধানত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'বালিপিথাম' উপন্যাসের জন্য তিনি অন্ধ্র প্রাদেশিক সরকারের সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পান, কিন্তু প্রথাবিরোধী আরএন সরকারি এই পদক নিতে অস্বীকৃতি জানান। স্বশিক্ষিত

এই লেখিকা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের লেখার সাথে পরিচিত হন। এভাবে তিনি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মার্কসবাদ চর্চা এবং প্রচারকে একমাত্র কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। একজন মার্কসবাদী হিসেবে তিনি তার ইতিপূর্বেকার লেখাগুলোর পূনর্মূল্যায়ন করে একটা গ্রন্থ লিখেছেন, যেখানে তিনি তার আগের চিন্তার ঘাটতিগুলোকে চিহ্নিত করেছেন এবং অনেক গ্রন্থ ছাপানো বন্ধ করে দিয়েছেন। জনপ্রিয় 'কৃষ্ণভেনি' উপন্যাস এর মধ্যে অন্যতম।

একজন মার্কসবাদী হিসেবে তিনি মূলত মার্কসের মৌলিক শিক্ষাকে সহজ ভাষায় তুলে ধরার কাজকে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছেন। মার্কসবাদী সকল মহলে, বিশেষ করে, সাধারণ কর্মী-পাঠকের কাছে তার লেখা অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলো এতই জনপ্রিয় যে, কোন কোন গ্রন্থ সপ্তম সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *For the Solution of the 'Caste' question, Budha is not enough, Ambedkar is not enough either, Marx is Must* এবং পাঠকের নানা প্রশ্নের যেসব উত্তর তিনি বিভিন্ন সময়ে দিয়েছেন, সেসব নিয়ে লেখা দু'টো গ্রন্থ – *Scientific Outlook : Some Questions and Answers* এবং *Questions of Readers and Answers of Ranganayakamma*।

তিনি মূলত তেলেগু ভাষাতেই লিখে থাকেন। অনেক ভক্ত পাঠক সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে তার অনেক গ্রন্থ ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেছেন, ফলে আমাদের পক্ষে সেসব গ্রন্থ পড়া সম্ভব হচ্ছে।

তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো : *1. Ramayana, The Poisonous Tree, 2. Emancipation of Janaki, 3. From Inequality to Inequality, 4. Freedom of Women, 5. Personlity Cult : Is It Necessary for Revolution? 6. Atheism : An Examination, 7. Atheism, Rationalism and Radical Humanism, 8. House Work and Outside Work 9. What is Marxism?, 10. Fight with the Shadow, 11. Is it Critical Examination or Deceptive Examination, 12. Does Mother not have a Sunday, 13. Greater than Love* এবং *14. Domestic servants are also human beings*

ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশনার কথা

বইটা তিন খণ্ডে (ভলিউম) প্রকাশিত হলো, প্রতি খণ্ডে রয়েছে দুইটা অংশ। **মি. এম. শ্রীহরি রায়** এই তিন খণ্ড প্রকাশনার সকল খরচ দিয়েছেন। শ্রীহরি রায় পেশাগত ভাবে একজন জেনারেল সার্জন, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী।

পনের বছর আগে (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) তিনি আমাকে একটা চিঠিতে জানান, তিনি আমার বই পড়ছেন আর বইগুলো তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তার জগতে একটা পরিবর্তন ঘটিয়ে দিচ্ছে; মার্কসবাদ বুঝতে তাকে সাহায্য করছে। পরবর্তী চিঠিগুলোতে তিনি প্রস্তাব দেন প্রয়োজন হলে আমাদের 'অর্থনৈতিক সাহায্য' দেবেন। আমি তাকে লিখেছিলাম এই মুহূর্তে ওই ধরনের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে না।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আমি An *Introduction* to Marx's 'Capital'-এর তেলেগু সংস্করণের সব খণ্ড একসাথে প্রকাশের চেষ্টা করছিলাম, তখন আমি অর্থ সংকটে পড়ি। আমার লেখা এই বইয়ের তেলেগু সংস্করণ প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৭৮ খিস্টাব্দে। এই সংকটে পড়ে আমি শ্রীহরি রায়কে সুদমুক্ত ঋণের জন্য জানালাম। কিন্তু, তিনি বললেন সাহায্যটা তিনি ধার হিসেবে দিতে চান না, এই বইয়ের সবগুলো খণ্ড প্রকাশের যাবতীয় খরচ বহন করার দায়িত্ব নিতে চান। আমি রাজি হয়ে গেলাম, কারণ তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন এবং এই ধরনের খরচ বহন করার মতো সামর্থ্যও তার রয়েছে। যেহেতু এই খরচ তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম বই বিক্রির টাকা দিয়ে পরবর্তী সংস্করণগুলোর মুদ্রণের কাজ করবো। অত্যন্ত কম খরচে তেলেগু সংস্করণ আমরা বের করেছি এবং বইয়ের দামও কম রেখেছি। এভাবে এই বইয়ের মুদ্রণ-পুনর্মুদ্রণের সমস্যা সমাধান করেছি। এই সাহায্য না পেলে, প্রতি সংস্করণে আমাদের মুদ্রণ-ব্যয় সংগ্রহের জন্য অনেক জায়গায় ঘুরতে হতো। এভাবে আমরা ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তেলেগু সংস্করণের ১ম খণ্ড দুবার; ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড একবার প্রকাশ করতে পারি। ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আমি এই বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের চিন্তা করি। আমার মনে হয় মার্কসের *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের মূল ইংরেজি পাঠ পাঠকের পক্ষে বুঝে ওঠা বেশ

কঠিন। আমি আমার চিন্তা শ্রীহরি রায়কে জানালে তিনি ইংরেজি সংস্করণের খরচও বহন করতে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান।

কোনো ব্যক্তি একটা মতবাদ বিশ্বাস করতে পারেন, যদি তিনি এই মতবাদের জন্য কিছু করেন যা তার সামর্থ্যে কুলায়, তাহলেই সেটা একটা 'মহান' কাজ হয়ে যায় না। তিনি কেবলমাত্র তার দায়িত্ব পালন করলেন, তিনি যেটা বিশ্বাস করেন তার কিছুটা করলেন। কিন্তু, বর্তমানে সমাজে টাকার কাছে কোন দায়িত্ব বা পছন্দ টিকতে পারছে না। এমত অবস্থায় কোন ব্যক্তি ভাল কাজে যদি টাকা খরচ করেন, নিশ্চয় সেটা হবে একটা 'মহান' কাজ। তাই আমার মনে হয়েছে শ্রীহরি রায়ের এই অবদানের কথা পাঠককে জানানোটা আমার কর্তব্য।

আমরা পাঁচ খণ্ডের তেলেগু সংস্করণ ইংরেজি অনুবাদে তিন খণ্ডে প্রকাশ করছি। বর্তমান বাজার দরের চেয়ে অনেক কম দাম ইংরেজি সংস্করণের প্রতিটা খণ্ডের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য পাঠকের কাছে এগুলো সহজে পৌঁছে যাক।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ **রঙ্গনায়াকামা**

ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে

এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার, কারণ মূল ভাষা এবং অনুবাদের ভাষার মধ্যে উৎসমূলে অর্থাৎ জন্মসূত্রে কোন সম্পর্ক নেই। বাক্যগঠন, শব্দার্থতত্ত্ব ও ভাষারীতির দিক থেকে এই দুটো ভাষার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পার্থক্য। ফলে অনুবাদকদের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ব্যাকরণ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য বা নিয়ম-বিধির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো হলো : পদাশ্রিত নির্দেশক (আর্টিকেল), পদান্বয়ী অব্যয়, সাহায্যকারী ক্রিয়া, কাল এবং ক্রিয়ারূপ, বাচ্য, সংযুক্ত প্রশ্ন, সংযোজক অব্যয়, পদক্রম, বাক্যের দৈর্ঘ্য এবং ধরন।

মূল ভাষার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ভাববাচ্যমূলক (পরোক্ষ উক্তিমূলক) একটা বাক্যও নেই, অথচ এ ধরনের বাক্য বাদ দিয়ে ইংরেজি অনুবাদ সম্ভব নয়। আরেকটা বিশেষ দিক হলো মূল লেখিকা বইয়ে 'পুঁজিপতি' শব্দটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেলেগু 'ভাদু' (vaaDu) শব্দটা ব্যবহার করেছেন, এক্ষেত্রে তিনি তেলেগুতে চালু এমন অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক সর্বনাম রূপ (তৃতীয় পুরুষ, পুংলিঙ্গবাচক, একবচন) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইংরেজিতে এই শব্দরূপ ব্যবহার করা হয় না। যেহেতু এই শব্দরূপ ইংরেজিতে নেই, আমাদেরকে একটা মাঝামাঝি এবং নরম রূপ হিসেবে 'he' ব্যবহার করতে হয়েছে। কিছু জায়গায় আমরা 'that fellow' অথবা 'that guy' ব্যবহার করেছি।

শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হলো : বক্তব্যের বিন্যস্তকরণ, আলঙ্কারিক প্রকাশ-শৈলী – যেমন : শ্লেষাত্মক ভাব প্রকাশ, ইডিয়ম, রূপক-রূপম-উৎপ্রেক্ষা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি; বিশেষণ এবং ক্রিয়া-বিশেষণের সঠিক ব্যবহার, পরিমাপ ও ওজনের একক, বচন ও সংখ্যা, সঠিক নাম, জীব বৈচিত্র্য, পাখি ও গবাদি পশু, সংস্কৃতি-সংশ্লিষ্ট বিশেষ শব্দাবলি এবং এমন আরও কিছু বিষয়।

মূল তেলেগুতে ভাষার বৈচিত্র্য আনতে 'আধুনিক কথ্যরীতি'র ব্যবহার রয়েছে, আর এক্ষেত্রে অনুবাদে বৈচিত্র্য আনতে দক্ষিণ ভারতীয় ইংরেজি উপ-প্রকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য ভারতে অনেক ধরনের ইংরেজি উপ-প্রকরণ ব্যবহৃত

হয়ে আসছে। ইংরেজি অনুবাদে যথাবিধি বাক্যগঠন এবং শব্দার্থতত্ত্বের ক্ষেত্রে মূল ভাষাকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্র প্রদেশের কাবেলীতে অবস্থিত জওহর ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক **মি. কে. ভি. আর. (কে. ভি. রামানা রেড্ডি)** অবসরে যাওয়ার পর প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের ইংরেজি অনুবাদের খসড়া প্রস্তুত করেন। **কেভিআর** মূল তেলেগুর প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ অনুসারে ইংরেজি অনুবাদ করেন।

যখন আমরা ইংরেজি অনুবাদ চূড়ান্ত করে এনেছি, ইতিমধ্যে প্রথম খণ্ডের চতুর্থ তেলেগু সংস্করণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় তেলেগু সংস্করণ বাজারে এসে গেছে। **কেভিআর** তখন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, যার স্মৃতি আমরা আজও ভুলতে পারিনি। **এস. ভি. রাজ্যলক্ষ্মী** অন্ধ্র প্রদেশের গুনটুরে বসবাস করেন, রঙ্গনায়াকামার বইয়ের একজন ভক্ত পাঠক, তিনি কেভিআর-এর ইংরেজি অনুবাদকে সর্বশেষ প্রকাশিত তেলেগু সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখার দায়িত্ব নেন। এভাবে কেভিআর-এর খসড়ায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

এর পর পরই মূল লেখিকা সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের লেখায় ব্যাপক সংশোধন আনবেন, যা তিনি অতি দ্রুততার সাথে করে দেবেন, যাতে করে আমাদের পক্ষে সেই সংশোধিত তেলেগু সংস্করণ অনুয়ায়ী ইংরেজি অনুবাদ করা সম্ভব হয়। এই সর্বশেষ তেলেগু সংস্করণ অনুসারে আমাকে ইংরেজি অনুবাদের খসড়ায় অনেক জায়গায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে।

ইংরেজি খসড়া অনুবাদ চূড়ান্ত করার পর, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের *Centre for Applied Linguistics and Translation Studies* এর অধ্যাপক **মি. প্রবাল দাসগুপ্ত**-কে ইংরেজি অনুবাদের ভাষাগত (ব্যাকরণ এবং শব্দার্থগত দিক থেকে) সঠিক বিষয়গুলো দেখে দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করি। প্রবাল প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে দিয়েছেন। ইংরেজি অনুবাদকে আরও মূলানুগ ও সাবলীল করতে তিনি আমাদেরকে অনেক বিষয়ে বলেছেন, ফলে এই অনুবাদ আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। মূল লেখিকা এবং প্রবালের সাথে আলোচনা করেই আমি এই অনুবাদ চূড়ান্ত করেছি।

প্রয়োজনীয় সংশোধন সত্ত্বেও, বর্তমান অনুবাদে এখনও অনেক ত্রুটি থেকে যেতে পারে, যার কারণ ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অসর্তকতা। তাই এখনও যেসব ত্রুটি রয়ে গেছে, সে জন্য আমিই ব্যক্তিগত ভাবে দায়িত্ব নিচ্ছি।

বি. আর. বাপুজী

প্রথম বাংলা সংস্করণের পূর্বভাষ

মার্কসের *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের পুরো নাম– '*ক্যাপিটাল* : পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিচারমূলক বিশ্লেষণ'। রঙ্গনায়াকামার (আরএন) তেলেগু ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থ 'Capital' Parichayam (An *Introduction* to Marx's 'Capital'), মার্কসের *ক্যাপিটাল*-এর হুবহু অনুবাদ নয়। পাঁচ খণ্ডের এই গ্রন্থ তিনি *ক্যাপিটাল*-এর সহজ পাঠ হিসেবে লেখেন, ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এগুলো প্রকাশিত হয়। পরিচিত ও প্রচলিত সহজ ইংরেজি শব্দ ও সরল বাক্য ব্যবহার করে আরএন-এর এই গ্রন্থকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করা হয়েছে, যা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, প্রতি খণ্ডে রয়েছে দু'টো অংশ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৯৭২ (১ম খণ্ড –পৃ. ৬৪০, ২য় খণ্ড –পৃ. ৭৬০, ৩য় খণ্ড –পৃ. ৫৭২)। আমরা প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ বাংলায় প্রকাশ করছি। সবগুলো খণ্ডই আমরা বাংলায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ব্যাপক খরচবহুল এই কাজ পাঠকের সাহায্য ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। সীমাহীন পরিশ্রম ও বিশাল পরিমাণ অর্থ খরচ করে কলকাতার বাণীপ্রকাশ মার্কসের মূল *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণের প্রথম তিন খণ্ডের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেছে, যেখানে রয়েছে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৬৭। দীর্ঘ ১১ বছরের নিরলস শ্রমই বাংলা এই অনুবাদকে সম্ভব করেছে, প্রত্যক্ষভাবে তিন জন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং পরোক্ষভাবে অনেকের ভূমিকা এই প্রকাশনার পেছনে রয়েছে। মার্কসবাদ আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে এটা একটা বিশাল কাজ, যা অনেক আগেই সম্পন্ন হওয়া দরকার ছিল। এই বাংলা অনুবাদ হাতের কাছে থাকায় আমাদের পক্ষে আরএন-এর গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করা অনেক সহজ হয়েছে।

আরএন-এর গ্রন্থের প্রতিটা অধ্যায়ের শেষে রয়েছে প্রশ্নমালা। এই প্রশ্নমালা এবং **বি. আর. বাপুজীর** লেখা ভূমিকা বাদে এই গ্রন্থের সবকিছুই এই বাংলা অনুবাদে রয়েছে। বাপুজীর লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভূমিকার মূল চিন্তার সাথে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে এই পূর্বভাষ লেখা হয়েছে।

তেলেগুতে এই গ্রন্থ লেখার আগে আরএন ও বাপুজী মিলে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মূল *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের হুবহু তেলেগু অনুবাদ শুরু করেন, যা সমাপ্ত করতে প্রতিটা ২০০ পৃষ্ঠার মোট ৭০টা নোট বই লেগেছে, এই কাজ সমাপ্ত করতে তাদের ৭/৮ বছর লেগেছে। তেলেগুতে তখন পর্যন্ত *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ অনুবাদ হয়নি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটা অনুবাদ হয়েছে। প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা এই অনুবাদ করেননি, মাতৃভাষায় বার বার পড়ে *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের মূল চিন্তাকে আত্মস্থ করতেই তারা এটা

করেন। ইংরেজি অনুবাদও তারা বহুবার পড়েছেন, এভাবে এই গ্রন্থ যতদূর সম্ভব ভালভাবে আত্মস্থ করেই আরএন *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের প্রাথমিক পাঠ হিসেবে এই গ্রন্থ লেখায় হাত দেন। ভূমিকায় বাপুজী লিখেছেন, আরএন বলছেন – একজন উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এই প্রাথমিক পাঠ পড়ে ভাবতে পারেন, যেসব পাঠক খুব কমই জানেন তাদের কথা মাথায় রেখে এই বই লেখা হয়েছে, খুবই ভাল কথা, কারণ এটা আমার জন্য আনন্দেরই বটে। তবে একজন বোদ্ধা পাঠক যদি মূল ইংরেজি পাঠ পড়ে আরও জানতে চান, সেটা তো ভালই হবে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, যেকোন নতুন বিজ্ঞান একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে যেমন একজন অল্পশিক্ষিত পাঠকের কাছেও তেমন। নতুন বিজ্ঞান একজন প্রবীণ বুদ্ধিজীবীর কাছে যেমন, একজন কিশোর ছাত্রের কাছেও তেমন। তাই এমন নতুন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সহজ পাঠ হিসেবে কোন প্রাথমিক পাঠ যদি লেখা হয়, সেটা এই দুই ধরনের পাঠকের কাছেই তো সুবিধাজনক হবে। যেকোন বিষয় সহজে স্বল্প সময়ে জানতে পারাটাই তো ভাল।

শুরুতেই আরএন-এর বিবেচনায় ছিল কাদের উদ্দেশ্যে, কেন এই গ্রন্থ লিখতে হবে। মাধ্যমিক পাশ বা তার নিচের পাঠকদের কথা মাথায় রেখেই তিনি এই গ্রন্থ লেখায় অগ্রসর হন। এক্ষেত্রে আরএন মূল *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে অনুসৃত ক্রমানুবর্তিতা কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। তারা বলছেন, *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের তেলেগু অনুবাদ ও ইংরেজি অনুবাদ তারা বহুবার পড়েছেন, এই প্রাথমিক পাঠও তারা বারবার পড়েছেন এবং সময় পেলে এখনও পড়েন, তবুও যতবার পড়েন মার্কসের এই মহাকৃতি ততই সহজ হয়ে আসে। তাহলে একজন নতুন পাঠকের জন্য *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ আত্মস্থ করতে কীভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে? এটা এক বিশাল প্রশ্ন।

মূল ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নাম পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া, যেখানে রয়েছে আটটা ভাগ ও মোট ২১টা অধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম পুঁজির সঞ্চলন, এখানে রয়েছে তিনটা ভাগ ও ২১টা অধ্যায়। তৃতীয় খণ্ডের নাম সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া, এখানে রয়েছে সাতটা ভাগ ও ৫২টা অধ্যায়। তিনটা আলাদা খণ্ড নিয়ে চতুর্থ খণ্ড, যার প্রত্যেক খণ্ডকে এক একটা অংশ বলা যায়। এই তিন খণ্ডের একত্রিত নাম উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, এখানে মোট অধ্যায় রয়েছে ২৪টা।

মার্কস প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করেন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট রাত ২টায়। সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ এই খণ্ডের ছাপার কাজ শেষ হয়। এই একটা খণ্ডই মার্কসের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর আগে তিনি মেয়েদের বলে যান, এঙ্গেলস যেন এ থেকে 'একটা কিছু' দাঁড় করান। প্রয়াত বন্ধুর অন্তিম ইচ্ছাকে এঙ্গেলস পরম নিষ্ঠাভরে বাস্তবে রূপায়িত করেন। বিক্ষিপ্ত ভাবে লেখা বিপুল পরিমাণ পাণ্ডুলিপিগুলোকে তিনি বিষয়বস্তু অনুসারে বিন্যাস্ত করে সুসংবদ্ধভাবে

অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে সাজিয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। আর এই সম্পাদনায় মূল রচয়িতার নিজস্ব কর্মকৃতির একান্ত প্রতিনিধিত্ব যাতে অক্ষুন্ন থাকে, সেই বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব নিয়ে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলোকে এঙ্গেলস চতুর্থ খণ্ড হিসেবে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেন, কিন্তু তার মৃত্যু এই কাজ সম্পূর্ণ করতে দেয়নি। ১৯০৫-১০ খ্রিস্টাব্দে কাউটস্কির নিরলস পরিশ্রমের ফলে তার সম্পাদনায় চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। কিন্তু, তখনকার বিশ্ব-স্বীকৃত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মহল এই সংস্করণকে প্রামাণ্য পাঠ হিসেবে মেনে নেননি। তাই কেবলমাত্র ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে এর প্রথম প্রামাণ্য পাঠ প্রকাশিত হয়। এঙ্গেলস লিখেছেন :

> যে-অংশটি দিয়ে তৈরি হয়েছে পাণ্ডুলিপির আসল অঙ্গ, যার শিরোনাম *Theories of Surplas-Value* (উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বসমূহ), পৃ-২২০-৯২৭ (নোট বই ৬-১৫) – এই অংশটিতে বিবৃত হয়েছে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অস্থি-মজ্জার বিস্তারিত ইতিহাস এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব; আর পাশাপাশি বিকশিত করা হয়েছে, পূর্বসূরীদের সাথে বিতর্কক্রমে, অধিকাংশ বক্তব্যকে, পরে যেগুলো আলাদা ভাবে এবং পারস্পরিক যুক্তিসংযোগে পরীক্ষা করা হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ দুটির আলোচিত অসংখ্য অনুচ্ছেদকে বাদ দিয়ে দেবার পরে, আমি এই পাণ্ডুলিপিগুলোর সমালোচনামূলক অংশের বক্তব্যগুলোকে প্রকাশ করতে চাই *ক্যাপিটাল*, চতুর্থ গ্রন্থ হিসেবে। [১]

মার্কসের সারা জীবনের গবেষণার ফসল *ক্যাপিটাল*, যার জন্য তিনি প্রত্যক্ষভাবে সতের বছরের প্রাণান্তকর শ্রম দিয়েছেন। মার্কস এই গ্রন্থের জন্য বিপুল পরিমাণ তথ্য অসংখ্য নোট বইয়ে লিখে রাখতেন, সাথে থাকতো রাশি রাশি নোট, এগুলোকে তিনি তিন খণ্ডে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। বার বার বিভিন্ন দেশ থেকে নির্বাসিত-হওয়া মার্কস এবং তার পরিবার নিদারুণ দারিদ্র্য দশায় সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে মার্কস সব সময় ভয়ের মধ্যে ছিলেন, তিনি *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ সম্পূর্ণ করে যেতে পারবেন না। কাজের পরিমাণ ছিল এতই বেশি যে, তিনি যদি দিন-রাত কাজ করতেন তবুও লেখা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হতো না। তাই তিনি প্রথম খণ্ডই গ্রন্থাকারে প্রকাশের উপযোগী করে ভালভাবে সাজান, অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলোকে তিনি শুধু লিখেই গেছেন, যা তিনি বলত চান। যদি কোন বিজ্ঞানী যা বলতে চান, তার অধিকাংশই তিনি লিখে রেখে যান, যা শত কঠিন ভাবেই হোক-না-কেন, সেটাই উত্তম। কারণ তার চিন্তার কোন একটা খণ্ডাংশ খুব সুন্দরভাবে লেখার চেয়ে সম্পূর্ণ চিন্তাটা লিখিত পাওয়াটাই মানব জাতির জন্য

---

[১] . কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল* তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০০৯, বাণী প্রকাশ, কলকাতা, পৃ -১৪।

অবশ্যই আশীর্বাদ স্বরূপ। মার্কস এটাই করেছেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে মার্কস তার বন্ধু সিগফ্রেড মেয়ারকে এক চিঠিতে লিখেছেন :

> ভাল, আমি একটা দীর্ঘ সময় তোমার চিঠির জবাব দেইনি কেন, জান কি? আমি সমাধিস্থ হওয়ার জন্য মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কারণ একটা দীর্ঘ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমি অসুস্থ ছিলাম। তাই আমার লেখা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রতিটা মুহূর্তকে আমি কাজে লাগিয়েছি, লেখার মতো সুস্থ হলেই আমি লিখেছি। এই কাজে আমি আমার স্বাস্থ্য, সুখ ও পরিবার বিসর্জন দিয়েছি ..., যদি আমি আমার গ্রন্থ লেখার কাজ শেষ না করে, অন্তত পাণ্ডুলিপি আকারে হলেও, আমি মারা যাই, তাহলে তুমি আমাকে একজন বাস্তববাদী না-ও ভাবতে পারতে।[২]

ক্যাপিটাল গ্রন্থের সকল খণ্ডই প্রথমে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের পূর্বভাষে মার্কস লিখেছেন :

> যে গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডটি আমি এখন সাধারণ্যে উপস্থিত করছি, সেখানি ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আমার *কন্ট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনোমি* (রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনায় একটি সংযোজন) পুস্তিকাটিরই পূর্বানুবৃত্তি। এই দুয়ের প্রকাশকালের মধ্যে এই দীর্ঘ যে ব্যবধান, তার কারণ আমার বহুবর্ষব্যাপী অসুস্থতা, যা বারবার আমার কাজের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। এই খণ্ডের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে আমার উক্ত পুস্তিকার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে।[৩]

তখনকার পুঁজিবাদী শাসক গোষ্ঠী ওই প্রথম পুস্তিকার প্রচারকে নানাভাবে বিঘ্নিত করেছিল, সেই সময় এটা শ্রমিকশ্রেণীরই শুধু নয়, কোন মহলেরই গোচরে আসতে পারেনি। কিন্তু, যখন *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো, তাদের সেই পুরনো কৌশল আর কাজে লাগেনি। এবার *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ মধ্য আকাশের সূর্যের প্রখর আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিল, যার আলোয় পুঁজিপতি শ্রেণীর পুড়ে মরার আতঙ্কে পেয়ে বসলো। মার্কস বুঝেছিলেন সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস হলো শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। আর *ক্যাপিটাল* গ্রন্থখানা লিখে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে দিলেন পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের লড়াইয়ে বিজয় লাভের হাতিয়ার, যা তাকে চিরতরে শোষণের হাত থেকে মুক্তির পথ দেখাবে। শ্রমিকশ্রেণী এবার অত্যন্ত মর্যাদার সাথে, সতর্কতার সাথে প্রবল আগ্রহ নিয়ে একে গ্রহণ করলো।

সব দেশেই বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রবর্তীতার প্রমাণ হিসেবে, বিশেষ করে, ক্যাপিটাল গ্রন্থের মাতৃভাষায় প্রকাশনকে বিচার করা হয়। কারণ এই গ্রন্থে রয়েছে যে-কোন দেশে শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা।

---

[২]. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ -১৫।

[৩]. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ -৩৫।

মার্কসবাদের মূল শিক্ষাই এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে, যা শ্রমিকশ্রেণীকে যুগে যুগে পথ দেখিয়ে চলেছে। সমাজ পরিবর্তনের বিজ্ঞান যে মার্কসবাদ, তাকে ভালভাবে না বুঝে কোন বিপ্লবী সংগ্রাম বা পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই কোন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই গ্রন্থ কতটা জনপ্রিয়, এই গ্রন্থের মর্মকথা কতটা ওই জনগোষ্ঠী আত্মস্থ করতে পেরেছে, বিপ্লবী পার্টি ও সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে মাতৃভাষায় এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তাই এর প্রমাণ। পাশের দেশ ভারত ও নেপালের ক্ষেত্রেও একই কথা।

এই গ্রন্থ আত্মস্থ করাটা অত্যন্ত কঠিন, এটা দুর্বোধ্য তাই একে আয়ত্ত করাটাও কঠিন, অনেকেই এমন মতামত দেন। এটাকে সঠিক মতামত হিসেবে নিতে হবে, বিষয়টা মোটেই এমন নয়। এই গ্রন্থ পাঠের অসুবিধার কথা মার্কস নিজেই উল্লেখ করে বলেছেন, এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে তিনি অপারগ। মার্কস জীবদ্দশায় প্রথম খণ্ড প্রকাশের আগে এবং পরেও বারবার সংশোধন করেছেন, যাতে করে তার বক্তব্য পাঠকের কাছে সহজে বোধগম্য হয়, তিনি লিখেছেন :

> বিজ্ঞানের পথ সহজ নয় এবং যারা গিরিশৃঙ্গে ওঠবার খাড়াইয়ের কথা মনে করে ভীত হয়ে পড়বেন না, তারাই কেবলমাত্র খাড়াই উৎরিয়ে আলোকোদ্ভাসিত শৃঙ্গচূড়া দেখতে পাবেন।[৪]

আমরা যারা *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ পাঠ করে এর মূল শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে চাই, তাদের অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে কয়েকটা প্রাথমিক বই পাঠ করে নিতে হবে। ক্যাপিটাল প্রাথমিক পাঠের বই নয়। স্কুল-কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে পাঠ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কয়েকটা বই আমাদের অবশ্যই পড়ে নিতে হবে। এর পরেই আমাদের আন্দ্রে আনিকিনের লেখা *অর্থশাস্ত্র বিকাশের ধারা*; এঙ্গেলসের লেখা *কজমিউনিমের মূলনীতি*; মার্কসের লেখা *কমিউনিস্ট ইশতেহার*, *শ্রমশক্তি ও মূলধন এবং মূল্য, দর ও মুনাফা* পড়ে নিতে হবে। আমাদের আরও পড়তে হবে এঙ্গেলসের লেখা *সমাজতন্ত্র : কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক; পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*; *কার্ল মার্কস ও ক্যাপিটাল এবং এন্টি-ডুরিঙ*। আমরা যদি আরও গভীরভাবে মার্কসবাদকে জানতে চাই, তাহলে আমাদের আরও পড়তে হবে মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা অসংখ্য চিঠির সংকলন। পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো সাম্রাজ্যবাদ, আমরা সাম্রাজ্যবাদের যুগে বসবাস করছি। সাম্রাজ্যবাদী যুগের মহান নেতা হলেন লেনিন, যিনি সাম্রাজ্যবাদী যুগের সমস্যাকে প্রথম চিহ্নিত করেন এবং একে মোকাবেলা করার উপযোগী করে মার্কসবাদকে বিকশিত করেন। তাই তার লেখা কয়েকটা বইও আমাদের পড়তে হবে। তার লেখা *বাজার প্রসঙ্গে*, *জনগণের বন্ধু কারা*, *কৃষি*

---

[৪] . প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ -৪৯।

বিষয়ক প্রশ্নাবলি, রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় বইগুলো এ বিষয়ে আমাদের অনেক সাহায্য করবে। আর এক্ষেত্রে ভারতের প্রখ্যাত মার্কসবাদী রঙ্গনায়াকামার গ্রন্থগুলো প্রাথমিক পাঠ হিসেবে সবচেয়ে সহজ বলে আমাদের মনে হয়েছে। এই কাজে সাহায্য করতেই আমরা আরএন-এর গ্রন্থগুলো অনুবাদ করার কাজে হাত দিয়েছি।

ক্যাপিটাল গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রায় দেড়শ বছর অতিক্রান্ত হলো। কিন্তু, বাস্তবতা হলো আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থের মর্মবস্তু প্রকৃত অর্থে কমই জানা হয়েছে, কারণ এই গ্রন্থে বিবৃত দর্শন ও আর্থনীতিক ব্যাখ্যার যুক্তিধারা এখনও মানব জাতির সচেতন জ্ঞানের অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠেনি। এই গ্রন্থের মূল শিক্ষা এখনও সাধারণ মানুষের বোধের বাইরে রয়ে গেছে। একটা তত্ত্ব যতই সঠিক, সত্যঋদ্ধ ও বাস্তবসম্মত হো না কেন, তত্ত্ব হিসেবে এটা স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে না, যদি-না লক্ষ কোটি মানুষ একে নিজেদের চিন্তার সাথে একীভূত করে নিতে না শেখে। মার্কসের চিন্তার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণ চলে আসছে, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে এসব সমালোচনাকে যুক্তিসিদ্ধ সচেতন জ্ঞান দিয়ে বাতিল করে দিতে পারে, এমন ব্যক্তির সংখ্যা আজও কম। মার্কস যেসব বিষয় এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, তার আলোকে উদ্ভাবিত নতুন চিন্তা ও যুক্তিধারা দিয়ে এসব আক্রমণকে প্রতিহত করার মতো গবেষণা আজও কম, কারণ নতুন পরিস্থিতির মুখে যেভাবে তার শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন, সেটা সময়ের দাবি মতো ঘটছে না।

একজন পথিকের বা একদল লোকের জন্য কোন গভীর অরণ্য থেকে লোকালয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়াটা মোটেই সহজ কাজ নয়। যদি তাদের একজন নেতাও থাকেন, যিনি পথটা চেনেন, তাহলেও কাজটা সহজ হয়ে যায় না। নেতা তার সহযাত্রীদের নিয়ে দীর্ঘ কষ্টকর পথ পাড়ি দেওয়ার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র লোকালয়ে যেতে পারেন, এক্ষেত্রে কোন সহজ বিকল্প নেই। যতক্ষণ সবাই মিলে এই অচেনা-অজানা পথটাকে মসৃণ করে না তুলতে পারছেন, শুধুমাত্র নেতার একার বা আরও মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনের পক্ষে কষ্টকর বিপদ সংকুল এই পথকে আগামী দিনে নতুন প্রজন্মের জন্য পথ-চলার উপযোগী করে তোলা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

মার্কস এই গ্রন্থে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, এখানে এই ব্যবস্থার আর্থনীতিক ও রাজনীতিক দিকগুলোই কেবলমাত্র আলোচিত হয়নি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানব সমাজ বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়া এখানে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে পুঁজিবাদী সমাজ গঠন-প্রক্রিয়াকে জীবন্ত বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজ গঠনের এই বিশ্লেষণে মার্কস উদঘাটিত করেছেন এর বিভিন্ন প্রাত্যহিক দিক, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে নিহিত এর সহজাত শ্রেণী-বিরোধের সামাজিক প্রকাশের বাস্তব রূপ এবং নগ্ন করে দেখিয়েছেন সেই বুর্জোয়া রাজনীতিক বহির্গঠনগুলোকে – যে বহির্গঠন স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী প্রভৃতি

বুর্জোয়া ভাবধারা ও বুর্জোয়া পারিবারিক সম্বন্ধের সাহায্যে পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রভুত্ব বাঁচিয়ে রাখে।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের সবগুলো খণ্ড যদি আমরা একবার দেখে যাই, তাহলে দেখবো এর প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে ফুটনোট, খুব কম পৃষ্ঠাই রয়েছে যেখানে ফুটনোট নেই, আর পরিশিষ্টে রয়েছে হাজারো লেখকের ও গ্রন্থের নাম, যেসব গ্রন্থ থেকে মার্কস প্রায় লক্ষের কাছাকাছি উদ্ধৃতি নিয়েছেন। কয়েক শতাব্দী পূর্বের গ্রন্থও যার মধ্যে রয়েছে, রয়েছে হাজারো দলিলের উল্লেখ, হাজারো পার্লামেন্টারি রিপোর্ট ও সরকারি প্রকাশনা এবং সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের উল্লেখ। তাই মার্কস কত গভীর ও নিবিড় অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যা-কিছু প্রয়োজনীয় তা আত্মস্থ করেছেন, ভাবলে অবাক-বিস্ময়ে তার এই বিশাল শ্রমসাধ্য মহাকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতে হয়।

মার্কস অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন ও রাজনীতি এমন সকল মানবিক বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নতুন ধারণা এই গ্রন্থে এত নিখুঁতভাবে ক্রমানুবর্তিতা মেনে সাজিয়েছেন, যা এখানে বিবৃত হাজারো ছোট ইউনিটে বিভক্ত ধারণাগুলোকে ভালভাবে আত্মস্থ না করে তার সমগ্রটাকে বোঝা অসম্ভব। ক্যাপিটাল গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে মার্কস বিজ্ঞানের মহান আবিষ্কারের সূত্রগুলোকেই শুধু মেনে চলেননি, তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই গ্রন্থের সকল অধ্যায়কে সাজিয়েছেন। জনমতের কুসংস্কারগুলোকে কখনই তিনি আমল দেননি, তার বিশ্বাসের মূলমন্ত্রই ছিল : নিজের পথে যাও, লোকেরা যা ইচ্ছা তাই বলুক। আত্মবিশ্বাসের ভিত কত মজবুত থাকলে কারও পক্ষে এমন মনোভাব ধারন করা সম্ভব।

এই গ্রন্থ মানুষের চিন্তা করার ও পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে; ফলে ইতিহাস দর্শন, সমাজ দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাসহ সকল ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটেছে। এভাবে এক নতুন বিশ্বদৃষ্টি সামগ্রিকভাবে বেরিয়ে এসেছে, যা সূত্রায়িত করেছে এক নতুন দার্শনিক তত্ত্ব – দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন।

দারিদ্র্যের নিদারুণ কষ্টের মধ্যে মার্কসকে এই গবেষণা চালাতে হয়েছে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসংগতিই যার পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থানে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদী শোষণের এবং এর সহজাত সংকটের প্রকৃত চিত্রটাকে, আর্থনীতিক বিচারে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উন্মোচিত করে দিয়েছেন, যা ছিল বারবার নির্বাসিত মার্কস এবং তার পরিবারের জন্য নিতান্তই এক অবধারিত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তার এই ভূমিকা তিনি কত বিজ্ঞানভিত্তিক ছিলেন, ব্যক্তিগত দিক থেকে কত প্রভাবমুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ ছিলেন, অভাবনীয় সাহসে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি কত অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন, তাকেই তুলে ধরে, যার মর্মকথা তার এই বক্তব্যে উঠে এসেছে :

> বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে অবাধ বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের পথে যেসব শত্রু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে কেবল সেসব বাঁধাই উপস্থিত হয় না। অর্থনীতির বিষয়বস্তুর প্রকৃতিটি এমনই বিশেষ ধরনের যে তা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু হিসেবে উদ্রিক্ত করে মানবমনের সবচেয়ে ক্রুর ও বিষাক্ত বৃত্তিগুলোকে, ব্যক্তিগত স্বার্থের পিশাচ-প্রবৃত্তিগুলোকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংল্যান্ডের কায়েমী যাজকতন্ত্র (English Established Church) বরং তার ৩৯টা অনুশাসনের ৩৮টার উপর আক্রমণ করলে ক্ষমা করবে, কিন্তু তার আয়ের ৩৯ ভাগের এক ভাগের উপরে আক্রমণ করলেও তা ক্ষমা করবে না।[৫]

তত্ত্বজিজ্ঞাসার কাজে মার্কস প্রথমে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্লীন যোগসূত্রটাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন, যাতে করে ওই বিষয়টার সত্যিকার গতিক্রমটাকে উপযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এসব কাজে বিষয়বস্তুকে কত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মার্কস অনুশীলন করতেন, কোন্ পদ্ধতিতে তিনি অগ্রসর হতেন, সেটা রাশিয়ান লেখক ই. ই. কাউফম্যানের ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বইয়ের এই উদ্ধৃতি থেকে উঠে এসেছে, স্বয়ং মার্কস যার বক্তব্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন :

> যে জিনিসটা মার্কসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে তার আলোচ্য ঘটনাবলির অন্তর্নিহিত নিয়মটা আবিষ্কার করা; এবং তার কাছে কেবল এই নিয়মটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, যে নিয়মটা নিয়ন্ত্রণ করে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের ঘটনাবলি, যে নির্দিষ্ট রূপ ও পরস্পর-সম্পর্ক ধারন করে, সেই রূপ ও সম্পর্কসমূহকে। তার কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের পরিবর্তনের, তাদের বিকাশের তথা এক রূপ থেকে অন্যরূপে, এক ধরনের সম্পর্কজাল থেকে আর এক ধরনের সম্পর্কজালে অতিক্রমণের নিয়মটা। এই নিয়ম আবিষ্কার করেই তিনি তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কীভাবে সমাজ-জীবনে আত্মপ্রকাশ করে, তার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন।[৬]

মার্কস এই গ্রন্থে অর্থনীতির সমগ্র ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তাকে ঢেলে নতুন করে সাজিয়েছেন, এভাবে একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। পুঁজিবাদী বিখ্যাত সকল অর্থনীতিবিদদের সাথে দীর্ঘ মতাদর্শিক বিতর্ক চালিয়ে তিনি সম্পূর্ণ মৌলিক ও নতুন আর্থনীতিক তত্ত্ব সূত্রায়িত করেছেন। প্রত্যেকটা নতুন তত্ত্বই মার্কসের এক-একটা মহান কীর্তি। তাই এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দও প্রচলিত অর্থের বাইরে ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রন্থ ভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে সবাইকে বারবার এই গ্রন্থ পড়তে হয়েছে, গ্রন্থে উপস্থাপিত গোটা বিষয়কে গভীরভাবে আত্মস্থ করতে হয়েছে। কোন একক ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্ভব হয়নি, দু'য়ের অধিক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের এ জন্য কয়েক বছর ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু, বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, অসুস্থ শরীর আর

---

[৫]. প্রাগুক্ত, মার্কস লিখিত প্রথম জার্মান সংস্করণের পূর্বভাষ, পৃ -৩৮।

[৬]. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, মার্কস লিখিত দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের উত্তরভাষ, পৃ -৪৪।

অনাহারের যন্ত্রণা নিয়ে মার্কস একাই গোটা এই গ্রন্থের সমস্ত পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ সম্পূর্ণ করেন, যেখানে তিনি তার বন্ধুদের বুদ্ধিবৃত্তিক সাহায্য অবশ্যই পেয়েছেন, এঙ্গেলস যাদের মধ্যে সর্বাগ্রগামী। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে তিনি অনেকের পরোক্ষ সাহায্য নিয়েছেন ঠিকই, যা যে-কোন মহত্তম সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। তাই *ক্যাপিটাল* এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

ক্যাপিটাল গ্রন্থে নতুন নতুন পরিভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে, নতুন এক তত্ত্বমত তুলে ধরার ক্ষেত্রে এমনটাই স্বাভাবিক, আর এগুলোর অর্থও ভিন্নতর, প্রসঙ্গটা উল্লেখ করে এঙ্গেলস লিখেছেন :

> এটা অবশ্য স্বতঃস্পষ্ট যে একটা তত্ত্ব, যার দৃষ্টিতে আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা মানব জাতির অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটা অচিরস্থায়ী পর্যায় মাত্র, সেই তত্ত্ব এমন সব পরিভাষা ব্যবহার করবে, যেসব পরিভাষা হবে অভ্যস্ত পরিভাষাগুলো থেকে ভিন্নতর, পুঁজিবাদী উৎপাদনের রূপটাকে যে লেখকেরা চূড়ান্ত ও চিরন্তন বলে মনে করেন তারা যে ভাষাগুলোতে অভ্যস্ত, সেগুলো থেকে ভিন্নতর।[৭]

মার্কস এই গ্রন্থ লিখতে কত নিখুঁত থাকার চেষ্টা করেছেন, তা এঙ্গেলসের এই উদ্ধৃতি থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> দ্বিতীয় গ্রন্থটির জন্য মার্কস পাণ্ডুলিপির আকারে যে-সামগ্রী রেখে গেছেন, কেবল তা বিবৃত করলেই প্রমাণ হয় কী অতুলনীয় বিবেক-নিষ্ঠা এবং সুকঠোর আত্ম-সমালোচনার সঙ্গে তিনি চেষ্টা করেছেন তার মহৎ অর্থনৈতিক আবিষ্কারগুলোকে প্রকাশ করার আগেই সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিখুঁত করে তুলতে। এই আত্ম-সমালোচনা কদাচিৎ তাকে সুযোগ দিত, ভাব ও ভঙ্গির দিক থেকে, আলোচ্য বিষয়টাকে তার ক্রম-প্রসারণশীল দিগন্তের সঙ্গে অভিযোজিত করতে, যে ক্রম-প্রসারণশীল দিগন্ত তার অবিশ্রান্ত অধ্যয়নের ফল।[৮]

মানব ইতিহাসে *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের প্রকাশ এক বিস্ময়কর ঘটনা। বিগত কয়েক মিলিয়নে ইতিহাসে বহু ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সকল বিচারে এটা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ এই গ্রন্থ মানব জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে এবং অমানবিক শোষণের হাত থেকে চিরতরে মুক্ত হওয়ার পথ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রথম দেখিয়ে দিয়েছে। এই গ্রন্থ বহু যুগ ধরে চলে আসা কুৎসিত শ্রেণী পার্থক্য, সবচেয়ে বিধ্বংসী যুদ্ধ, বিশ্বমন্দার মতো নিদারুণ সংকট, মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, কতিপয় মানুষের পশুসুলভ আচরণ এবং অজ্ঞানতার হাত থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব, তার বিজ্ঞানভিত্তিক পথ প্রথম উদঘাটিত করে দিয়েছে।

---

[৭] পাগুক্ত, পৃ -৩৩।

[৮] পাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, এঙ্গেলস লিখিত ইংরেজি সংস্করণের পূর্বভাষ, পৃ -১৩।

আমাদের সকলের সাধারণ একটা ধারণা রয়েছে যে অর্থনীতি পড়তে অংকশাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ধারণাটা ভুল। অর্থনীতি বিজ্ঞান অংকশাস্ত্রের কোন শাখা নয়। অর্থনীতি বিদ্যায় মানব সমাজে বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থা ও বিপণন ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সেজন্য যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এবং শতকরা বের করার জ্ঞান থাকলে চলে। আর মার্কস *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ এমনভাবে লিখেছেন, যেখানে এগুলো জানলেই চলে যাবে। তবে উচ্চতর জ্ঞান থাকলে, সেটা তো অবশ্যই উত্তম। সুতরাং, অর্থনীতিবিদরা যে ভয় দেখান সেটা সঠিক নয়।

এই গ্রন্থে অংক প্রধান হয়ে আসেনি, যুক্তিই এখানে প্রধান; যুক্তির পর যুক্তির জাল বুনে সমগ্র আলোচনা সামনে এগিয়েছে। একে আমরা 'যুক্তি', 'পর্যালোচনা', 'সমালোচনা', 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' অথবা 'বিশ্লেষণ' বলতে পারি। এভাবে আমরা আরও সমশব্দ ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু তাতে করে মার্কসকৃত পদ্ধতিটার ইতর-বিশেষ ঘটে না। এই গ্রন্থ পড়ার জন্য বড় কোন ডিগ্রি বা পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হবে না। তবে এসব থাকলে ভাল, না থাকলেও এই গ্রন্থ আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না। মার্কস যদি যুক্তিবিদ্যা না-ও রেখে যান, তিনি রেখে গেছেন ক্যাপিটাল গ্রন্থ, যেখানে প্রযুক্ত হয়েছে এই একই অংকশাস্ত্রের প্রতি যুক্তিবিদ্যা, দ্বন্দ্বতত্ত্ব এবং বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব।

মার্কসের এই মহাকৃতি বুঝতে যে-কোন ব্যক্তির জন্য অবশ্যই একটা গুণের প্রয়োজন রয়েছে, আর সেটা হলো যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার অভ্যাস। অনেক বই আমরা শুয়ে থেকে বা রিলাক্স মুডে পড়তে পারি, কিন্তু এখানে এটা চলবে না। কোন লেখক তার পাঠককে কিছুই শেখাতে পারবেন না, যদি পাঠক চিন্তা না করেন। তাই লেখক বহু শ্রম দিয়ে যখন কিছু লেখেন, পাঠক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব চিন্তা করে তার শ্রমসাধ্য কাজটার মর্ম উদ্ধার করা।

আমরা প্রায়ই শোষণ! শোষণ! কথাটা শুনি বা বলি। কিন্তু, এর প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করা পর্যন্ত, এটা বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের কাছে ভাঙ্গা রেকর্ডে বাজানো গানের মতোই থেকে যায়। তাহলে শোষণ কথাটার অর্থ কী? শ্রেণী পার্থক্য কথাটারই বা অর্থ কী? প্রকৃত শ্রেণী পার্থক্য কি বিদ্যমান রয়েছে? কেন সকল শ্রমিক এক শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে আর পুঁজিপতিরা অন্য শ্রেণীতে পড়ছে? কোন ভাল হৃদয়বান পুঁজিপতি কি থাকতে পারে না? এই ধরনের পুঁজিপতিও কি শোষণ করে? কেন এমন ঘটছে, যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দিনে দিনে ধনী হয়ে ওঠছে, আর অন্য শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে? দুনিয়ার মজদুর এক হও! কথাটারই বা অর্থ কী? বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে কি কোন সাধারণ সম্পর্কের অস্তিত্ব রয়েছে? কোন্ সে বৈশিষ্ট্য যার বলে দুনিয়ার সকর শ্রমিক একটা সাধারণ সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়?

কাগজের নোট যে 'টাকা' এই বিস্ময়কর ক্ষমতাধর বিষয়টা কী? কারা ধনীর কাতারে পড়বে? খাদ্যবস্তুর পর্যাপ্ত সরবরাহ বাজারে থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষের অনাহারে থাকার কারণ কী? যেখানে এসব মানুষ প্রকৃতিতে জন্ম নিয়ে তাদের হাত ও পা ব্যবহার করে হাজারো জিনিস উৎপাদন করছে, করতে চায় এবং করতে পারেও। তাহলে অনাহারে থাকাটা কি প্রাকৃতিক ঘটনা? এটা কি একটা বাস্তব সত্য? তাহলে সবার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হয় না কেন?

প্রভু কে? কে চাকর? কে শ্রমিক? কেন একজন মালিক হয়ে যায় আর অন্য অধিকাংশরা শ্রমিক হয়ে যায়? এমন হাজারো প্রশ্ন রয়েছে হাজার বছর ধরে জ্ঞানের পেছনে ছুটে চলা মানব জাতি, বিশেষ করে, মানব জাতির অগ্রসর জ্ঞানীরা যার উত্তর খুঁজে ফিরেছে। সক্রেটিস থেকে শুরু করে মঁৎক্রেতিয়েন, টমাস মান, স্যার উইলিয়াম পেটি, বুয়াগিইবের, জন লো, ক্যান্টালিন, অড্যাম স্মিথ, ডেভিড হিউম, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, ফ্রাঁসোয়া কেনে, জন স্টুয়ার্ট মিল, ডেভিড রিকার্ডো এমন শত শত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ সারাটা জীবন এর উত্তর খুঁজতে জীবনপাত করেছেন। কিন্তু এর পূর্ণাঙ্গ যুক্তিসিদ্ধ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এসবের একমাত্র উত্তর হলো *ক্যাপিটাল*, যেখানে মার্কস তার পূর্বেকার সকল অর্থনীতিবিদদের যুগান্তকারী আর্থনীতিক উদ্ভাবনগুলোর উপর দাঁড়িয়ে এর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জবাব প্রথম তুলে ধরেন।

ক্যাপিটাল হচ্ছে প্রথম গবেষণা, যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মানব জাতি এবং সভ্যতার বিকাশের নিয়ম, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, শোষণের নিগুঢ় কথা এবং আগামী শোষণহীন নতুন সমাজ – এসব বিষয়ের মর্মকথা, এর উদ্ভব, বিকাশ ও বিদ্যমান থাকার মূলকথা বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদঘাটিত হয়েছে। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ প্রকাশের আগে অর্থনীতির প্রচলিত চর্চা এসব অতি গুরত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অন্ধকারেই ছিল, বলা যায়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো, তখন পর্যন্ত প্রচলিত অর্থশাস্ত্র 'মূল্য' কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা দিতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে, কিন্তু সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ এসবের সঠিক পূর্ণাঙ্গ উত্তরই শুধু দেয়নি, এসবের উত্তর খোঁজার বিজ্ঞানভিত্তিক সূত্রাবলিও তুলে ধরেছে। ফলে প্রচলিত অর্থনীতি বিদ্যার আলোচিত ও গৃহীত সূত্রাবলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতির চর্চা মার্কসের আগেও ছিল। দর্শন বিষয়টা তো বহু আগে থেকেই সর্বশক্তিমান অবস্থান নিয়ে সকল বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করছিল, এসব বিজ্ঞানই প্রথম প্রকৃতি ও সমাজকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। কমিউনিস্ট সমাজের চিন্তা তো সাঁ সিঁমো, ফুরিয়ে ও ওয়েন করেছেনই, এমনকি এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করেছেন, যা ছিল সর্বসাম্যবাদী সমাজের কল্পনা মাত্র। কিন্তু, এসব চিন্তা ও ধারণার মধ্যে ছিল নানাবিধ ভুল, অসংগতি ও ঘাটতি,

তাই এসব চেষ্টা পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। মার্কস ব্যাপক অধ্যয়ন করে এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিলেন, যাতে করে তার পক্ষে এসব ভুল ও অসংগতি যুক্তিসিদ্ধ ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

এই অনুসন্ধানের পথে মার্কস একটা কুৎসিত ব্যাকটেরিয়া চিহ্নিত করেছেন, আর সেটা হলো 'শোষণ'। ফলে ধনী ও গরিব হয়ে থাকার মধ্যকার সমগ্র গোপন রহস্যটা নিজের থেকেই উন্মোচিত হয়ে গেল। সকল ধরনের সামাজিক দুর্গতির কারণ এর উৎস স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে গেল। এটা এমন এক ঐতিহাসিক আবিষ্কার, যা হাজার বছরের চেষ্টায় মানব জাতি অর্জন করতে পারেনি। সমাজ মার্কসের এই কর্মকৃতির মাধ্যমে তা জানতে পারলো।

মার্কস এই 'শোষণ'-কে সামগ্রিক অর্থে বুঝে এবং এর ব্যাখ্যা হাজির করে থেমে থাকেননি, কীভাবে এই শোষণ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব, তার পথ কী, এ বিষয়ে কী করণীয়, তা নির্ধারণ করতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। মানব জাতির জ্ঞান এভাবে এক উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেল। শোষণ প্রকৃত অর্থে বোঝা এবং শোষণমুক্তির পথ বোঝা দুটো ভিন্ন বিষয় নয়, একটা জানলে অন্যটাও জানা হয়ে যায়।

মার্কস-এঙ্গেলস এই দুজনের চিন্তা ও শিক্ষাই হলো মার্কসবাদ। মার্কসবাদ হচ্ছে সমাজ বিশ্লেষণের ও সমাজটাকে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বিজ্ঞান, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সমাজটাকে শোষণহীন সমাজে রূপান্তরিত করা। তাই কোন সমাজকে শোষণমুক্ত করতে মার্কসবাদকে জানা প্রত্যেক বিপ্লবীর অবশ্য কর্তব্য। পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ রয়েছে। একদল মার্কসবাদকে না জেনেই এর বিরোধিতা করেন, অন্যদল জেনে সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু, কোন মতাদর্শ না জেনে তার বিরোধিতা করা, আর না বুঝে তাকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়া দুটোই সমান বিপজ্জনক। যা প্রয়োজন তাহলো 'সচেতন জ্ঞান' দিয়ে মতাদর্শটাকে বোঝা, তারপর বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কসবাদকে সবচেয়ে প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বলতায় তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা সম্পত্তির 'মালিকানা স্বত্ব' বুঝবো না, যদি 'পুঁজি এবং 'জমি' না বুঝি। 'অর্থ' কী, এটা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে 'পুঁজি' কী তা বুঝবো না। 'বিনিময়' এবং 'মূল্য' সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান আয়ত্ত করেই কেবলমাত্র 'অর্থ' কী বোঝা সম্ভব। 'মূল্য' কী বুঝতে আমাদের অবশ্যই 'বস্তু', 'জিনিস' এবং 'পণ্য' কী বুঝতে হবে। এসবের সরল অর্থ হলো আমাদের 'বস্তু', 'জিনিস' এবং 'পণ্য' বোঝার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। ব্যবহারিক মূল্য, বিনিময় মূল্য এবং 'অর্থ'-এর বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে 'অর্থ রূপ' হিসেবে উদ্ভূত হওয়া, এসবের উপর উৎপাদন ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া কী, এসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা না নিয়ে আমরা অনেকেই *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ বুঝতে

অগ্রসর হই। কিন্তু, কোন নির্দিষ্ট সমাজ-স্তরে উৎপাদন পদ্ধতির সাথে এসবের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। উৎপাদন পদ্ধতির নির্দিষ্ট ধরনের সাথে ওই নির্দিষ্ট যুগের সকল চিন্তা-চেতনা, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, এ সম্পর্কে ভালভাবে না জেনেই আমরা ওই সমাজকে বুঝতে চাই, যেটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। মার্কস *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ লিখেছেন, যাতে করে আমরা এই পুরনো পথ ধরে কোন কিছু বুঝতে অগ্রসর না হই। এসব না বুঝে উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন ধরন এবং তার বিকাশের ইতিহাস বোঝা সম্ভব নয়। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'পণ্য এবং অর্থ', এখানে এসব বিষয় বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অনেকে বলেন তৃতীয় খণ্ডের 'জমি ও খাজনা' অধ্যায় পাঠের মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থের পাঠ শুরু করা উচিত। অনেকে মনে করেন 'পণ্যের পৌত্তলিকতা' দিয়ে শুরু করা উচিত। আমরা মনে করি এসবই ভুল। মার্কস যেভাবে এই গ্রন্থকে সাজিয়েছেন, আমাদের সেভাবেই অগ্রসর হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে মার্কস প্রথম জার্মান সংস্করণের পূর্বভাষে লিখেছেন :

> প্রত্যেকটা প্রারম্ভই দুরূহ, একথা সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই প্রথম অধ্যায়টি, বিশেষ করে, পণ্যের বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলোকে অনুধাবন করা সবচেয়ে বেশি কঠিন। মূল্যের মর্ম ও মূল্যের আয়তন সংক্রান্ত অংশগুলোকে আমি যথাসাধ্য সহজবোধ্য করে উপস্থিত করেছি। পণ্যের মূল্য রূপ – যার পূর্ণ বিকশিত রূপটাই হচ্ছে অর্থ রূপ – খুবই প্রাথমিক ও সরল ব্যাপার। তা সত্ত্বেও কিন্তু দু'হাজারেরও বেশি বছর মানব-মন বৃথাই তার মূলে যেতে চেষ্টা করেছে; অন্যদিকে বরং তার চেয়ে ঢের বেশি মিশ্র ও জটিল রূপগুলোর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সে সাফল্যের অন্তত কাছাকাছি এসে গিয়েছে। কেন? কারণ একটা সমগ্র জৈব সত্তা হিসেবে মানব দেহের অনুশীলন ওই দেহের কোষসমূহের অনুশীলন থেকে সহজতর। ... কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে শ্রমজাত দ্রব্যের পণ্য রূপ, তথা পণ্যের মূল্য রূপ হচ্ছে অর্থনৈতিক কোষ-স্বরূপ।[৯]

মার্কস তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোষ-স্বরূপ যে 'পণ্য', তার আলোচনা দিয়েই ক্যাপিটাল গ্রন্থ শুরু করেছেন। আমরা যদি ক্যাপিটাল গ্রন্থকে মানব দেহের সাথে তুলনা করি, তাহলে 'পণ্য এবং অর্থ' অধ্যায়কে মানুষের মাথা হিসেবে ভেবে নিতে হয়। 'কোষ' মানব দেহের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক, যাকে না জেনে মানব দেহকে পরিপূর্ণ ভাবে জানা সম্ভব নয়। মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক 'পণ্য'-কে ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলো এভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে।

---

৯. প্রাগুক্ত, কার্ল মার্কস, প্রথম জার্মান সংস্করণের পূর্বভাষ, পৃ. ৩৫

মানব জাতির জন্য উচ্চতর কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, 'প্রকৃতি' ও 'মানব সমাজ' সম্পর্কিত জ্ঞান ব্যতীত। ক্যাপিটাল গ্রন্থেই প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করে এই দুটো বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানত এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করেই মানব জাতির জ্ঞান বিকশিত হয়ে চলেছে। জন্মগ্রহণের পর একটা বয়সে এসে আমরা প্রত্যেকে এই দুটো বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট ধারণা পেয়ে যাই। পৃথিবীতে এমন কোন সুস্থ মানুষ থাকতে পারে না, যিনি এই দুটো বিষয় সম্পর্কে, নিজের মতো করে, একটা ধারণা মনের মধ্যে পোষণ না করেন।

মানব জাতির একটা বিশাল অংশ প্রকৃতি সম্পর্কে যেমনটা ভাবেন তা হলো : এই বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টির পেছনে একজন স্রষ্টা রয়েছেন, স্বেচ্ছাধীন এই স্রষ্টাই প্রকৃতির নানাবিধ পরিবর্তনের পেছনে একক ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এই স্রষ্টার স্বরূপ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকতে পারে, তবে একজন স্রষ্টা আছেন এই মতে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা আজও সর্বাধিক।

অন্যদিকে, একটা বয়সে এসে প্রত্যেক সুস্থ মানুষ 'সমাজ' সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য হন – সমাজে মানুষের মধ্যে কেন এত 'অসমতা'? কেন কিছু মানুষ ধনী আর অধিকাংশ মানুষ গরিব? কেন কেউ চাকর আর কেউ মালিক? মানুষের মধ্যে কেন এই অমানবিক পার্থক্য? সমাজে ধনী ও গরিবের এই পার্থক্যের কারণ জানতে, প্রত্যেক সুস্থ মানুষ ভাবতে বাধ্য হন।

'প্রকৃতি' ও 'সমাজ' সম্পর্কে যত ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আমরা পোষণ করি না কেন, প্রকৃত সত্য কোনটা, এটা জানতে আমরা সবাই আগ্রহী। কোনটা সত্য এটা জানাই তো 'জ্ঞান'। যেটা সত্য নয়, সেটা 'অজ্ঞানতা' বৈকি। একজন মানুষের পক্ষে একটা অসত্যকে সত্য হিসেবে জানাটাই তো অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা মানব জাতির জন্য সৃষ্টি করে হাজারো সমস্যা। আর জ্ঞান এসব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে। তাই মানব জাতির বর্তমানের সুখ-সমৃদ্ধি ও আনন্দময় আগামীর জন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্যই বটে।

মানুষ কোন একটা বিষয়কে সত্য হিসেবে ধরে নিলেই, সেটা সত্য হয়ে যায় না। কোন একটা বিষয়ের সত্যতা নিয়ে বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। তাহলে তো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কয়েকটা সত্য এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু, একটা বিষয়ে একটাই সত্য থাকতে পারে। কোপারনিকাশ, কেপলার এবং গ্যালিলিও সূর্যকেন্দ্রিক সৌর জগতের ধারণাকে একমাত্র সঠিক ও সত্য হিসেবে তুলে ধরলেন, এর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণাই সত্য হিসেবে নিয়েছিল। কিন্তু, আজ মহাশূন্য গবেষণার বিকাশ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে

যে, গ্যালিলিওর মতটাকেই একমাত্র সত্য হিসেবে আমরা সবাই মেনে চলি। কয়েক হাজার বছর ধরে মানব জাতি পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণাকে সত্য হিসেবে ধরে নিয়েছে, তাই অধিকাংশ মানুষের ভাবনা বা ধারণা মতো কোন বিষয় সত্য হয়ে যায় না। গভীর অনুসন্ধান, ব্যাপক যাচাই ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন ধারণা বা মত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই কেবলমাত্র কয়েক হাজার বছর ধরে কোন বিষয়কে সত্য হিসেবে মেনে নিলেই, প্রকৃত সত্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। 'প্রকৃতি' নিয়ে সুদীর্ঘ কালের প্রচেষ্টায় মানব জাতি যেসব বিজ্ঞানকে গড়ে তুলেছে, তাকে মেনে নিয়েই প্রকৃতি বিষয়ক সত্য কোনটা, সেসব আমরা জানতে পারবো। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র এবং অংক এসবের ভিত্তিতে প্রকৃত সত্যটা জানা সম্ভব।

মানব জাতি এই প্রকৃতিরই একটা অংশ, মানুষ ছাড়া প্রকৃতি জগৎ তো অর্থহীন। তাই মানব দেহও প্রকৃতিরই অংশ, পুরুষ ও নারীর শরীরগত পার্থক্যও প্রকৃতিরই বিষয়।

কিন্তু, সমাজে বিদ্যমান ধনী ও গরিবের পার্থক্য, মালিক ও চাকরের সম্পর্ক এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যকার অসমতা প্রকৃতির বিষয় নয়। এসবের আলোচনা আমরা প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞানের মধ্যে খুঁজে পাবো না। সমাজ বিষয়ক জ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানের অংশ। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে মানুষের সমাজ নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে, এ এক দীর্ঘ শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান। মার্কসকৃত এই অনুসন্ধানের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো।

বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আমরা বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করি – খাদ্য, কাপড়, ঘর-বাড়ি ও ওষুধ এর মধ্যে অন্যতম। যা-কিছুই আমাদের প্রয়োজন সেসব নির্ভর করে সেই সময়কার প্রকৃতি-পরিবেশ এবং ওই সময়ের বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার ওপর। কাপড়ের বিষয়টাই যদি আমরা ধরি তাহলে দেখতে পাবো, শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষের সাথে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের এই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে। আবার একই শীতপ্রধান অঞ্চলকে যদি আমরা পাঁচশ বছর পেছনে নিয়ে বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো তখনকার মানুষের শীতার্ত রাত কাটানোর পোশাক বা ব্যবস্থা এখনকার মতো ছিল না। যদি আমরা একশ বছর সম্মুখে এগিয়ে বিবেচনা করি, তাহলে ভাবতে বাধ্য হবো অনাগত ভবিষ্যতের সেই কালপর্বে পোশাক-কম্বল নিওয় এখনকার মতো থাকবে না। মার্কস প্রকৃতি ও সমাজকে বিশ্লেষণ করতে এভাবে এগিয়েছেন।

আমাদের পূর্ব পুরুষ আদিম মানুষ তীর ও ধনুক ছাড়া জীবন ধারন করতে পারতো না, কিন্তু আজ এর কোন প্রয়োজন নেই। আজ আমরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য

বন্দুক-পিস্তল ইত্যাদি ব্যবহার করি। ব্যাপক বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র তৈরির পেছনে মানব জাতি বিগত কয়েক যুগ ধরে অকল্পনীয় পরিমাণ জাতীয় সম্পদ অপচয় করে চলেছে। এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন মানব জাতি এগুলো ধ্বংস করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠবে।

কলম ও ঘড়ি দৈনন্দিন জীবনেরই অংশ, কিন্তু অতীতে একসময় মানব জাতি এসবের ব্যবহারই জানতো না। আজ এমন জিনিসের ব্যবহারের প্রয়োজন বোধই করছি না, কিন্তু আগামী জীবনে নতুন সেসব জিনিস অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে মোবাইলের ব্যবহারের কথা ভাবতে পারি। সমাজ ও জীবন পরিবর্তনশীল, নতুন প্রয়োজন উপস্থিত হচ্ছে, পুরনো প্রয়োজন কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে।

জিনিসের মূল্য গঠনের ঘটনাকে মার্কস সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধান কাজে বিনিময় ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাসকে মার্কস বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষ বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করে, যত সামান্যই হোক জিনিসের ব্যবহার ছাড়া কারও পক্ষে জীবন ধারনই অসম্ভব। মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন তার সবই নিজেই সে তৈরি করে না। আদিকাল থেকে মানুষ নিজের তৈরি জিনিস অন্যের সাথে বিনিময় করে আসছে। সেই আদিম যুগে মানুষ যখন বন্য জীবন কাটাতো তখন বিনিময়ের বিষয়টা ছিল অতি সরল রূপে। কিন্তু, বিভিন্ন জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে এলাকা ভেদে রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা। উপকূলীয় এলাকার মানুষ কিছু কিছু শাক-সবজি উৎপাদন করতে পারে না, এমন কিছু খাবার আছে যার খবর পাহাড়-পর্বতে বসবাসকারী মানুষ জানেই না, উৎপাদন তো দূরের কথা। গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবন ব্যবস্থায় যেসব মানুষ শিকার করতো, তাদের পক্ষে কাপড় বোনা সম্ভব হতো না। তাই বিনিময় ছাড়া মানুষের পক্ষে জীবন ধারনই সম্ভব নয়। আদিম মানুষ কেবলমাত্র গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিনিময় ব্যবস্থাকে এক সময় অতিক্রম করতে বাধ্য হলো, কারণ সময়ের সাথে প্রয়োজন বেড়ে চলেছিল, তাই বিনিময়ও তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করলো। এভাবে এক গোত্রের সাথে আর এক গোত্রের বিনিময় শুরু হলো।

কয়েক লক্ষ বছর মানব জাতিকে প্রকৃতি থেকে আহার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে ঠিকই, তবে কালের পরিক্রমায় মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে কুশলী হয়েছে। এভাবে উন্নত হাতিয়ার বানাতে শিখে কাঠ ও পাথরের মতো সরল প্রকৃতির হাতিয়ারের উপর নির্ভর করার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে। সে এভাবে যত নিপুণ হাতিয়ার বানাতে শিখেছে, ততই সে বিভিন্ন যন্ত্র উদ্ভাবন করতে পেরেছে। এক জনগোষ্ঠীর উদ্ভাবিত উন্নত যন্ত্রে তৈরি জিনিস আর এক জনগোষ্ঠীর সাথে বিনিময় করা হয়েছে। তাই বিনিময় ক্ষেত্রে রূপের পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই,

তবে বিনিময় ছাড়া মানব জীবন চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব। বিনিময়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে মার্কস এভাবেই তুলে ধরেছেন।

কিন্তু, আজকের দিনে জিনিসের সাথে জিনিসের বিনিময়ের আর প্রয়োজন নেই। অর্থই এখন বিনিময়ের সার্বজনীন মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। 'টাকা' এখন সেই স্থানে অভিষিক্ত হয়েছে, এটাই অর্থের মুদ্রা-রূপ। টাকা বা অর্থের মাধ্যমে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যাওয়ার ঘটনা, বিনিময়ের একটা উচ্চতর রূপ ছাড়া অন্যকিছু নয়। প্রশ্ন আসে এই 'অর্থ' কী? কীভাবেই বা এর উদ্ভব ঘটলো? অর্থ দিলেই আমরা কোন জিনিস পেয়ে যাই কেন? যে অর্থ কাগজের টুকরা ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কস তার *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে এসব ঘটনা কেন ঘটছে, কীভাবে ঘটেছে, এর রূপান্তরের গতিচিত্রটাই বা কী, সেসব বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কেবলমাত্র এই ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, আগামী দিনে এর রূপটাই কেমন হবে, তার একটা রূপরেখাও তুলে ধরেছেন।

সভ্যতার বিকাশ বিচিত্র পথে বিশাল পরিবর্তনের পথ ধরে সামনে এগিয়েছে, আপতত এমনটাই মনে হয়। কিন্তু, এখানেও একটা নিয়ম কাজ করে। এই বিকাশের সূত্র জানতে মার্কস মানব সভ্যতার বিকাশকে ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরে গভীর ও নিবিড় ভাবে অধ্যয়ন করেছেন, যা তার গ্রন্থে তিনি তুলে ধরেছেন। সভ্যতার কাজ দ্বি-মুখী, একদিকে সে ভাঙ্গে, অন্যদিকে একই সাথে সে পুনর্গঠন করে। ধ্বংস ও পুনর্গঠন, সভ্যতার এই দ্বি-মুখী গতিধারাকেই তিনি অনুসন্ধান করেছেন।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে সম্পত্তির বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে, মার্কস তার *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে এসব আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত শ্রমের উপকরণ, ব্যক্তিগত উপভোগের সম্পত্তি, গোষ্ঠীগত সম্পত্তি, পারিবারিক সম্পত্তি, মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক সম্পত্তি, পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক সম্পত্তি, এভাবে সম্পত্তির বিবর্তনের কয়েক হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাসকেই কেবলমাত্র তিনি আলোচনা করেননি, এর গতির সূত্রটা তিনি আবিষ্কার করেছেন। সম্পত্তির সর্বশেষ রূপ যে 'পুঁজি', তাকে সংজ্ঞায়িত করতে তিনি এই দীর্ঘ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পুঁজি হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির যাবতীয় রূপের মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত, সম্পূর্ণ এবং সংহত, তাই নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে পুঁজিই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বশেষ রূপ। তার সারা জীবনের গবেষণার ফসল *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের নামও দিয়েছেন এমনই, যার অর্থ 'পুঁজি'।

বর্তমানে আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি। মার্কস এই পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, গত কয়েক হাজার বছরে মানব

সভ্যতার অগ্রগতিতে যা সম্ভব হয়নি, এই ব্যবস্থা মাত্র কয়েক শতাব্দীতে সভ্যতার বিকাশকে, সেই সময়ের তুলনায়, কয়েক হাজার গুণ বিকশিত করেছে। আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে শিল্পীয় উৎপাদনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা এমন বিস্ময়কর অগ্রগতিকে সম্ভব করেছে। শিল্পে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই ব্যবস্থা, অসংখ্য বিলাসদ্রব্যকে গরিব মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছে, যা এককালে কেবলমাত্র সম্পদশালীরাই ব্যবহার করতো। অন্যদিকে এই ব্যবস্থা একই সঙ্গে গৃহচ্যুত করেছে বিপুল সংখ্যক মানুষকে। পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থা এক নজিরবিহীন সম্পদরাশির মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সেই সম্পদের স্রষ্টাদের বেঁধে রেখেছে ব্যক্তিগত উপভোগের সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পত্তিতে। তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসংগতিকে তুলে ধরে দেখিয়েছেন, এই যুগের সর্বহারাদের পরণে থাকে উন্নত যন্ত্রে উৎকৃষ্টভাবে প্রস্তুত নিকৃষ্ট জামা-কাপড়, যা প্রকৃতির নির্মমতা প্রতিরোধে নিতান্তই অপ্রতুল। তিনি আরও লিখেছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সভ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার এক বিস্ময়কর অবনতি ঘটিয়েছে, আদিম বর্বর মানুষের তুলনায়। সভ্য মানুষের তুলনায় আদিম মানুষ ব্যক্তিগতভাবে পরিপূর্ণতর, কারণ তারা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটানোর মতো সুঠাম ও সক্ষম দেহের অধিকারী। তিনি আরও দেখিয়েছেন, সর্বহারারা যদি কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকার দরুণ কষ্ট পায়, তাহলে অন্যদিকে সম্পদশালীরা শেষ হয় অতি-প্রাচুর্যে শ্রমহীন জীবন কাটিয়ে।

মার্কস মানব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তিনি গ্রিস ও মিশরের প্রাচীন ইতিহাসকে বিবেচনায় নিয়ে বলছেন, উপযুক্ত পরিবেশ ও স্বাধীনভাবে বিকাশের সুযোগ পেলে বর্বর মানুষরাই বস্তুগত ও মননগত বিকাশের কত উচ্চ মাত্রায় পৌঁছাতে পারে, তা অবশ্যই ভাবতে হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার হাজারো অসংগতিকে এভাবে উদঘাটিত করে, তিনি এই ব্যবস্থার অসারতাকে তুলে ধরেছেন। আর এসব অসংগতি ও ঘাটতি উদঘাটনে তার মূল উদ্দেশ্যই হলো, সর্বহারাশ্রেণী এই ব্যবস্থার উচ্ছেদে কোন পথে এবং কীভাবে সামনে অগ্রসর হবে, তাকে আবিষ্কার করা। *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে এসব বিষয় আলোচনা করে তিনি সর্বহারাশ্রেণীর হাতে তুলে দিয়েছেন তার মুক্তির অমোঘ হাতিয়ার।

'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব' মার্কসের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। জিনিসের মূল্য কীভাবে গঠিত হয়, কীভাবে জিনিস পণ্যে রূপান্তরিত হয় – এসব অনুসন্ধান করতে তিনি অর্থনীতি বিদ্যার সমগ্র ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। সমাজ বিকাশের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি মূল্যের বিভিন্ন রূপের রূপান্তর কীভাবে ঘটেছে এবং আগামী দিনে এর রূপ কী হবে, তা *ক্যাপিপাল* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬ সালে অর্থনীতি নিয়ে এরিস্টোটলের লেখা থেকে শুরু করে স্মিথের The *Wealth of*

Nations এবং রিকার্ডোর *The Principles of Political Economy and Taxation* অবধি জিনিসের মূল্য গঠন বিষয়ে যাকিছু বলা হয়েছে, মার্কস তা অধ্যয়ন করেছেন।

উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বও মার্কসের আর এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রয়োজনে তাকে পণ্যের মূল্য রূপ, শ্রম ও শ্রমশক্তির পার্থক্য, শ্রমের পণ্যে রূপান্তর, আবশ্যিক শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রম, উদ্বৃত্ত মূল্য, অর্থ ও অর্থের মুদ্রারূপ, অর্থের পুঁজিতে রূপান্তর এবং পুঁজি থেকে মুনাফার উৎপত্তি – এমন বিষয়গুলোকে আর্থনীতিক যুক্তির বিচারে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এভাবে অর্থনীতি বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন এক ধারার উদ্ভব ঘটেছে, যার ফলে সবকিছুকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মানুষ উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করে আসছে কয়েক হাজার বছর ধরে। কিন্তু একে চিহ্নিত করার প্রথম প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় বাণিজ্যবাদীদের দিক থেকে। তাদের মধ্যে এই মত চালু ছিল যে, তৈরি জিনিসের মূল্যে একটা সংযোজন থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য উদ্ভূত হয়। কিন্তু জেমন স্টুয়ার্ড তখনই বুঝেছিলেন যে, সে ক্ষেত্রে যেটি একজন লাভ করবে, সেটি আরেকজন হারাবে। চিরায়ত অর্থনীতিবিদরা প্রাণপাত করেছেন শ্রম আর পুঁজির মধ্যে মূল্য বন্টনের অনুপাত দিয়ে এই প্রশ্নের সমাধান করতে। তারা জিনিসে মূল্য সংযোজন বা বিয়োজন হিসেবে মুনাফা বা ক্ষতিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। মার্কস স্মিথ এবং রিকার্ডোর মহান উদ্ভাবনের উপর দাঁড়িয়ে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বকে সূত্রায়িত করতে সফল হন। এই দুজন মহান অর্থনীতিবিদ শ্রম ও পুঁজির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সঠিকের কাছাকাছি কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ যেসব ব্যাখ্যা দেন, তাকেই মার্কস পরিপূর্ণ করেন।

তিনি পুঁজিকে বাদুড়ের সাথে তুলনা করে এই বাদুড় কী করে বাঁচে তা ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "বাঁচে কেবল জীবন্ত শ্রমকে শুষে খেয়ে, আর যত বেশি বাঁচে, তত বেশি সে জীবন্ত শ্রমকে শুষে খেয়ে থাকে।"[১০] তিনি পুঁজিকে ব্যাখ্যা করে আরও লিখেছেন, "পুঁজির মাথা দিয়ে, পা দিয়ে আর প্রত্যেকটা রন্ধ্র দিয়েই ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, বেরোচ্ছে অসহ্য পুতিগন্ধ।"[১১]

আবশ্যিক শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রমকে ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন, "উদ্বৃত্ত শ্রম সেই অর্থে উদ্বৃত্ত শ্রম যে, উৎপাদনকারী তার নিজের স্বাভাবিক প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক শ্রম করবে। দাস সমাজ ও সামন্তবাদী সমাজ হয়ে পুঁজিবাদী সমাজ প্রভৃতিতেও এই

---

[১০] পাশুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ -১৪।

[১১] পাশুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ -১২৯।

উদ্বৃত্ত শ্রম কেবল বিরোধের ভূমিকাই গ্রহণ করেছে আর সমাজের এক অংশের সম্পূর্ণ অলসতারই অবলম্বন হয়ে রয়েছে।"[১২]

উদ্বৃত্ত মূল্যকে ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন, "একশো বছর আগের মতোই এখনো সমাজের নিচুতলার শ্রমিকরা উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করছে, আর সমাজের মাথার উপর বসে উঁচুতলার লোকগুলো তাই আত্মসাৎ করে মোটা হয়ে ওঠছে। এই আত্মসাৎ করার ব্যাপারটা ঠিক সাবেক দিনের মতো এক পদ্ধতি ধরে যে চলছে তা নয়, তবে উদ্বৃত্ত মূল্য উদ্বৃত্ত মূল্যই।"[১৩]

সরল ও ছোট বাক্য গঠনরীতি এবং শব্দের পরিমিত ব্যবহাররীতি যার কাছে শিখেছি, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **ড. হাবিব রহমান** স্যারকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। উভয় বাংলায় সুপরিচিত ভিন্ন ধারার চিন্তাবিদ এই লেখক নিজের গ্রন্থ প্রকাশ নিয়ে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই অনুবাদে সকল সহযোগিতা দিয়েছেন, তাই বইটা প্রকাশ মুহূর্তে তাকে স্মরণ না করলে আমি অপরাধীই থেকে যাব, কারণ একমাত্র এই অধ্যাপকের সাহায্যই আমি নিয়েছি। এই গবেষকের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের নয়, তার দুটো শ্রমসাধ্য গবেষণা গ্রন্থের সূত্রেই এই পরিচয়। তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের প্রগতিপন্থী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।[১৪]

আমরা এখন এই দীর্ঘ যাত্রা শুরু করতে পারি। এ হবে এক শ্রমসাধ্য যাত্রা, যাত্রার শেষ পর্যন্ত যারা থাকবেন, তারা সবাই মার্কসের চিন্তায় বিশ্বাসী হবেন, ঘটনা কখনই এমন হবে না। তবে একটা ঘটনা অবশ্যই ঘটবে, শ্রমের প্রতি এক শ্রদ্ধা-ভক্তির মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠবে, ফলে মানব জাতির এক বিশাল অংশ, শ্রমই যাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, তাদেরকে দেখার মনোভাবটাই পাল্টে যাবে, এভাবে মার্কসের এই মহাকৃতি যথাযোগ্য স্থানে অভিষিক্ত হবে। ফলে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই মনবতাবাদী তার যোগ্য সম্মান পেয়ে যাবেন। যাত্রাটা শুরু করা যাক।

তারিখ : ফেব্রুয়ারি ২০১২ **শেখর রহিম**

---

[১২]. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ -১২১।

[১৩]. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ -১২২।

[১৪] ড. হাবিব রহমান, (১) *বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ইতিহাস কতিপয় প্রসঙ্গ*, ধ্রুবপদ, প্রথম প্রকাশ বিজয় দিবস ২০১০ এবং (২) *বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন*, কলকাতা, ২০০৯।

প্রথম খণ্ড: প্রথম অংশ

পণ্য এবং অর্থ

(Commodities and Money)

অধ্যায় এক

পণ্যের দুই উপাদান

(Two aspects of a Commodity)

পুঁজির বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীর সংখ্যা নিরবচ্ছিন্নভাবে কমতে থাকে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একচেটিয়া অবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে ব্যাপক দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দশা, অত্যাচার-উৎপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন আর শোষণ; আর এর সাথেই বেড়ে চলে শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ-বিপ্লব। সবকিছু সত্ত্বেও পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে পুঁজিবাদী উৎপাদন ধারার মধ্য দিয়েই দ্রুত বেড়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা, তারা হয়ে ওঠে সুশৃঙ্খল, একতাবদ্ধ, সুসংগঠিত। পুঁজির যে একচেটিয়া অবস্থা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে আবির্ভূত হয় এবং বেড়ে ওঠে, পুঁজির সেই একচেটিয়া অবস্থাই সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার সামনে এক দুরতিক্রম্য বাধা হয়ে দাড়ায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত অবস্থা আর শ্রমের সামঞ্জস্যহীন সামাজিক রূপ ক্রমশ বেড়ে শেষে এমন এক সীমায় এসে পৌছায়, যেখানে ওগুলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার খোলসের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। তখনই এই খোলস ফেটে যায় টুকরো টুকরো হয়ে, পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে; শুরু হয় বঞ্চনাকারীদের বঞ্চিত হওয়ার পালা।

–কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৬৬।

পণ্যের রয়েছে দুটো উপাদান : ১. ব্যবহারিক মূল্য ও ২. বিনিময় মূল্য।

১. ব্যবহারিক মূল্য (Use Value)

কোন জিনিস বা দ্রব্য মানুষের কোন না কোন অভাব পূরণ করে। এই ব্যবহারিক উপযোগিতাই হচ্ছে ওই জিনিসের ব্যবহারিক মূল্য।

চাল – খাবার হিসেবে আমাদের কাজে লাগাই।
পানি – পানীয় হিসেবে আমারা গ্রহণ করে তৃষ্ণা মেটাই।
কম্বল – শীতার্ত শরীরকে ঢেকে গরম করে শীত নিবারণ করি।
জুতা – হাঁটার সময় পা দুটোকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করি।
চেয়ার – বসার কাজে লাগাই।
কলম – লেখার কাজে ব্যবহার করি।

এভাবে বিভিন্ন জিনিস আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে। জিনিসের এই উপযোগিতা গুণই হচ্ছে তার ব্যবহারিক মূল্য। ব্যবহারিক মূল্যের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে তুলে ধরা হলো :

১. ব্যবহারিক মূল্য প্রাকৃতিক :

ব্যবহারিক মূল্য হচ্ছে কোন জিনিসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। ব্যবহারিক মূল্য কোন জিনিসের বাইরে ওই জিনিসের সাথে সম্পর্কহীনভাবে অবস্থান করতে পারে না। যদি একটা আমের সুমিষ্ট গুণাবলি থাকে, সেটা ওই আমের ভৌত গুণাবলিরই একটা বৈশিষ্ট্য, যা ওই আমের একটা অবিচ্ছেদ্য গুণ, আমের বাইরে যার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আমের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন বিভিন্ন বিষয়, আমের ব্যবহারিক মূল্যের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না, যেমন – কে এটাকে ফলালো, কতটা সময় কতজন মানুষের শ্রম এর পেছনে কাজ করেছে এবং কোন্ অঞ্চল থেকে কোন্ অঞ্চলে এটা এসেছে। ব্যবহারিক মূল্য কেবলমাত্র ওই জিনিসের অন্তর্নিহিত অর্থাৎ সহজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত, যা প্রাকৃতিক ভাবে ওই জিনিস অর্জন করে। কোন জিনিসের ব্যবহারিক মূল্য কমে যেতে পারে বা বিলুপ্ত হতে পারে, যখন তার এই প্রাকৃতিক গুণাবলি কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। একটা পচা ফলের কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকে না, একটা ছেঁড়া জুতা এবং একটা ছিন্নভিন্ন কম্বলের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই। এসব জিনিস তাদের ব্যবহারিক মূল্য হারিয়ে ফেলেছে, কারণ এদের প্রাকৃতিক গুণাবলি নষ্ট হয়ে গেছে। ব্যবহারিক মূল্যের বিদ্যমানতা থাকা বা না-থাকাটা, ওসব জিনিসের প্রাকৃতিক গুণাবলির ওপরেই নির্ভর করে।

২. বিভিন্ন 'জিনিস' ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য :

কোন জিনিসের ব্যবহারিক মূল্য ভোগ করতে আমরা ওই জিনিস ব্যবহার করে থাকি। কোন জিনিসকে দূরে রেখে ওই জিনিসের ব্যবহারিক মূল্য ভোগ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়, কারণ কোন জিনিস ব্যবহারিক মূল্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না।

৩. একটা জিনিস পৃথকভাবে ব্যবহার করা যায় :

জুতার ব্যবহারিক মূল্য কাজে লাগাতে জুতা পরাটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এমন কোন নিয়ম নেই, যেখানে জুতা বা অন্য কোন জিনিস ব্যবহার করতে আমাদেরকে জুতা বা অন্য ওই জিনিসটার সাথে অন্য কোন জিনিস ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে এমন কোন সম্পর্কের নিয়মবদ্ধতা থাকতে পারে না, যাতে করে প্রথম জিনিসটার ব্যবহারিক মূল্য ভোগ করতে দ্বিতীয় আর একটা জিনিস অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ দ্বিতীয় জিনিসটা না থাকলে

প্রথম জিনিসটা কোন উপকারে আসবে না। আমরা যে-কোন জিনিস একক বা পৃথক ভাবে ব্যবহার করতে পারি। আমরা কোন ব্যবহারিক মূল্যকে পৃথক ভাবে বা অন্য কোন জিনিসের সাথে কাজে লাগাতে পারি।

৪. ব্যবহারিক মূল্যের ওপর মালিকের একক মালিকানা স্বত্ব থাকে না :

কোন জিনিস এক জনের উপকারে আসে কিন্তু অন্যের উপকারে আসে না, এমন ঘটে না। একটা কম্বল যে-কেউ নিজেকে ঢাকতে ব্যবহার করুক না-কেন, লোক ভেদে এর উপযোগিতার কোন তারতম্য ঘটে না, একই থেকে যায়। একটা খাটিয়ার উপযোগিতা একই থাকে, এর ওপর যে-কেউ শয্যা গ্রহণ করুক না কেন। একই বয়সের যে-কেউ এক জোড়া জুতা ব্যবহার করুক না কেন, জুতার ব্যবহারিক উপকারিতা একই থেকে যায়। কোন নির্দিষ্ট জিনিসের ব্যবহারিক মূল্য একই থেকে যায়, যে-কেউ তাকে কাজে লাগাক না কেন।

৫. কোন ব্যবহারিক মূল্য উচ্চতর বা নিম্নতর হতে পারে না :

একটা কম্বলের ব্যবহারিক মূল্য এক জোড়া জুতার ব্যবহারিক মূল্যের চেয়ে উচ্চতর বা নিম্নতর হতে পারে না। প্রত্যেকটা জিনিসের নিজস্ব উপকারিতা রয়েছে, একটা জিনিসের উপযোগিতার সাথে অন্য একটা জিনিসের উপযোগিতার কোন তুলনা চলে না। কম্বল যে উপকার করে, জুতা সেই উপকার করতে পারে না। একটা কুল কাঠালের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে না। একটা সাত-তলা ভবন একটা ছোট চামচের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে না। একটা চামচের যখন প্রয়োজন হয়, একটা সাত-তলা ভবন দিয়ে সেই কাজ মিটবে না। একটা চামচ যে উদ্দেশ্যে লাগে, সাত-তলা ভবন দিয়ে সেটা পূরণ হয় না। কাগজ আটকাতে একটা ক্ষুদ্র পিন যখন প্রয়োজন হয়, অন্য কোটি কোটি জিনিস দিয়ে সেই কাজটা হবে না। যখন এক জোড়া জুতার প্রয়োজন, তখন একটা মোটা বই দিয়ে এই প্রয়োজনটা মিটবে না। একটা চকচকে মূল্যবান সিল্কের কোট দিয়ে, একটা ক্ষুদ্র পেন্সিলের প্রয়োজন মিটবে না। প্রত্যেকটা প্রয়োজন মিটাতে এমন এক একটা জিনিসের দরকার, যা একক ও স্বতন্ত্র ভাবে ওই জিনিস পূরণ করতে পারে। সেহেতু, যখন আমরা ব্যবহারিক মূল্যের দিকটা বিবেচনা করব, জিনিসের নিজস্ব বিশেষ গুণাবলিকেই আমরা দেখতে পাব।

৬. ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্যও ব্যবহারিক মূল্যের তারতম্য ঘটে :

ধরা যাক, দুটো জিনিস তাদের নিজস্ব সকল বৈশিষ্ট্যের বিচারে একই, কিন্তু এদের একটা বা দুটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন ঘটলে, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একক বিশেষত্বের মধ্যে পার্থক্যের উদ্ভব ঘটবে। একই মাপের, একই রঙের এবং একই সুতা দিয়ে তৈরি দুটো কম্বল রয়েছে, যাদের উৎপাদনের ধরনও

(ফিনিসিং) একই। কিন্তু একটা কম্বলের রয়েছে ছোট বর্ডার দেওয়া। ফলে তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্যের উদ্ভব ঘটে এবং তাদের ব্যবহারিক মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে। যিনি বা যারা বর্ডার দেওয়া কম্বল পছন্দ করেন না, তাদের প্রয়োজন বর্ডার দেওয়া কম্বল দিয়ে পূরণ হবে না। যেহেতু বর্ডারছাড়া কম্বলই তারা চান, বর্ডারছাড়া কম্বলের ব্যবহারিক মূল্যই তাদের চাহিদা পূরণ করবে। এভাবে দুটো কম্বলের কেবলমাত্র একটায় ছোট বর্ডার থাকার কারণে দুটা কম্বলের ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের উদ্ভব ঘটছে। আমাদের উদাহরণ সরল করার জন্য এমন ধরনের খুবই ছোট পার্থক্যকে বিবেচনায় নেওয়ার দরকার নেই, সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি বর্ডারছাড়া ও বর্ডার আছে এমন দুটো কম্বলের ব্যবহারিক মূল্য একই।

৭. ব্যবহারিক মূল্য তুলনাযোগ্য :

যদি কেবলমাত্র পরিমাণে (গঠন) পার্থক্য থাকে এবং ব্যবহারিক মূল্যে কোন পার্থক্য না থাকে, বিভিন্ন ব্যবহারিক মূল্যকে আমরা 'কোনটা বেশি এবং কোনটা কম' এভাবে তুলনা করতে পারি। কোন জিনিস একই ধরনের বস্তুর হলে, সেক্ষেত্রে জিনিসের ছোট বা বড় এমন আকারের কারণে ব্যবহারিক মূল্যের তারতম্য ঘটবে। এখানে কোন্ জিনিসটা পরিমাণে বেশি হওয়ার কারণে বেশি উপকার দিবে, এটা বিবেচনা করতে হবে। একই ধরনের চাউলের ক্ষেত্রে ২ কেজি চাউলের ব্যবহারিক মূল্য ১ কেজি চাউলের চেয়ে বেশি হবে। এভাবে ৩ কেজি চাউলের ব্যবহারিক মূল্য আরও বেশি হবে। চাউলের পরিমাণ আমরা যদি বাড়াতে থাকি, তাহলে দেখা যাবে বেশি পরিমাণ চাউল দিয়ে বেশি লোকের খাবারের প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হবে, অথবা একজন লোক অনেক বার খাবারের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৭ ইঞ্চি লম্বা এমন দুটো পেন্সিলের মধ্যে তুলনা করলে, আমরা দেখতে পাবো অধিকতর লম্বা পেন্সিল দিয়ে বেশি উপকার পাব। যদিও একটা বড় ও ছোট চেয়ারের মধ্যে এমন তুলনা প্রযোজ্য হবে না। এভাবে চেয়ার, জুতা এবং শার্টের মতো জিনিসের ক্ষেত্রে আকারে ছোট এবং বড়র কারণে বেশি লোকের উপকারে আসবে, ব্যাপারটা এমন ঘটছে না বিধায়, তাদের আকারের পার্থক্যের কারণে ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটবে না।

এক বা একের অধিক ব্যক্তির উপকারে আসে এই বিবেচনায়, একই ধরনের বস্তু রয়েছে এমন প্রকৃতির জিনিসের ক্ষেত্রে পরিমাণের কম-বেশির কারণে ব্যবহারিক মূল্যের তারতম্য ঘটবে। এসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যবহারিক মূল্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত কয়েক মিলিয়ন বস্তুর মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোন বস্তু নির্দিষ্ট ভাবেই আমাদের কাজে লাগে, ইতিহাসে সংঘটিত আবিষ্কারগুলো এসবই উদঘাটিত করে নানাভাবে আমাদের উপকার করে চলেছে। একটা বস্তুর নতুনতর

নানাবিধ ব্যবহারের ঘটনা যেমন প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হচ্ছে, তেমনিভাবে নতুন নতুন নানাবিধ বস্তুও আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। মানব জাতির দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন ব্যবহার-মূল্য ক্রমান্বয়ে এভাবে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

২. বিনিময় মূল্য (Exchange Value) :

বিনিময় মূল্য হচ্ছে পণ্যের দ্বিতীয় উপাদান। বিনিময় মূল্য এমন বৈশিষ্ট্য যা একটা পণ্য বিনিময় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্জন করে। মূল্য হচ্ছে বিনিময় মূল্যেরই সংক্ষিপ্ত নাম। যখনই আমরা মূল্য শব্দটার মুখোমুখি হবো, একে ব্যবহারিক মূল্য নয়, বিনিময় মূল্য হিসেবে ধরে নিতে হবে। বিনিময় মূল্যের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে তুলে ধরা হলো :

১. বিনিময়ের জন্য দুটো জিনিস অবশ্যই থাকতে হবে :

ব্যবহারিক মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একই সময়ে দুটো জিনিসের উপস্থিতির কোন আবশ্যকতা নেই, কথাটা কি ঠিক নয়? কিন্তু বিনিময় মূল্য উশুলের ক্ষেত্রে একই সময়ে দুটো জিনিসের উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। 'বিনিময়' কথাটার অর্থই হলো 'একটা জিনিস দেওয়া এবং অন্য একটা জিনিস নেওয়া', সেহেতু বিনিময়ের জন্য দুটো জিনিস অবশ্যই লাগবে।

২. একমাত্র ভিন্ন ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যেই বিনিময় ঘটে :

একটা জিনিস দেওয়া এবং অন্য একটা জিনিস নেওয়ার অর্থ কি একই ধরনের দুটো জিনিস দেওয়া-নেওয়া বুঝায়? এটা কি একই ধরনের এক জোড়া জুতা দেওয়া ও অন্য এক জোড়া জুতা নেওয়াকে বুঝায়? যদি উভয় জিনিস, যা দেওয়া ও যা নেওয়া হচ্ছে, একই প্রকৃতির হয়, তবে মোটের ওপর বিনিময় করার প্রয়োজন হচ্ছে কেন? যা দেওয়া হচ্ছে তার সাথে তুলনায় ভিন্ন ধরনের জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে বিধায় বিনিময়ের আবশ্যকতা তৈরি হয়েছে। একই ধরনের দুটো জিনিসের মধ্যে কখনই বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা দেয় না, অর্থাৎ একই ধরনের দুটো জিনিসের ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে। যদি বিনিময় ঘটে, দুই ধরনের দুটো জিনিস লাগবে।

৩. বিনিময়ের জন্য দুটো জিনিসকে দুই ভিন্ন মালিকানায় থাকতে হবে :

বিনিময়ের সাথে জড়িত দুটো জিনিস একই ব্যক্তির মালিকানায় থাকে না, দুই ভিন্ন মালিকানায় থাকে। এক ব্যক্তির মালিকানায় রয়েছে এমন দুটো জিনিসের মধ্যে বিনিময় কার্যকর হয় না, আর এটার কোন প্রয়োজনই নেই। কারণ তার দখলে রয়েছে এমন সব জিনিস ওই ব্যক্তি স্বাধীনভাবেই ব্যবহার করতে পারে। এটা ঘটে যখন অন্যের কাছে রয়েছে এমন জিনিসের তার প্রয়োজন পড়ে, যা সে নিজের

দখলে থাকা জিনিস বিনিময় করেই পেতে পারে। এভাবে দুই ভিন্ন ব্যক্তির মালিকানায় রয়েছে এমন দুই ধরনের জিনিসের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়। একমাত্র এভাবেই বিনিময় ঘটে। এগুলোই হলো বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটা শর্ত।

'বিনিময় মূল্য' বলতে কী বুঝায় আমরা এখন সেটা দেখতে পারি।

ধরা যাক, একজন কাঠমিস্ত্রি কাঠ দিয়ে একটা 'চেয়ার' তৈরি করল এবং একজন তাঁতিকে চেয়ারটা দিয়ে বিনিময়ে একটা 'কম্বল' ক্রয় করল। এখানে চেয়ার ও কম্বলের মধ্যে একটা বিনিময় সংঘটিত হলো। উভয় পক্ষ এই বিনিময়ে রাজি ছিল, কারণ চেয়ারের মালিক মনে করেছে : "আমার চেয়ার কম্বলের সমান"। কম্বলের মালিকও এমনই মনে করেছে, যেহেতু সে তার কম্বলটা দিয়ে চেয়ারটা নিতে রাজি হয়েছে। উভয় পক্ষের কেউই মনে করেনি যে, সে একটা জিনিসের 'বেশি' দিচ্ছে এবং অন্য একটা জিনিসের 'কম' নিচ্ছে। উভয়ের দৃষ্টিতে এই জিনিস দুটো সমান মনে হয়েছে, সেহেতু উভয় ব্যক্তির কারোরই এই বিনিময়ে কোন আপত্তি ছিল না। এটার অর্থ হলো, দুটো জিনিসের মধ্যে সংঘটিত বিনিময়ের ঘটনা, জিনিস দুটো 'সমান' এটাই প্রকাশ করে। একমাত্র এই কারণেই তাদের মধ্যে 'বিনিময়' সম্ভব হয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে : কোন বিবেচনায় জিনিস দুটো সমান হচ্ছে?

আমরা আগেই জেনেছি, একই ধরনের জিনিসের মধ্যে কখনও 'বিনিময়' ঘটে না, কেবলমাত্র ভিন্ন ধরনের জিনিসের মধ্যেই বিনিময় ঘটে। তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার-মূল্য রয়েছে এমন বিভিন্ন জিনিস সমান, কথাটার অর্থ কী? কী কারণে বা কোন্ বিবেচনায় তারা সমান হচ্ছে? চেয়ার আর কম্বলের ওজন কি সমান? লম্বায়ও কি তারা সমান? উপকারিতার বিবেচনায়ও কি তারা সমান? চেয়ারের কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলো কম্বলের কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলোর সমান?

না, ভৌত গুণাবলির বিনেবচনায় তাদের উভয়ের মধ্যে সমরূপ বৈশিষ্ট্য নেই। চেয়ারের সকল গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য কম্বল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপযোগিতার বিবেচনায় চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে কোন মিল নেই। যেহেতু চেয়ার এবং কম্বলের রয়েছে দুই ভিন্ন ব্যবহার-মূল্য, ভৌত গুণাবলির বিবেচনায় তাদের মধ্যে কোন মিল নেই। উভয়ের রয়েছে এমন সমান কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবেচনায় তাদের মধ্যে বিনিময় ঘটে? চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে বিনিময় যে ঘটেছে, এটা তো ঠিক? কখন একটা জিনিস দেওয়ার এবং অন্য একটা জিনিস নেওয়ার ঘটনা ঘটে, এর অর্থ হয় উভয়ে কোন-না-কোন বিবেচনায় পরস্পরের সমান, এমনটা কি ঘটছে না? তাহলে

ওগুলো কি তাদের এমন (বস্তুগত) গুণাবলি, যেগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে তাদের বস্তুগত গঠনের বাইরে, কিন্তু সম্পর্কিত রয়েছে ওসব গুণাবলির সাথে! অর্থাৎ, কীভাবে ওই জিনিস দুটো সমান হতে পারে! এ এমন এক বহিঃস্থ গুণাবলি যা অন্তঃস্থ গুণাবলির মতই জিনিসের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে থেকে যাচ্ছে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন জিনিসের দেখা পাই, যেমন : মাটি, কাঠ, তামা, পিতল, সোনা, তুলা, উল এবং সিল্কের তৈরি বিভিন্ন জিনিস; চাউল, ভুট্টা, গম, দুধ, মাখন এবং ঘি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন জিনিস। আমরা প্রত্যেকেই কিছু পরিমাণ চাউলের সাথে কিছু ময়দা বা শাক-সবজির বিনিময়ের ঘটনা দেখেছি, কিন্তু একটা মাটির পাত্রের সাথে একটা সোনার চেইনের বিনিময় আমরা সাধারণত দেখি নাই। আমরা সাধারণ ধারণা দিয়ে বুঝি মাটির পাত্রের 'মূল্য' সোনার চেইনের তুলনায় খুবই কম।

এটা সেই 'মূল্য' যার অনুসন্ধানে আমরা এতক্ষণ খুঁজে ফিরেছি। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে প্রতিটা পণ্যের একটা নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে। আমরা আরও জানি যে কিছু পণ্যের মূল্য বেশি আর কিছু পণ্যের মূল্য কম। যেহেতু মাটির পাত্রের 'মূল্য' খুবই কম এবং সোনার চেইনের 'মূল্য' অনেক বেশি, তাই সোনার চেইনের মালিক মাটির পাত্রের সাথে বিনিময়ে রাজি হবে না। সোনার চেইন এবং মাটির পাত্রের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে কখনও কোন বিনিময় ঘটে না, কারণ মূল্যের বিচারে তাদের মধ্যে রয়েছে বিশাল পার্থক্য।

আমরা এখানে পরীক্ষা করছি কিসের বিচারে দুটো জিনিস সমান হয় যখন তাদের মধ্যে বিনিময় ঘটে; এমনটা নয় কি? এটা হচ্ছে সেই 'বিনিময় মূল্য' যা বিনিময়ের সাথে সম্পর্কিত। বিনিময় মূল্য হচ্ছে সেই মূল্য যার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে 'বিনিময়' সংঘটিত হয়।

যদি চেয়ার ও কম্বলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে চেয়ার এবং কম্বল উভয়ের কিছু মূল্য রয়েছে, যা সমান। একজন ব্যক্তি যিনি চেয়ারটা দিচ্ছেন এবং কম্বলটা নিচ্ছেন, তিনি যে মূল্যটা দিয়েছেন সেটাই আবার ফেরত পেয়ে যাচ্ছেন। কম্বলের মালিকের জন্যও ঘটনাটা একই। চেয়ারের মালিক এবং কম্বলের মালিক তাদের চেয়ার ও কম্বল বিনিময়ে ইতস্তত করবে না, কারণ চেয়ার ও কম্বলের মূল্য সমান।

'বিনিময় মূল্য' বলতে কি বুঝায়?
একটা পণ্য কীভাবে বিনিময় মূল্য অর্জন করে?

কখন একটা পণ্য ব্যবহার-মূল্য অর্জন করে, এটার কারণ কী, তা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। একটা পণ্য এটা অর্জন করে, কারণ পণ্যটা তার ভৌত গুণাবলি

দিয়ে মানুষের কোন-না-কোন অভাব পূরণ করে। কিন্তু একটা পণ্য তার ভৌত গুণাবলির সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক না রেখেই কীভাবে বিনিময় মূল্য অর্জন করে? এটা কীভাবেই বা গঠিত হয়? বিনিময় মূল্য বলতে সঠিক অর্থে সুনির্দিষ্টভাবে কী বোঝায়? তাই বিনিময় মূল্য কী এবং কীভাবে এটা আকার পায় এটা জানতে বিনিময়ের সাথে সম্পর্কিত দুটো পণ্যকে দেখতে হবে।

ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে উদাহরণ থেকে আমরা জেনেছি যে, চেয়ার ও কম্বলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়েছে, এটা নয় কি? কোথা থেকে এই দুটো জিনিস এসেছে? লাউ গাছ থেকে লাউ এবং বেগুণ গাছ থেকে আমরা বেগুণ পাই, তেমনি একটা গাছ থেকে চেয়ারগুলো এবং অন্য একটা গাছ থেকে কম্বলগুলো কি আমরা পেয়েছি? অথবা চেয়ার ও কম্বল ওই দুটো জিনিস কি আমরা আকাশ থেকে পেয়েছি? যেমন বৃষ্টির পানি আমরা মেঘ থেকে পাই। চেয়ার ও কম্বল ওই দুটো জিনিস কীভাবে আমাদের কাছে আসলো? সঠিক উত্তর হলো, মানুষই এগুলো তৈরি করেছে বা আহরণ করেছে। মানুষ এগুলো তৈরি না করলে, পৃথিবীতে এগুলো আসতই না। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ যা কিছু তৈরি করে তাই 'জিনিস'। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত এমন সবকিছু, যার ওপর মানুষের কোন হাত নেই, এমন সবকিছুকে আমরা জিনিস বলবো না, এগুলো প্রাকৃতিক বস্তু। বাতাস একটা প্রাকৃতিক বস্তু। বৃষ্টির পানিও প্রাকৃতিক বস্তু। পাহাড়, হাওড় এবং অকৃষিত পতিত জমি এসবই প্রকৃতির দান, প্রাকৃতিক বস্তু। মানুষ এগুলোর কোনটাকেই তৈরি করেনি, তাই এগুলোকে আমরা 'জিনিস' বলব না।

এখন আমরা দেখবো মানুষ কীভাবে জিনিস তৈরি করে? চেয়ারকেই আমরা এক্ষেত্রে দেখতে পারি, চেয়ার তৈরি করতে হলে প্রথমেই আমাদের 'কাঠ' লাগবে।

প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয়েছে এমন একটা বনের কথা আমরা ধরতে পারি। এর অর্থ হলো বনের গাছগুলো নিজেরাই বৃদ্ধি পেয়ে বনটা গড়ে ওঠেছে, যেখানে মানুষের কোন ভূমিকা নেই। নিজের প্রয়োজনে মানুষ এই বনটা তৈরি করেনি। ধরা যাক, বিনয় নামের এক ব্যক্তি এই বনে গিয়ে একটা গাছ কাটল এবং গাছের সব ডালপালা কেটে একটা কাঠের লগ বানিয়ে ফেলল। এই লগ থেকে সে তক্তা তৈরি করল। এভাবে গাছের পরিবর্তে বিনয় কাঠের নতুন তক্তা পেল। বিনয় নিজের শ্রম দিয়ে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট গাছকে তক্তায় রূপান্তরিত করল। এখানে কাঠের এসব তক্তাই হলো 'জিনিস'। তক্তাগুলো সবই এখন বিনয়ের মালিকানায় এসে গেছে। অন্যভাবে বলা যায় তক্তাগুলো সবই বিনয়ের সম্পত্তি। এভাবে সে তক্তাগুলোকে ব্যবহারের অধিকার পেয়ে গেল। গাছটা যখন বনে ছিল গাছের মালিক কেউই হতে পারেনি, কিন্তু গাছটা কাটার পর থেকে লগ বানান এবং তা থেকে তক্তা তৈরি,

এভাবে বিনয় তক্তাগুলোর মালিক হতে পারল। কেবলমাত্র বিনয় নয় কেউই বনের গাছের মালিক হতে পারে না। বিনয়ই নয় কোন মানুষই বনে গাছ জন্মানোর ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই রাখেনি, তাই বনের গাছের কোন মালিক ছিল না। বনের সকল গাছ 'মানুষের শ্রম' ছাড়াই জন্মেছে এবং বেড়ে ওঠেছে, সেহেতু এসব গাছের ওপর কারো কোন 'যুক্তিসংগত অধিকার' বর্তাতে পারে না। তাই কেউই এটা বলতে পারে না যে, "আমি এই গাছটা রোপন করেছি, সুতরাং এই গাছটা আমার"। যাহোক বিনয়ও এই গাছটার মালিক না হয়েও সে এই গাছ থেকে উৎপাদিত তক্তাগুলোর মালিক হলো। সে এখন এসব কাঠের তক্তার মালিক, তার এই অধিকার যুক্তিসংগত এই কারণে যে, সে-ই এই গাছটাকে কেটেছে এবং গাছের গুঁড়ি থেকে তক্তাগুলো তৈরি করে নিয়েছে।

এখানে আমরা অন্য একটা উদাহরণকে বিবেচনা করব। বিনয়ের সাথে বিকাশও বনে গেল। বিনয় যখন একটা গাছ কাটছিল বিকাশ তখন অলস ভাবে একটা গাছের গোড়ায় বসে সময় পার করল। ইতিমধ্যে বিনয় গাছের ডালপালা কেটে লগ তৈরি করে গাছ থেকে তক্তা বানিয়ে ফেলল। এখানে বিকাশের পক্ষে এই তক্তার মালিকানা দাবি করার যুক্তিসংগত কোন ভিত্তি থাকতে পারে না। এই তক্তাগুলো তৈরি করতে যে পরিমাণ শ্রম বিনয়কে দিতে হয়েছে, সেই পরিমাণ শ্রম দিয়ে তৈরি এমন কোন জিনিস দিয়েই কেবলমাত্র বিকাশের পক্ষে এই তক্তাগুলো পাওয়া সম্ভব। অথবা বিনয়ের ব্যয়িত শ্রমের যে মূল্য সেই পরিমাণ অর্থ দিয়েই বিকাশ এই তক্তাগুলোকে পেতে পারে। একটা জিনিস দেওয়ার অর্থ হলো তার বিনিময়ে সম পরিমাণ 'মূল্য' পাওয়া। কাঠের তক্তাগুলো নেওয়া এবং অন্য জিনিস দেওয়ার অর্থ হয় কাঠের তক্তাগুলো এবং ওই জিনিসটার মধ্যে একটা বিনিময় সংঘটিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনয়ের তক্তাগুলোর পরিবর্তে বন থেকে অন্য একটা গাছ নিতে চাইলে, সে ওই গাছটার পরিবর্তে কাউকে কিছু না দিয়েই সেটা নিতে পারবে। বিনয়ও গাছটা কাটার আগে কাউকে কিছু দেয়নি। এর অর্থ হলো, বিনয় ওই গাছটাকে কোন কিছুর সাথে 'বিনিময়' করেনি। কেন এটা সম্ভব হচ্ছে? এখানে যাকিছু ঘটছে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে – গাছের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টা অনুপস্থিত, কিন্তু তক্তার ক্ষেত্রে তারই উপস্থিতি রয়েছে? সেটা কিন্তু অন্যকিছু নয় মানুষের শ্রম ব্যতীত! এটাই কিন্তু গাছ ও তক্তার ভেতর পার্থক্য তৈরি করেছে। গাছ যেহেতু প্রাকৃতিক ভাবে বনে তৈরি হয়েছে, বনের গাছের ক্ষেত্রে মানুষের শ্রমের কোন ভূমিকা নেই। সেহেতু এক্ষেত্রে গাছের মালিকানা দাবির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই, বিনয় বা বিকাশ বনের যেকোন গাছ কেটে নিতে পারে। কিন্তু

কোন ব্যক্তি মালিকের বা সরকারি পরিকল্পনায় সৃজিত বনের ক্ষেত্রে বিষয়টা ভিন্ন, কারণ সেখানে মানুষের শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে। তাই বিকাশ বা বিনয় এমন কারও পক্ষে সৃজিত এই বনের কোন গাছের মালিকানা স্বাধীনভাবে দাবি করা সম্ভব হবে না। একমাত্র প্রকৃতির দেওয়া যে-কোন বস্তু যে-কেউ বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারে। কারণ ওই বস্তুটা 'জিনিস' হতে পারেনি।

বনের গাছ জিনিস নয়, কিন্তু কাঠের তক্তাগুলো জিনিস। প্রকৃতি বনের গাছগুলো দিয়েছে কিন্তু তক্তাগুলো দেয়নি। 'বন' কোন জিনিস নয়, কিন্তু 'বাগান' একটা জিনিস। প্রকৃতি বন দিয়েছে কিন্তু বাগান দেয়নি। তাই মানুষের শ্রমে সৃজিত বাগানের গাছ জিনিস হিসেবে গণ্য হবে। মানুষ বাড়িতে যেসব পশু লালন-পালন করে তা জিনিস, কিন্তু বনের পশু জিনিস নয়। এটা অদ্ভুতই মনে হয়, কিন্তু এখানে অবাক হবার কোন কারণ নেই। আমরা 'জীববিদ্যা'র আলোকে এসব দেখছি না, আমরা এখানে সবকিছু 'অর্থনীতি'র আলোকে দেখছি। অর্থনীতির আলোকে আমরা যখন দেখছি, তখন জীবপ্রাণ নিয়ে নয় আমরা মানুষের শ্রমকে কেন্দ্র করে সবকিছু পরীক্ষ-নিরীক্ষা করছি, মানুষের শ্রম ব্যয়িত হয়েছে কিনা সেটাই আমরা বিবেচনা করছি। জীববিদ্যা প্রকৃতি এবং সেখানে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে আর অর্থনীতি বিদ্যা মানুষের সমাজ এবং সেখানে ঘটে চলা নানা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে। কোন কিছু জীববিদ্যার আলোকে জিনিস হতে পারে, আবার ওই একই বস্তু অর্থনীতির আলোকে জিনিস নাও হতে পারে।

'সঠিক' অর্থনীতি বিদ্যার শিক্ষা অনুসারে অকৃষিত জমি বা বনের উপর কারও মালিকানার প্রশ্ন আসতে পারে না। কিন্তু সমাজে দৈনন্দিন জীবনে এসব বন বা অকৃষিত জমির উপর আমরা 'ব্যক্তি মালিকানা'র উপস্থিতি দেখি। আমরা আরও লক্ষ করি যে এসব বন বা অকৃষিত জমিতে যারা শ্রম দিচ্ছে, তাদের কোন মালিকানা-অধিকার নেই, কিন্তু যারা কখনও শ্রম দেয় না তাদের মালিকানা-অধিকার রয়েছে আর তাদের অধিকারে রয়েছে বিশাল সম্পত্তি। আমরা যতই অগ্রসর হবো জানতে পারব এসব ক্ষেত্রে সমাজে কী ঘটছে, কেন এসব ঘটছে এবং বর্তমানে বিদ্যমান মালিকানা ব্যবস্থায় ত্রুটি কোথায়। আমাদের 'একটা জিনিস কী' কেবলমাত্র এটা জানলেই হবে না, দৈনন্দিন জীবনে 'কেন এমন অবস্থা' চলছে এটা জানতে হবে। আমাদের আরও জানতে হবে বর্তমান ব্যবস্থায় জিনিসের অবস্থান যথার্থ পর্যায়ে রয়েছে কিনা, এটা কি সঠিক। আমরা যদি এটাকে সঠিক অবস্থানে বা ব্যবস্থার মধ্যে না দেখি, তাহলে এটাকে পরিপূর্ণ ভাবে জেনে এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হবে আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যা-কিছুকে সঠিক ও যথার্থ হিসেবে চিরাচরিত বিষয় বলে মেনে নিচ্ছি,

সবকিছুকে সেভাবে দেখা উচিত হবে না। কারণ এর অনেক কিছুই সঠিক বা যথার্থ অবস্থায় নেই, তাই এসব কিছুর 'ভাল ও মন্দ' দিকগুলোকে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমরা সেসব উদাহরণ নিয়েই আলোচনা করছি, যার আলোকে মানুষ কীভাবে জিনিস তৈরি করে তা জানতে পারব এবং ক্রমান্বয়ে এসব বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। এভাবে বিনিময় মূল্যই বা কী এমন সব বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

'বনের গাছ' কিংবা 'সাগরের মাছ', এসবের পেছনে মানুষের কোন ভূমিকা নেই, মানুষ এসবের কিছুই তৈরি করেনি, এর পেছনে মানুষের কোন শ্রম নেই, প্রকৃতিই এগুলোকে দিয়েছে। এটা একটা বাস্তব সত্য। এসব কারও 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' হতে পারে না। কারও বিশেষ অধিকার এর উপর থাকতে পারে না। সক্ষম যে-কেউ বনে বা সাগরে গিয়ে স্বাধীনভাবে প্রকৃতি প্রদত্ত এসব সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে, যার জন্য তাকে কাউকে কোন 'মূল্য' দিতে হবে না। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি তার নৌকা নিয়ে সাগরে গেল, জাল দিয়ে মাছ ধরে তা কূলে নিয়ে আসল। যে মাছের সাগরে বিচরণ ছিল, সাগরে থাকা উচিত ছিল, তা এখন ডাঙায় এসে গেল। প্রকৃতিই মাছকে দিয়েছে যার সাধারণ বিচরণ ক্ষেত্র হলো সাগর, ডাঙায় তার থাকার কথা নয়। মানুষই তাদেরকে ডাঙায় নিয়ে এসেছে, যার জন্য তার উপর মানুষের শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে। মাছের বিচরণ ক্ষেত্র সাগর, যেসব মাছ সাগরে রয়েছে তারা কোন 'জিনিস' নয়। যখন তাদেরকে কূলে বা ডাঙায় আনা হলো তখনই কেবলমাত্র তারা 'জিনিস' হয়ে গেল। এসব মাছ এখন উৎপাদিত হয়েছে বলা যায়, কারণ সাগর থেকে ডাঙায় আনতে মানুষের 'কিছু শ্রম' এখানে নিয়োগ করা হয়েছে। যেসব মানুষ এই শ্রম নিয়োগ করেছে, তারাই এখন এসব মাছের মালিক। এই ব্যক্তিরা বা ব্যক্তি যদি এসব মাছ নিজেরাই খাবার হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, তাকে কোন মূল্য দিতে হবে না, সেই স্বাধীনতা তার রয়েছে। অন্যরা যদি এই মাছ নিতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই বিনিময়ে কিছু দিতে হবে, অর্থাৎ এই মাছের 'মূল্য' দিতে হবে। এই মাছের মূল্য হবে কত? এটা হবে সেই শ্রমের মূল্যের সমান – মাছকে সাগর থেকে ডাঙ্গায় আনতে যে শ্রম দিতে হয়েছে। অন্য কোন জিনিস দিয়েও এই মাছ নেওয়া যাবে, যে জিনিসের উপর একই পরিমাণ শ্রম দেওয়া হয়েছে।

'জিনিস' কীভাবে উৎপাদিত হলো, এতক্ষণ বিভিন্ন উদাহরণ থেকে আমরা তা দেখেছি। আমরা কি বলতে পারি 'মানুষের শ্রমই' জিনিস উৎপাদন করেছে। এটা পূর্ণাঙ্গ কোন উত্তর হলো না। একমাত্র উপাদান 'শ্রম' কোন জিনিস উৎপাদন করতে পারে না। এখানে 'বস্তু সামগ্রী'-ও থাকতে হবে, যা 'প্রকৃতি' আমাদেরকে দিয়েছে।

তক্তার ক্ষেত্রেও একই, প্রকৃতপক্ষে এখানে 'বনের গাছই' ছিল তক্তা উৎপাদনের মূলে। এটা ছিল প্রকৃতির দান। মানুষ শ্রম দিয়েছে সেহেতু তক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। যদি বনের গাছই না থাকত?

সাগরের মাছের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এখানে 'সাগরে মাছ' ছিল, যেগুলো হলো প্রাকৃতিক বস্তু। এসব মাছের উপর মানুষের শ্রম ব্যয়িত হয়েছে, তখনই আমরা 'ডাঙ্গার মাছ' প্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছি। সাগরে যদি মাছই না থাকত, তবে মাছ উৎপাদন কি সম্ভব হতো?

'প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তু'র উপর মানুষের শ্রম নিয়োগ করা হলে পর একটা 'জিনিস' আমরা পেয়ে যাই। এই জিনিস বা দ্রব্যের উপর আবারও মানুষের শ্রম নিয়োগ করা হলে, আরও উন্নততর দ্রব্য আমরা পেয়ে যাব। সকল জিনিসের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।

সৃজিত বন বা বাগানের ক্ষেত্রে মাটিই হলো প্রকৃতির উপাদান। এখানে মানুষের পরিচর্যার ফলে গাছগুলো বড় হয়, মানুষের শ্রম এখানে মাটির উপর নিয়োগ করা হচ্ছে। বাগানের এসব গাছের (একটা জিনিস) উপর মানুষের শ্রম নিয়োগ করা হলে কাঠের তক্তা (অন্য একটা জিনিস) পাওয়া যাবে। যদি এসব তক্তার উপর আরও শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন আমরা চেয়ার বা টেবিল (অন্য একটা জিনিস) পাবো।

কম্বলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মাটি কর্ষণ করে যদি তুলার বীজ বোনা হয় এবং মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করা হয়, তাহলে এক সময় তুলা গাছ থেকে আমরা তুলা (জিনিস) পাব। এখানে মানুষের শ্রমই মাটির উপর প্রযুক্ত হলো। এই তুলার উপর আরও শ্রম ব্যয়িত হলে আমরা সুতা (অন্য একটা জিনিস) পেয়ে যাব। এই সুতার উপর আরও শ্রম দিয়ে আমরা কম্বল (অন্য আর একটা জিনিস) বানাতে পারব। যে-কোন জিনিসের ক্ষেত্রে এটা সত্য।

আমরা এভাবে এই প্রক্রিয়াকে দেখতে পারি :

প্রাকৃতিক বস্তু	+ শ্রম	= জিনিস
বনের গাছ	+ শ্রম	= কাঠের তক্তা
জিনিস	+ শ্রম	= অন্য একটা জিনিস
কাঠের তক্তার	+ শ্রম	= চেয়ার
তুলা	+ শ্রম	= সুতা
সুতা	+ শ্রম	= কাপড়/কম্বল
কাপড়	+ শ্রম	= শার্ট
সাগরের মাছ	+ শ্রম	= ডাঙ্গার মাছ
ডাঙ্গার মাছ	+ শ্রম	= মাছের তরকারি

মানুষ এভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর উপর, ধাপে ধাপে, শ্রম দিয়ে নানাবিধ জিনিস তৈরি করে চলেছে। যদি একটা জিনিসকে চেয়ার বলা হয়, তাহলে বুঝতে হবে মানুষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় শ্রম এখানে সম্পাদিত হয়েছে। কম্বলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যেকোন জিনিসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

এতক্ষণ আমরা 'জিনিস' কী তা বোঝার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি যে 'বস্তু + শ্রম = জিনিস'। আমরা আরও দেখেছি যে জিনিস আকাশ থেকে পড়ে না, একমাত্র মানুষের শ্রমই জিনিস উৎপাদন করতে পারে এবং এসব জিনিসই মানুষ বিনিময় করে থাকে।

দুটো জিনিসের মধ্যে বিনিময় তখনই সংঘটিত হয়, দেওয়া এবং নেওয়া এই ঘটনার সাথে জড়িত উভয় জিনিসের মূল্য যখন সমান হয়। তাহলে মূল্য অর্থ কী? একমাত্র শ্রম। একটা বস্তু বা দ্রব্যের উপর ব্যয়িত শ্রম হলো ওই জিনিসের বা মূল্য। বিনিময় তখনই সংঘটিত হয়, একমাত্র শ্রম সমান হলে। সেহেতু যদি দুটো জিনিসের মধ্যে বিনিময় ঘটে, আমাদের জানতে হবে উভয় জিনিসের উপর নিয়োগ করা শ্রম সমান কি না। তাই জিনিসের উপর সম্পাদিত শ্রমের পরিমাপের একটা উপায় আমাদের থাকতে হবে। 'শ্রম' পরিমাপের এই 'মাধ্যম' কী?

৩. 'শ্রম' পরিমাপের 'উপায়' বা মাধ্যম কী?
(What is the 'means' to `measure' labour?)

শ্রম পরিমাপেরও উপায় আছে, আর সেটা হলো 'সময়'। ধরে নিলাম, কোন ব্যক্তি কিছু কাজ করল, এটা পরিমাপের অর্থ হলো কত সময় ধরে ওই ব্যক্তি কাজ করল সেটা মাপা। কত ঘন্টা সে কাজ করেছে? কত দিন সে কাজ করেছে? কত সপ্তাহ সে কাজ করেছে? এটাই হলো শ্রম পরিমাপের উপায়। সময়ই হলো শ্রম পরিমাপের মাধ্যম।

৪. জিনিস তৈরিতে ব্যয়িত 'মোট শ্রম' বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by 'total labour' spent on an article?)

'মূল্য' অর্থ শ্রম-সময়। একটা জিনিসের মূল্য হলো মোট শ্রম-সময়, যা ওই জিনিসটা উৎপাদন করতে প্রয়োজন হয়। ওই জিনিস তৈরির জন্য ব্যয়িত 'মোট শ্রম' কথাটার অর্থ কী?

ধরে নিলাম, বিনয় বনের গাছ থেকে তক্তা বানাতে এক দিন (কর্মদিবস ১০ ঘন্টা) ধরে কাজ করল। এটার অর্থ কি তক্তা বানাতে মোট শ্রম-সময় এক দিন (১০ ঘন্টা)? না, বিনয় যতক্ষণ ধরে কাজ করেছে, কেবলমাত্র সেই সময়কালই ওই

তক্তাগুলো তৈরি করতে মোট সময়কে প্রকাশ করে না। বিনয় অবশ্যই এই কাজে কিছু যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। খালি হাত দিয়ে কারও পক্ষে গাছটা কাটা সম্ভব নয়। আমরা ধরে নিলাম, বিনয় এই কাজে একটা কুড়াল, একটা করাত এবং কিছু রশি ব্যবহার করেছে। এখানে ব্যবহৃত সকল হাতিয়ারও জিনিস, যা ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। ওই সকল জিনিসও শ্রম ব্যয় করেই তৈরি করা হয়েছে। বিনয় বা অন্য কেউ ওই সকল হাতিয়ার তৈরি করেছে কি-না, এখানে এটা বিবেচ্য নয়। যেসব হাতিয়ার বিনয় এই কাজে ব্যবহার করেছে, সেগুলোও বিনয়ের কাজে ব্যয়িত মোট সময়ের একটা অংশ দখল করে আছে, আমরা এভাবে বলতে পারি। হাতিয়ার ছাড়া কোন কাজ সম্পাদিত হতে পারে না। হাতিয়ার ব্যবহারের অর্থই হলো, হাতিয়ারগুলো তৈরি করতে ব্যয়িত শ্রমকে হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। সেহেতু হাতিয়ার তৈরিতে যুক্ত শ্রমকে তক্তা তৈরিতে বিনয় কর্তৃক সম্পাদিত শ্রমের সাথে যোগ করেই মোট শ্রমকে হিসেব করতে হবে। যদিও বাস্তবে বিনয় এই কাজে অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার ব্যবহার করেছে, আমরা এই উদাহরণকে সহজ করতে ধরে নিলাম, বিনয় কেবলমাত্র কুড়ালই ব্যবহার করেছে। এটার অর্থ হলো, বিনয়ের শ্রম ছাড়াও গাছটা কাটতে একটা কুড়ালও প্রয়োজন হয়েছে, তাই কুড়াল তৈরিতে ব্যয়িত শ্রমও বিনয়ের শ্রমের সাথে যোগ করতে হবে।

আমরা এখন দেখতে পারি, কুড়ালের সাথে যুক্ত শ্রম কত হবে। কুড়ালও একটা জিনিস আর এটা ইতিমধ্যে কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তৈরি করতে 'একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম' লেগেছে। আমরা ধরে নিলাম, কুড়ালটা তৈরি করতে 'মোট ২ দিনের' (২০ ঘন্টার শ্রম) শ্রম লেগেছে। আমরা আরও ধরে নিলাম, কুড়ালটা ২০টা গাছ কাটার সময় পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকতে পারবে, অর্থাৎ এর পরে কুড়ালটা আর ব্যবহার করা হবে না। তাই এটা ধরতে পারি যে কুড়াল দিয়ে একটা গাছ কাটতে ১ ঘন্টা সময় ব্যয় হবে। বিনয়ের ১০ ঘন্টা শ্রম সময়ের সাথে এই ১ ঘন্টা শ্রম সময় যোগ করলে মোট ১১ ঘন্টা সময় এখানে ব্যয় হয়েছে, বলা যায়। সেহেতু বলা যায় তক্তাগুলো তৈরি করতে মোট ১১ ঘন্টা শ্রম এখানে প্রয়োজন হয়েছে। সুতরাং, তক্তাগুলো তৈরি করতে বিনয়ের যে ১০ ঘন্টা শ্রম ব্যয় হয়েছে কেবলমাত্র সেটাই হিসেবে আসছে না।

বিষয়টাকে এভাবে বোঝার ক্ষেত্রে একটা ভুলের মধ্যে পড়ার বিপদ থেকে যায়। "এই উদাহরণে বিনয় যতক্ষণ কাজ করেছে, কুড়ালটাও ততক্ষণ কাজ করেছে, ধরা যায়। এখানে বিনয় ১০ ঘন্টা কাজ করেছে, কুড়ালটাও ওই ১০ ঘন্টা কাজ করেছে বলে মনে হয়। সুতরাং মোট কাজের সময় হয় ২০ ঘন্টা, এটা কি ঠিক?" কিছু মানুষ বিষয়টাকে এভাবে ভুল পথে হিসেব করে বুঝতে চায়। কিন্তু,

এখানে শ্রম সময় পরিমাপের হিসেব এভাবে হবে না। কারণ বিনয়ের ১০ ঘন্টা কাজের সময়কালে কেবলমাত্র বিনয়ই কাজ করেছে, কুড়াল কোন কাজ করেনি; কুড়াল একটা জিনিস, জিনিস নিজের থেকে কোন কাজ করতে পারে না। কুড়াল বিনয়ের কাজে একটা হাতিয়ার হিসেবেই কেবলমাত্র ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এটা ধরা যায় না যে কুড়ালও নিজের থেকে বিনয়ের মতো কাজ করেছে। কুড়ালটা বিনয়ের কাজের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে কিছুটা ক্ষয়ে গেছে বিধায় এটা ধরা যায় না যে কুড়ালও বিনয়ের মতো নিজের থেকে কাজ করেছে। তবে এটা ধরা যায় যে কুড়ালের এই ক্ষয়ের কারণে বিনয়ের সম্পাদিত কাজের সাথে কুড়ালের ভেতর অনুপ্রবিষ্ট কাজের কিছুটা অংশ যুক্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে কুড়ালের কাজের হিসেব করতে আমরা কীভাবে এগিয়েছি, সেটা আমাদের সাবধানতার সাথে বুঝতে হবে।

বিনয় যদি এই কাজে একমাত্র কুড়াল ব্যবহার না করে আরও ২ বা ৩ ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করত, তখন সেসব হাতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত শ্রমের হিসেবও কুড়ালের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হিসেবের মতই হতো। কিন্তু, যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি বিনয় কেবলমাত্র কুড়াল ব্যবহার করেছে, তাই বর্তমান উদাহরণে তক্তা তৈরির জন্য মোট শ্রম সময় হবে ১১ ঘন্টা। (বিনয়ের কাজের সময় ১০ ঘন্টা + হাতিয়ার অর্থাৎ কুড়ালের সাথে সম্পর্কিত সময় ১ ঘন্টা = ১১ ঘন্টা।)

যদি কোন জিনিস তৈরি করতে ৪ বা ৫ স্তর বা ধাপের প্রয়োজন হয়, তখন প্রতিটা ধাপের ক্ষেত্রে এই একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। যদি কাজটা সম্পূর্ণ করতে ৫টা ধাপ অতিক্রম করতে হয়, সেক্ষেত্রে ৫টা ধাপের প্রতিটাতে মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত মোট শ্রম সময়ের সাথে প্রতিটা ধাপে ব্যবহৃত হাতিয়ারের কাজের মোট সময়কালকে যোগ করলে মোট শ্রম সময় পাওয়া যাবে।

এখন আমরা 'চেয়ার' তৈরির জন্য প্রয়োজন মোট শ্রম সময়ের হিসেব করতে পারি। চেয়ার তৈরি করতে তক্তা লাগে। গাছ থেকে তক্তা তৈরির ধাপ সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। এখন আমরা দেখবো তক্তা থেকে কীভাবে চেয়ার তৈরি করা হয়। চেয়ার তৈরি করতে গাছ থেকে পাওয়া সমস্ত তক্তা কাজে লাগে না, কিছু তক্তাই যথেষ্ট। এখানে তক্তা চেয়ারের কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগছে। তক্তা থেকে চেয়ার তৈরির কাজে একজন ব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় লাগবে। সে এই কাজে কয়েকটা হাতিয়ারও ব্যবহার করবে। চেয়ার তৈরির প্রয়োজনে মোট শ্রম হবে - কাঁচামাল তক্তা তৈরির শ্রম, হাতিয়ারের শ্রম এবং কাঠমিস্ত্রির শ্রমের মোট যোগফল। আমরা এখন উদাহরণ দিয়ে দেখব :

চেয়ার তৈরিতে মোট শ্রম সময়	**ঘন্টা মিনিট**
চেয়ার তৈরিতে প্রয়োজন এমন সংখ্যক তক্তা তৈরির শ্রম সময়.....	০.২০
তক্তা দিয়ে চেয়ার তৈরির এবং ফিনিশিং করার শ্রম সময়.....	২.০০
ব্যবহৃত হাতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত শ্রম সময়	০.১৫
পেরেকের সাথে সম্পর্কিত শ্রম সময়.....	০.১২
বার্নিশ পেইন্টিং-এর জন্য শ্রম সময়.....	০.১৩
চেয়ার তৈরিতে ব্যয়িত মোট শ্রম সময়	= ৩.০০

কম্বল তৈরিতে মোট শ্রম সময়	**ঘন্টা মিনিট**
কম্বল তৈরিতে প্রয়োজন এমন পরিমাণ তুলা উৎপাদনের কৃষিজ শ্রম সময়	০.৫০
প্রাপ্ত তুলা থেকে সুতা তৈরির শ্রম সময়.....	০.৪০
সুতা দিয়ে কম্বল বুনন কাজের শ্রম সময়.....	১.০০
বুনন কাজে ব্যবহৃত হাতিয়ের শ্রম সময়.....	০.৩০
কম্বল তৈরিতে মোট শ্রম সময়	= ৩.০০

এখানে চেয়ার তৈরির জন্য ব্যয়িত মোট শ্রমকে চেয়ারের মূল্য হিসেবে ধরতে হবে এবং কম্বলের ক্ষেত্রেও মোট শ্রমকে কম্বলের মূল্য হিসেবে ধরতে হবে। চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে 'বিনিময়' সম্পন্ন করতে হলে উভয়ের পেছনে ব্যয়িত মোট শ্রমকে তাদের প্রত্যেকের 'মূল্য' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এখানে চেয়ার ও কম্বল তৈরির জন্য প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ব্যয়িত মোট শ্রম সময় যেহেতু পরস্পরের সমান, সেহেতু এই দুটো জিনিসের মধ্যে 'বিনিময়' সম্ভব।

'মূল্য' অন্য কিছু নয় 'শ্রম' ব্যতীত! একটা জিনিসের মূল্য হলো জিনিসটা তৈরির জন্য প্রয়োজন এমন মোট শ্রম।

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে একটা জিনিস তৈরি করতে শুধু শ্রম নয়, 'প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তুর'-ও প্রয়োজন রয়েছে। যদি একটা জিনিসের মূল্য হিসেব করতে কেবলমাত্র শ্রমকে বিবেচনা করি, তাহলে প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তুর কী হবে? প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বস্তুর কি কোন মূল্য নেই? আমরা ইতিমধ্যে বিস্তারিত ভাবে জেনেছি যে বনের গাছের কোন মূল্য কেন থাকে না। যেকোন জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে জিনিসের জন্য প্রয়োজন এমন কাঁচামাল এবং হাতিয়ার – এসবের সাথে সম্পর্কিত সকল ধরনের শ্রমকে বিবেচনায় রেখে, যদি আমরা পিছিয়ে মূলে যেতে থাকি, তাহলে এক সময় আমরা পৌঁছে যাব 'প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তু'র কাছে, এবং অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাব প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট এসব বস্তুর আসলেই কোন মূল্য নেই। কারণ মানুষের কোন

'শ্রম' এসব বস্তুর উপর নিয়োগ করা হয়নি, তাই এর কোন মূল্যও নেই। চেয়ার এবং কম্বলের মতো এসব জিনিস মানুষের শ্রম ছাড়া তৈরি করা সম্ভব নয়, এখানে 'প্রকৃতি-প্রদত্ত কাঠ এবং তুলা'র উপর মানুষের শ্রম ব্যয়িত হয়েছে। এই শ্রমই জিনিসের মূল্য গঠনে ভূমিকা রাখছে। যদিও এসব জিনিস তৈরিতে প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তু লাগছে, কিন্তু এসব 'বিষয়' জিনিসের মূল্য গঠনে কোন ভূমিকা রাখছে না।

ব্যবহারিক মূল্য = প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তু + শ্রম
মূল্য/বিনিময় মূল্য = ০ + শ্রম

এই আলোচনায় সামনে এগিয়ে গেলে, পণ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আরও স্পষ্ট ভাবে জানতে পারব।

আমরা এখন আমাদের উদাহরণে আবার ফিরে যাব। চেয়ারের মূল্য হলো চেয়ার তৈরিতে দেওয়া শ্রম। কম্বলেরও মূল্য হলো কম্বল তৈরিতে ব্যবহৃত শ্রম। যেকোন জিনিসের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য : একটা ১২৫-তলা বিল্ডিং, একটা বিশাল জাহাজ, চাঁদে পাঠানো হচ্ছে এমন বিশাল রকেট অথবা বিশাল যেকোন জিনিসই হোক-না-কেন, এর মোট মূল্য এটা তৈরির জন্য ব্যয়িত মোট শ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

ধরে নিলাম, এক কিলো তুলা আছে, এই তুলা থেকে তৈরি সুতার মূল্য তুলার চেয়ে বেশি হবে। এখানে সুতার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ তুলাকে সুতায় রূপান্তরিত করতে যে শ্রম লেগেছে তা তুলার মূল্যর সাথে যুক্ত হয়েছে। এই সুতা থেকে তৈরি কাপড়ের মূল্য সুতার মূল্য অপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই কাপড় থেকে তৈরি পোশাকের মূল্য কাপড়ের মূল্যর চেয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে প্রথম বস্তুর সাথে নতুন নতুন শ্রম যত যুক্ত হবে, জিনিসের মূল্য ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এর কারণ হলো জিনিস তৈরিতে ব্যয়িত শ্রম সময় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

মূল্য শ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, শ্রমের পরিমাণ দিয়ে জিনিসের মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়, 'প্রকৃতির নিয়ম'-এর মতোই এটা প্রাকৃতিক। এটার অর্থ হলো যেসব পণ্য তৈরিতে বেশি শ্রম লাগছে তার মূল্য বেশি, আর যেসব পণ্য তৈরিতে অপেক্ষাকৃত কম শ্রম লাগছে তার মূল্য তত কম। এভাবে 'শ্রমের পরিমাণ' প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই পণ্যের মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করছে।

৫. 'সামাজিক' শ্রম সময় অথবা 'গড়' শ্রম সময়
('Social' labour time or 'average' labour-time)

একটা জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পায়, সেটা তৈরি করতে প্রয়োজন এমন শ্রম সময় বাড়লে এবং কমে যায় শ্রম সময় কমলে। একটা সন্দেহ উত্থাপনের সুযোগ এখানে রয়েছে। একটা সাধারণ ধারণা রয়েছে যে, একজন অলস ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটা

জিনিস তৈরিতে দীর্ঘ সময় লাগবে। তাহলে কি ওই জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাবে না? একজন কর্মঠ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওই জিনিস তৈরি করতে কম সময় লাগবে, তাহলে কি ওই জিনিসের দাম কমে যাবে? এমনটাই ঘটার কথা, সন্দেহের সৃষ্টি এজন্য। এর তাৎক্ষণিক উত্তর হলো – ঘটনা এভাবে ঘটে না। এখন আমরা দেখবো কেন এমনটা ঘটে না।

জিনিস তৈরির শ্রম সময় ব্যক্তির অলসতা বা সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে না। যে-কোন জিনিস তৈরির সময়কাল ব্যক্তির গড় দক্ষতার উপর নির্ভর করে, নির্ভর করে ওই সময়ে উক্ত কাজের জন্য প্রাপ্তব্য এবং ব্যবহারযোগ্য হাতিয়ারের ন্যূনতম দক্ষতার ওপর। একই ধরনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে যে-সব ব্যক্তি, তাদের মধ্যে অনেকেই অলস হতে পারে, অনেকেই বেশি কর্মঠ ও দক্ষ হতে পারে, অনেকেই সক্রিয়তার সাথে অল্প সময়ে কাজটা করে ফেলতে পারে, অনেকেই ওই কাজটা অলসতার সাথে দীর্ঘ সময় নিয়ে এবং অনেকেই গড় পড়তায় করে ফেলতে পারে। যেহেতু এখানে কাজটা করার প্রয়োজন রয়েছে, মানুষের যোগ্যতা ও সক্ষমতার ক্ষেত্রে এমন ধরনের পার্থক্যের উপস্থিতি থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু, কোন কাজ করার প্রয়োজনীয় সময় শুধুমাত্র ব্যক্তির যোগ্যতা ও সক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। এটা বিদ্যমান 'গড়' পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বিদ্যমান অবস্থায় বা সময়ে একই ধরনের কাজ করছে এমন সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকাংশ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে পারে, যা 'গড়পড়তা প্রয়োজনীয় শ্রম সময়' বা 'সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম সময়'-কে প্রকাশ করে। সামাজিক অর্থ সমাজের সাথে সম্পর্কিত। এর অর্থ হলো, এটা একক ব্যক্তির সাথে নয়, সমাজের সকলের সাথে সম্পর্কিত। এখানে সকল অর্থে যারা কাজ করে তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে। 'সামাজিক শ্রম সময়' এবং 'গড় শ্রম সময়' উভয়ের অর্থ একই।

ধরা যাক, একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোন কাজের একটা অংশ সম্পন্ন করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন। যেকোন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণটা গড়পড়তায় একই হবে। বিদ্যমান অবস্থায় কাজটা সম্পাদন করতে প্রয়োজনীয় শ্রম সময়টা নির্ভর করে শ্রমের জন্য ওই সময়কালে বিদ্যমান পরিস্থিতির ওপর।

আমরা ধরতে পারি, এক গজ কাপড় বানানোর সামাজিক শ্রম সময় এক ঘন্টা। এখানে একে বিশদভাবে জানার প্রয়োজন নেই, যেমন – যারা এই কাপড় উৎপাদনের কাজ করছিল তারা কোন্ অবস্থায় ছিল, তারা কোন্ ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করছিল? এর অর্থ হলো : এখানে এসব বিশদভাবে জানার দরকার নেই, যেমন – তারা তুলা উৎপাদনের কাজে জমি চষতে লাঙল অথবা ট্রাক্টর ব্যবহার করছিল কি না; তারা হ্যান্ডলুম অথবা পাওয়ারলুম দিয়ে কি কাপড় বুনছিল?

তখনকার সময়ে প্রাপ্তিযোগ্য এমন ধরনের হাতিয়ার দিয়েই ওই কাজ করা হয়েছিল এবং ওই পরিমাণ কাপড় বুনন কাজে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন, তা দিয়েই ওই সময়ে প্রাপ্তিযোগ্য হাতিয়ারের সাহায্যে তারা কাজ করেছে।

যখন বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়নি তাই পাওয়ারলুমও তৈরি হয়নি, তখন হ্যান্ডলুম দিয়ে ১০০ গজ কাপড় বুনতে যে সময় লাগত, পাওয়ারলুম আবিষ্কারের পর ১০০ গজ কাপড় বুনতে অবশ্যই কম সময় লাগছে। অর্থাৎ হ্যান্ডলুম দিয়ে কাপড় বুনার সময় বা সমাজ এবং পাউয়ারলুম দিয়ে কাপড় বুনার সময় বা সমাজ কখনই এক নয়।

হ্যান্ডলুমভিত্তিক সমাজে ১ গজ কাপড় বুনার প্রয়োজনীয় সময় হলো ওই সময়ের 'সামাজিক শ্রম সময়' এবং পাউয়ারলুমভিত্তিক সমাজে ১ গজ কাপড় বুনার প্রয়োজনীয় সময় হলো ওই সময়ের 'সামাজিক শ্রম সময়'।

একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় কোন কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের একটা গড় পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে। এই গড় পরিস্থিতির মধ্যে থেকে একজন সক্রিয়তার সাথে অন্য একজন নিষ্ক্রিয়তার সাথে কাজ করে থাকে, এই সক্রিয়তার বা নিষ্ক্রিয়তার ফলাফল মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে বিবেচনা করে। আমরা ধরে নিলাম, একটা কম্বল তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় মোট ৩ ঘন্টা শ্রম সময়। ধরে নিলাম, এই সময়ের মধ্যে সে বুননের কাজে সময় দিচ্ছে ১ ঘন্টা। মোট অবশিষ্ট শ্রম এখানে থেকে যাচ্ছে ২ ঘন্টা। যদি এই তাঁতি ১ ঘন্টায় কম্বলটা তৈরি করতে পারে, তাহলে কম্বল তৈরিতে ব্যয়িত মোট শ্রম সময় হয় ৩ ঘন্টা। যদি সে এই কম্বলের বিনিময়ে অন্য একটা জিনিস, ধরে নিলাম, চেয়ার নিতে চায়, সেখানে ওই জিনিস বা চেয়ার তৈরিতে ব্যয়িত শ্রম সময় হতে হবে ৩ ঘন্টা। তখন উভয় জিনিসের মধ্যে সমতুল্যতা থাকে। কিন্তু, একজন অলস তাঁতি, যে ১ ঘন্টার কাজ ২ ঘন্টায় করে, ফলে এই কম্বল তৈরিতে তার সময় লাগে ৪ ঘন্টা। এখন এই তাঁতি তার কম্বলের বিনিময়ে চেয়ারের সাথে কি আরও একটা বাড়তি টুল দাবি করতে পারবে, যে টুলটা তৈরিতে শ্রম সময় ১ ঘন্টা। বাস্তবে এটা ঘটবে না। কারণ তখনকার সময়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে একটা কম্বলের বিনিময়ে একটা চেয়ার পাওয়া সম্ভব, এই মৌলিক নিয়ম কার্যকর রয়েছে। তাই যে তাঁতি কাজটা ১ ঘন্টায় সম্পূর্ণ করে এবং যে তাঁতি একই কাজ ২ ঘন্টায় সম্পূর্ণ করে, তাদের উভয়ের জন্য ১টা চেয়ারের বিনিময়ে ১টা কম্বল এই নিয়ম কার্যকর হবে। এর অর্থ হলো, অলস তাঁতির ২ ঘন্টার বুনন কাজকে ১ ঘন্টার বুনন কাজ হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। কারণ এখানে ওই তাঁতি যে ১ ঘন্টার বুনন কাজ ২ ঘন্টায় করে, সে ১ ঘন্টার শ্রমের ফল হারাবে, হিসেবে আসবে না।

আমরা বিবেচনা করতে পারি একজন সক্রিয় তাঁতির কথা, যে $\frac{১}{২}$ ঘন্টায় ১টা কম্বল তৈরি করতে পারে। এটা ধরে হিসেব করলে কম্বলটা সম্পূর্ণ করতে মোট শ্রম সময় হবে ২ $\frac{১}{২}$ ঘন্টা। এই তাঁতি তার কম্বলের বিনিময়ে চেয়ারটা দাবি করতে পারবে না, কারণ চেয়ারের পেছনে রয়েছে তো ৩ ঘন্টার মোট শ্রম সময়? কিন্তু, বাস্তবে এমনটা ঘটে না। সে কম্বলের বিনিময়ে চেয়ারটা পাবে। কারণ তার কম্বলের পেছনে ব্যয়িত শ্রম ৩ ঘন্টার শ্রম সময় হিসেবে গণ্য হবে। তার $\frac{১}{২}$ ঘন্টার বুনন কাজকে ১ ঘন্টার বুনন কাজ হিসেবে ধরা হবে। যেহেতু সে সক্রিয় তাঁতি ১ ঘন্টা বুনন কাজের ফল $\frac{১}{২}$ ঘন্টা সময় ব্যয় করে পেয়ে যাচ্ছে, বাকি $\frac{১}{২}$ ঘন্টা তার কাজ করা লাগল না। এভাবে যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কাজটা করতে গড় সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগায়, বাড়তি সময়টা হিসেবে আসবে না। তাই এই বাড়তি সময়টা মূল্য নির্ধারণের হিসেবে আসবে না। তদ্রূপ অন্য কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কাজটা করতে গড় সময়ের চেয়ে কম সময় নিলে, এই কম সময়টা হিসেবে আসবে না, আর মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটা গণ্য হবে না। কাজটা দ্রুত কিম্বা ধীরে করা হলো কিনা, এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, জিনিসের মূল্য গঠনে এর কোন ভূমিকা থাকে না।

যখন আমরা বলি 'অধিক মূল্য যদি শ্রম সময় বৃদ্ধি পায়' এবং 'কম মূল্য যদি শ্রম সময় কম হয়'– কথাটার অর্থ এই নয় যে বেশি মূল্য যদি ধীরে করা হয় এবং কম মূল্য যদি দ্রুততার সাথে করা হয়। কাজটা ধীরে ধীরে করা হলে, কিছু সময় কোন ফল ছাড়াই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, দ্রুত করলে কাজটা সম্পূর্ণ করতে কম সময় লাগে, যেটা ভাল ফল দেবে। তাই সক্রিয়তার জন্য ভাল ফল এবং নিক্রিয়তার জন্য মন্দ ফল পাওয়া যায়।

কোন জিনিস তৈরির 'গড় শ্রম সময়' কিছু ব্যক্তির সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার উপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে ওই সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির কাজের ধারার উপর। এখানে দুটো উদাহরণ রয়েছে, এদের মধ্যে পার্থক্য কী?

১. ১ গজ কাপড়ের জন্য গড় শ্রম সময় = ১ ঘন্টা
২. ১ গজ কাপড় বুননের জন্য গড় শ্রম সময় = ৪০ মিনিট

প্রথম উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁতি সুতা দিয়ে তাঁতে কাপড় বুনেছে। নিজের শ্রম এবং তাঁতসহ অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করে সে কাপড় বুনেছে। এখানে ব্যক্তির শ্রম, সুতা তৈরির শ্রম এবং হাতিয়ারে (তাঁত এবং অন্যান্য যন্ত্র) যুক্ত শ্রম মিলে গঠিত হয়েছে 'মোট শ্রম'। এটা হলো ১ ঘন্টায় প্রস্তুত কাপড়ে দেওয়া ১ ঘন্টার গড় শ্রম।

দ্বিতীয় উদাহরণে সুতো দিয়ে কাপড় বুনতে তাঁতির দেওয়া শ্রমকে কেবলমাত্র হিসেব করছি, সুতোয় ব্যয়িত শ্রম এবং হাতিয়ারে ব্যয়িত শ্রমকে এখানে হিসেবে নিচ্ছি না। এখানে ১ গজ কাপড় বুনন কাজে তাঁতির গড়ে ৪০ মিনিট সময় লাগছে।

উদাহরণ দিয়ে যেভাবেই আমরা শ্রম-বিষয়ক বিভিন্ন দিককে দেখি না কেন, আমরা দেখতে পাব সকল ক্ষেত্রে একটা 'গড় অবস্থা' উপস্থিত রয়েছে। এটাই হলো 'গড় শ্রম সময়'।

আমরা 'শ্রম সময়' কথাটা বলে থাকি, এটা 'গড় শ্রম সময়' বা 'সামাজিক শ্রম সময়' অর্থেই ব্যবহার করা হয়। আমরা সাধারণতঃ 'শ্রম সময়' কথাটার সাথে কোন বিশেষণ ব্যবহার করি না, তা সত্ত্বেও একে 'গড় শ্রম সময়' অর্থেই বুঝতে হবে।

আমরা দেখেছি যে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে 'মোট শ্রম সময়', যা পণ্য উৎপাদন কাজে প্রয়োজন হয়। ওই সমস্ত পণ্যের মূল্য বেশি যেগুলো উৎপাদনে মোট শ্রম বেশি লেগেছে এবং যেগুলোতে মোট শ্রম কম লেগেছে তার মূল্য কম।

অন্যান্য জিনিসের তুলনায় সোনার মূল্য অনেক বেশি, কারণ সোনার জন্য অন্যান্য জিনিসের তুলনায় অনেক বেশি শ্রম লেগেছে। ডায়মন্ডের দাম সোনার চেয়ে অনেক বেশি, এর কারণ কী? সোনার চেয়েও এটা উৎপাদনে বেশি সময় লাগে, তাই এর মূল্য বেশি। যদি ডায়মন্ড কয়লার মতো স্তূপাকারে সহজে পাওয়া যেত, তবে এর মূল্যও কয়লার মতো সস্তা হতো। অনেক বেশি শ্রম সময় ব্যয় করে খনিতে খনন কাজ চালিয়েও অত্যন্ত অল্প পরিমাণ ডায়মন্ড পাওয়া সম্ভব হয়। এই অতি অল্প পরিমাণ ডায়মন্ড পেতে প্রয়োজন হয় অতি বিশাল পরিমাণ শ্রম সময়, ফলে প্রতিটা ডায়মন্ডের দাম হয় খুব বেশি।

'ডায়মন্ডের মূল্য খুব বেশি কেন', এর উত্তর কী? উত্তরে অনেকে বলবে, 'ডায়মন্ড খুব সামান্য পরিমাণ পাওয়া যায়'। এটা ঠিক নয়। এই উত্তর প্রকৃত কারণকে তুলে ধরে না। প্রকৃত কারণ কী? মূল্যের কম বা বেশি হওয়াটা শ্রমের কম বা বেশি হওয়ার কারণেই ঘটে, আমাদেরকে শ্রমের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত করে কারণটাকে দেখতে হবে। 'ডায়মন্ড খুব সামান্য পরিমাণ পাওয়া যায়' এই উত্তরটাতে শ্রম বিষয়টার কোন উল্লেখ নেই। এখানে অন্য একটা প্রশ্নও এসে হাজির হয়, ডায়মন্ড তো অতি অল্প পরিমাণই পাওয়া যায়, এই কারণে কেন তাদের মূল্য অনেক বেশি হবে না? তখনও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাব কারণের পেছনে 'বেশি শ্রমই জড়িত'। 'কেন ডায়মন্ডের মূল্য খুব বেশি?' – এর একমাত্র সঠিক ও সোজাসুজি উত্তর হলো : 'বেশি শ্রম লাগে তাই'। অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও একই কথা। জিনিস তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম সময়ের কম কিংবা বেশির এই পার্থক্যই নির্ধারণ করে জিনিসের মূল্য কম কিংবা বেশি হবে কি হবে না।

৬. শ্রম কোথায় থাকে? (Where does 'labour' exist?)

আমরা সাধারণত বলি একটা জিনিস তৈরি করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম লাগে, এটার অর্থ কি শ্রমটা জিনিসের ভেতরে ঢুকে যায়? জিনিসটা টুকরো টুকরো করলে আমরা কি শ্রমটাকে পেয়ে যাব? মানুষের শরীরে যেমন 'রক্ত' পাওয়া যায়, জিনিসের ভেতরেও তেমনি শ্রম পাওয়া যাবে? না, এটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। যখন আমরা বলি কোন জিনিস তৈরি করতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম লাগে, কথাটার সরল অর্থ হলো, একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে জিনিসটার ওপর শ্রম সম্পাদন করতে হয়, তার অর্থ এই হয় না যে শ্রম জিনিসের ভেতরে প্রবেশ করেছে, ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়। জিনিস তৈরির জন্য প্রয়োজন শ্রমের, এই শ্রম সম্পূর্ণ বহিঃস্থ বিষয় যার সাথে জিনিসের কোন বস্তুগত সম্পর্ক নেই। কিন্তু, জিনিস ও শ্রমের মধ্যে অবশ্যই নির্দিষ্ট ধরনের একটা সম্পর্ক আছে, তবে সেটা শারীরিক সম্পর্ক নয়। যেহেতু শ্রম জিনিসের শরীরে অবস্থান করে না, এই অর্থে জিনিসের সাথে শ্রমের কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু, শ্রম যেহেতু জিনিসের উপর সম্পাদিত হয়েছে, একটা সম্পর্ক জিনিসের সাথে শ্রমের থেকে যায়। এক অর্থে জিনিস ও শ্রমের ভেতর কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু অন্য অর্থে সম্পর্ক আছে, উভয় কথা ঠিক।

আমরা যখন বলি একটা চেয়ার তৈরি করতে ৩ ঘন্টার শ্রমের প্রয়োজন, এই '৩ ঘন্টার শ্রম' এমন একটা বিষয়, যা চেয়ারের বহিঃস্থ বিষয়। এই ৩ ঘন্টার শ্রমকে আমরা যদি মূল্যে প্রকাশ করি, সেই মূল্যও বস্তুগত ভাবে চেয়ারের সম্পূর্ণ বহিঃস্থ বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। একই কথা সকল জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, জিনিস যত ছোট বা বিশাল হোক না কেন। সোনা বা ডায়মন্ড এসব মূল্যবান জিনিসই আমরা ধরি না কেন, এখানেও মূল্য গঠনে জিনিসের বস্তুগত দিকটা প্রধান বিষয় হবে না, জিনিসটা তৈরিতে সম্পাদিত শ্রমই মূল্য গঠনে মূল ভূমিকা রাখে।

কোন ব্যক্তি যদি একটা জিনিস তৈরি করে নিজের কাজে লাগায় বা কাউকে এমনিই দিয়ে দেয়, সেখানে 'মূল্য'র বিষয়টা আর আসবে না। জিনিসের মূল্যের প্রশ্নটা আসে যদি জিনিসটার বিনিময়ে অন্য একটা জিনিস নেওয়ার ঘটনা ঘটে অথবা জিনিসটার মূল্য কত তা জানার প্রশ্ন আসে।

মূল্য অর্থ শ্রম, তাই মূল্য আছে এমন বস্তুর সাথে মূল্য নেই এমন বস্তুর বিনিময় ঘটে না। এর অর্থ হলো, শ্রম দিয়ে তৈরি একটা জিনিস এবং শ্রমশূন্য একটা বস্তুর মধ্যে বিনিময়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। উদাহরণ হিসেবে ধরে নিলাম, বিনয় ও বিকাশ দুজনই নদীতে গোসল করছে। বিনয়ের হাতের আঙুলে রয়েছে একটা সোনার আংটি, বিকাশ কিছু দিয়ে বিনিময়ে আংটিটা নিতে চাইল। বিনয় রাজী হলো, কিন্তু বিকাশ কি দিলে এখানে বিনিময়ের ঘটনাটা ঘটবে?

বিকাশ কি বলতে পারে : "বিনয়, তুমি আংটিটার বিনিময়ে এই নদীর পানি নাও আর আংটিটা আমাকে দিয়ে দাও"? নদীর পানি কি বিকাশের যে সেটা সে বিনয়কে দিতে পারবে? বিনয় কী নিজেই নদীর পানি নিতে পারে না আংটিটা না দিয়েই?

নদীর পানির ক্ষেত্রে মানুষের শ্রমের কোন ভূমিকা নেই, তাই তার কোন মূল্যও নেই। তাই মূল্য নেই এমন পানির সাথে মূল্য আছে এমন আংটির বিনিময় ঘটতে পারে না। যদি ওই পানি বহন করে বিনয়দের বাড়িতে আনা হয়, তখন ওই পানির জন্য কিছু পরিমাণ মূল্য গঠিত হবে।

ধরা যাক, বিনয় নদী থেকে কিছু দূরে একটা বাড়ি তৈরি করছে। ধরে নিলাম, এই বাড়ি তৈরির জন্য বিকাশ ওই নদীর পানি বহন করে বিনয়ের বাড়িতে নিয়ে আসল, কয়েক দিন ধরে বিকাশ প্রচুর পানি বিনয়দের বাড়িতে আনল, যা দিয়ে বিনয়দের বাড়িতে নতুন বিল্ডিং বানানোর কাজ চলতে লাগল। এক সময় উভয়ের সম্মতিতে আংটিটার বিনিময় ঘটতে পারে, এটা সম্ভব।

মনে করি, বিকাশ মাত্র এক বালতি পানি বিনয়দের বাড়িতে আনল; বিনয় ওই পানির মূল্য হিসেবে বিকাশকে কিছু খাবার, চাল, দুধ, সবজি অথবা কম মূল্যের কিছু জিনিস দিয়ে দিল। এটাই যথেষ্ট। কিন্তু, বিনয় শুধুমাত্র ওই এক বালতি পানির জন্য বিকাশকে আংটিটা কি দিতে পারে? এক বালতি পানির মূল্য একটা সোনার আংটির সমান হতে পারে না। সেহেতু আমরা বলতে পারি, যখন কোন বিনিময়ের ঘটনা ঘটবে তখন দুটো বিষয় অবশ্যই দেখতে হবে : (১) ২টা জিনিসের মূল্য থাকতে হবে, অর্থাৎ উভয় জিনিস শ্রম দিয়ে তৈরি হতে হবে; (২) ২টা জিনিসের মূল্য 'সমান' হতে হবে, অর্থাৎ দুটো জিনিস 'সমান শ্রম' দিয়ে তৈরি হতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের তৈরি জিনিস নিজেই ব্যবহার করে, এর অর্থ হয় সে নিজেই নিজের শ্রম ব্যবহার করল। যদি সে নিজের তৈরি জিনিসটা দিয়ে অন্যের একটা জিনিস নেয়, এর অর্থ হয় সে নিজের শ্রম অন্যকে দিয়ে বিনিময়ে অন্যের শ্রম নিয়ে নিল। যখনই কোথায়ও বিনিময়ের ঘটনা ঘটে, এর অর্থ হয় এক দিক থেকে শ্রম অন্য দিকে গেল এবং অন্য দিক থেকে শ্রম এই দিকে আসল।

অধ্যায় দুই

শ্রমের দ্বৈত চরিত্র
যে শ্রম পণ্য উৎপাদন করে
(Two Aspects of the Labour that produces Commudity)

পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের অভ্যুদয়ের পর থেকে পৃথিবীতে শ্রমিকদের জন্য এর মতো এমন গুরুত্বসম্পন্ন একটা বইও বের হয়নি, যেটি আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক—এটা সেই অক্ষ—যার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে আমাদের কালের সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা—সর্বপ্রথম এখানে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

–এঙ্গেলস

ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে প্রকৃতির দেওয়া বস্তুর ওপর মানুষের শ্রম সম্পাদিত হলেই পর জিনিস তৈরি হয় এবং জিনিসে ব্যয়িত এই শ্রম জিনিসের মূল্য হিসেবে গণ্য হয়, যখন একটা জিনিসের সাথে অন্য একটা জিনিসের বিনিময় ঘটে।

একটা জিনিস পণ্যে রূপান্তরিত হলে, যে শ্রম দিয়ে জিনিসটা তৈরি হয়েছে তা দুটো বৈশিষ্ট্য পেয়ে যায় : (১) মূর্ত শ্রম এবং (২) বিমূর্ত শ্রম।

১. মূর্ত শ্রম (Concrete Labour)

১. শ্রম যা 'জিনিস' উৎপাদন করে :

সকল জিনিস শ্রম দিয়েই তৈরি হয়। একটা চেয়ার শ্রম দিয়েই তৈরি করা হয়। একটা মাটির পাত্রও শ্রম দিয়েই তৈরি হয়। একটা শার্টও শ্রমই দিয়েই তৈরি করা হয়। প্রত্যেকটা জিনিস তৈরিতে একমাত্র শ্রম প্রধান ভূমিকা রাখে।

এগুলো কোন প্রকৃতির শ্রম? প্রত্যেকটা শ্রমই কি একই প্রকৃতির? যে প্রকৃতির শ্রম দিয়ে একটা কম্বল তৈরি হচ্ছে, সেই একই প্রকৃতির শ্রম দিয়ে কি একটা চেয়ার তৈরি করা হয়? একটা মাটির পাত্র এবং একটা শার্ট কি একই ধরনের শ্রম দিয়ে তৈরি করা হয়? না, সকল জিনিস একই ধরনের শ্রম দিয়ে তৈরি করা হয় না। প্রতিটা জিনিস একটা নির্দিষ্ট ধরনের শ্রম দিয়ে তৈরি করা হয়।

একটা শার্ট তৈরির শ্রম কোন্ প্রকৃতির? সেলাই শ্রম। কিন্তু, এর অর্থ কি একটা শার্ট তৈরি করতে সেলাই শ্রম ব্যতীত অন্য ধরনের কোন শ্রমের প্রয়োজন

নেই? এখানে তুলা উৎপাদন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু, এখানে শার্ট তৈরিতে জড়িত সকল ধরনের শ্রম একই স্থানে একই সময়ে সম্পাদিত হয় না। তুলা উৎপন্ন হওয়ার পরে তুলা দিয়ে সুতা, সুতা দিয়ে কাপড় এবং কাপড় দিয়ে শার্ট তৈরি হয়। সেহেতু, যখন কেউ প্রশ্ন করে 'শার্ট তৈরি করতে কোন্ ধরনের শ্রম প্রয়োজন', আমরা জবাবে কেবলমাত্র সেলাই শ্রম, যা দিয়ে কাপড় থেকে শার্ট তৈরি করা হয়েছে, সেই সেলাই শ্রমের কথাই উল্লেখ করি। আমরা সাধারণতঃ তুলা উৎপাদনের মতো কৃষিভিত্তিক শ্রম থেকে শুরু করে অন্যান্য শ্রমের কথা উল্লেখ করি না। এখানে ৪ ধরনের জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো ৪ ধরনের শ্রম দিয়েই তৈরি করা হয়।

একটা চেয়ার – কাঠমিস্ত্রির শ্রম দিয়ে, একটা কম্বল – বুনন শ্রম দিয়ে, একটা মাটির পাত্র – মৃৎশিল্প শ্রম দিয়ে, একটা শার্ট – সেলাই শ্রম দিয়ে তৈরি করা হয়। এভাবে দেখা যাবে প্রত্যেকটা জিনিস নির্দিষ্ট ধরনের শ্রম দিয়েই তৈরি হচ্ছে।

একজন কাঠমিস্ত্রি যদি তক্তাগুলোকে আঁকা-বাঁকা ভাবে কেটে জোড়া দেয়, তাহলে কি একটা চেয়ার তৈরি হবে? এভাবে একটা মইও কি তৈরি করা যাবে? একজন দর্জি কাপড়কে টুকরো টুকরো করে ছিন্ন-ভিন্ন করে কাটল, এগুলোকে সেলাই করে এবং যেখানে ইচ্ছা বোতাম লাগিয়ে কি একটা শার্ট তৈরি করা যাবে? নিদেন পক্ষে একটা জ্যাকেট কি এভাবে তৈরি করা যাবে? যেকোন জিনিস তৈরির জন্য রয়েছে তার নির্দিষ্ট পদ্ধতি। কাজটা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য নিয়ে না করলে, কোন জিনিসই তৈরি হবে না।

ভিন্ন ভিন্ন জিনিস তৈরি করতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে হবে। নানা ধরনের প্রয়োজন মেটাতে সে অনুযায়ী লক্ষ্য নিয়ে, লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন শ্রম দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করা হয়। কার্যকর শ্রম হচ্ছে সেই শ্রম, যা সচেতনতার সাথে সম্পাদিত হয়, যেখানে ওই ব্যক্তি জানে কি সে করছে, কেন করছে এবং কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করছে। উপকারী জিনিস তৈরি করা যায় একমাত্র কার্যকর শ্রম দিয়ে। স্পষ্ট ধারণা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না নিয়ে বিশৃঙ্খল ভাবে যদি কোন কাজ করা হয়, সেখানেও শ্রম জড়িত থাকে। এই ধরনের কাজে কিছু শ্রম অবশ্যই ব্যয় হয়। কিন্তু, এই শ্রম হবে অকার্যকর শ্রম। এই ধরনের শ্রম কোন ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করবে না। চেয়ার, কম্বল, মাটির পাত্র এবং শার্ট – এই ৪ ধরনের জিনিস ৪ ধরনের শ্রম দিয়েই তৈরি করা হয়েছে :

কাঠ	+ চেয়ার তৈরির নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাঠমিস্ত্রির শ্রম	= চেয়ার
সুতা	+ কম্বল তৈরির নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বুনন শ্রম	= কম্বল
মাটি	+ মাটির পাত্র তৈরির নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে মৃৎশিল্প শ্রম	= মাটির পাত্র
কাপড়	+ শার্ট তৈরির নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দর্জিগিরি শ্রম	= শার্ট

এভাবে আমরা দেখতে পাব প্রত্যেকটা জিনিসই শ্রমের ফল, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সম্পাদিত হয়েছে।

যখন আমরা বলি 'সেলাই কাজ তো একটা শার্ট তৈরি করল', কথাটা এই অর্থ করে না যে এখানে অন্য কোন শ্রমের প্রয়োজন নেই? – না। একটা শার্ট তৈরি করতে বিভিন্ন ধরনের শ্রম লাগে তুলা উৎপাদন থেকে যার শুরু। তুলা উৎপাদন শ্রম, তুলা থেকে সুতা তৈরির শ্রম, সুতা দিয়ে কাপড় বোনার শ্রম এবং কাপড় থেকে শার্ট বাননোর সেলাই শ্রম এমন ধরনের ৪ কিম্বা ৫ ধরনের শ্রম এখানে প্রয়োজন হয়। যা হোক, এই সকল ধরনের শ্রম কিন্তু একই স্থানে এবং একই সময়ে সম্পাদিত হয় না। যখন আমরা শার্টের কথা বলি, সেটা দিয়ে কাপড়ের শার্টে রূপান্তরের যে ধাপ তাকেই উল্লেখ করি। যেহেতু এই ধাপে সেলাই কাজের দরকার হয়, আমরা তাই সেলাই শ্রমের কথা বলি। এটার অর্থ এই নয় যে অন্য কোন ধরনের শ্রমের প্রয়োজন এখানে নেই। অন্য ধরনের শ্রমের উল্লেখ এই স্তরে প্রাসঙ্গিক নয়, যেখানে কাপড় শার্টে রূপান্তরিত হচ্ছে।

কম্বলের ক্ষেত্রেও একই কথা। যেহেতু কম্বল তৈরিতে বুনন শ্রমের দরকার হয়, তাই এই স্তরে আমরা বলি 'কম্বল তৈরিতে বুনন শ্রম দরকার'। এর অর্থ এই নয় যে অন্য ধরনের শ্রমের এখানে প্রয়োজন নেই।

একটা জিনিস তৈরি করতে যে যে ধরনের কাজ করা লাগে, সেগুলো একসাথে সম্পাদিত হয় না। যখন একটা জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ধাপ বা স্তরের কথা বিবেচনা করা হয়, আমরা সেই ধাপে যে কাজটা সম্পাদিত হয় তাকেই লক্ষ করি। আমরা যখন 'তুলা'র কথা বলি, তুলা উৎপাদনের কাজে জড়িত কৃষি শ্রমকেই আমরা লক্ষ করি। আমরা যখন 'সুতা'র কথা বলি, এই স্তরে সুতা দিয়ে সম্পাদিত বুনন শ্রমের দিকটাকে লক্ষ করি, যা সুতাকে কাপড়ে রূপান্তরিত করে। যখন আমরা শার্টের কথা বলি, কাপড় থেকে শার্টে রূপান্তরের এই ধাপে ব্যবহৃত সেলাই শ্রমের দিকটাকে আমরা লক্ষ করি। এভাবেই আমরা শ্রমকে বিবেচনায় রেখে একটা জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করি।

বিভিন্ন জিনিস তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের যেসব শ্রম দিয়ে, তার প্রতিটা শ্রম, অর্থাৎ সেলাই কাজ, কাঠমিস্ত্রির কাজ, কৃষি কাজ অথবা অন্য কোন কাজ, স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধরনের কাজ হিসেবে অস্তিত্ববান হয়। এভাবে একটা নির্দিষ্ট ধরনের কাজ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এই বলে : 'এটা হলো একটা নির্দিষ্ট ধরনের কাজ'। এভাবে প্রতিটা নির্দিষ্ট ধরনের কাজ স্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়। যখন একজন কাঠমিস্ত্রি একটা চেয়ার তৈরি করে, এই কাজটা কাঠমিস্ত্রির কাছে তো বটেই, অন্য সকলের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কাজটা দেখছে এমন কারও কাছে একজন যদি প্রশ্ন করে, 'তুমি কি দেখছো',

তাহলে ওই ব্যক্তির জবাব হবে : 'আমি একটা চেয়ার তৈরির কাজ দেখছি'। তদ্রূপ, একটা কম্বল বানানোর কাজও সকলের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, সেলাই কাজ থেকে লাঙল চষার মতো কাজের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। এভাবে যেকোন কাজের একটা নির্দিষ্ট ধরন আছে, যা প্রত্যেকের চোখে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। এভাবে যেকোন শ্রম যার একটা রূপ আছে এবং যা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, তাই হলো 'মূর্ত শ্রম'।

বুনন কাজ - একটা নির্দিষ্ট ধরনের শ্রম। এর অর্থ হলো এটা একটা 'বিশেষ' ধরনের শ্রম। যদিও আমরা জানি বুনন কাজেরও বিভিন্ন ধরন আছে। শাড়ি, কম্বল, তোয়ালে বা গামছা - এগুলোর বুনন কাজ আবার একই ধরনের নয়। যদিও বুনন কাজের মধ্যে অসংখ্য ধরন আছে, এখানে আমরা বিষয়টাকে সহজ করার জন্য, সব ধরনের বুনন কাজকে একই ধরনের বুনন শ্রম হিসেবে বিবেচনা করেছি।

এমনি ভাবে কাঠমিস্ত্রির কাজ এবং সেলাই কাজ এমন প্রতিটা কাজেরও বিভিন্ন ধরন আছে, তথাপি আমরা এখানে এগুলোর প্রত্যেকটা ধরনের কাজের উপ-ধরনকে বিবেচনা না করে এদেরকে একই ধরনের শ্রম হিসেবে ধরে নিয়েছি।

বুনন কাজ	– মূর্ত শ্রম (একটা বিশেষ ধরনের শ্রম)	
সেলাই কাজ	– মূর্ত শ্রম	"
কাঠমিস্ত্রির কাজ	– মূর্ত শ্রম	"
কৃষি কাজ	– মূর্ত শ্রম	"
ওষুধ তৈরির কাজ	– মূর্ত শ্রম	"

এভাবে বিভিন্ন শ্রম দিয়ে তৈরি করা জিনিস আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে, মূর্ত শ্রমের কারণেই এটা সম্ভব হয়।

সকল মূর্ত শ্রম প্রত্যেকের চোখেই দৃশ্যমান হয়। যখন আমরা একটা চেয়ারকে দেখি, আমরা জানি এটা একজন কাঠমিস্ত্রি তৈরি করেছে। যদি এটা পেইন্টিং করা চেয়ার হয়, আমরা বুঝি চেয়ারের ওপরে পেইন্টিং শ্রমটা সম্পাদিত হয়েছে, এটা একটা পেইন্টিং করা চেয়ার। আমরা যদি একটা শার্টকে দেখি, শার্টটা বানাতে কাপড় কাটা, কাপড় সেলাই করা অথবা বোতাম লাগানো এমন প্রতিটা কাজ করা যে হয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি। একটা বই যদি আমরা দেখি, আমরা বুঝি একজন লেখক বইটা লিখেছেন এবং এটা ছাপানো হয়েছে। যেকোন জিনিসই হোক না কেন, আমরা যখন সেটা দেখি, আমরা বুঝি কোন ধরনের শ্রম দিয়ে জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে। এটার অর্থ হলো প্রতিটা জিনিসের যেমন প্রাকৃতিক গুণাবলি আছে, যথা – রঙ, স্বাদ, গন্ধ, ওজন এবং উচ্চতা, প্রতিটা জিনিস তৈরিতে বিশেষ ধরনের শ্রম লাগে এটাও তেমনিই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য জিনিসটা শারীরিক গঠনে দৃশ্যমান হয়। একটা জিনিস কোন ধরনের শ্রম দিয়ে তৈরি হয়েছে

সেটা যদি আমরা বুঝি, তাহলে কোন ধরনের হাতিয়ার বা যন্ত্র ওই শ্রমের সাথে সম্পর্কিত ছিল, সেটাও আমরা বুঝতে পারি। এভাবে জিনিস এবং শ্রমের মধ্যকার এই সম্পর্ক একটা প্রাকৃতিক সম্পর্ক, তাই শ্রমটা জিনিসের মধ্যে দৃশ্যমান বা মূর্ত হয়ে থাকে।

২. যেসব শ্রম জিনিস তৈরি করে না

দর্জির কাজ, বুনন কাজ, কাঠমিস্ত্রির কাজ এবং কৃষিকাজ এমন ধরনের বিভিন্ন শ্রম দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি হয়। কিন্তু, গাড়ি চালানো, ছাত্র পড়ানো এবং চিকিৎসা করা এমন ধরনের শ্রম থেকে কোন জিনিস তৈরি হয় না। এসব শ্রম কেবলমাত্র কাজের একটা ধরন হিসেবেই গণ্য হয়। তথাপি, এগুলোও মূর্ত শ্রম। যেহেতু অভাব বিভিন্ন ধরনের তাই শ্রমও বিভিন্ন ধরনের।

যেসব শ্রম দিয়ে জিনিস তৈরি হয় এমন শ্রমের ক্ষেত্রে, শ্রম সম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই আমরা প্রস্তুতকৃত জিনিসটা ব্যবহার করতে পারি। আমরা কাপড় ব্যবহার করতে পারি বুনন কাজ সম্পূর্ণ হলে পর। সেলাই প্রক্রিয়া শেষ হলেই কেবলমাত্র আমরা জামাকাপড় ব্যবহার করতে পারি। এই ধরনের শ্রমের ক্ষেত্রে, শ্রম সম্পাদন কাজ সম্পূর্ণ হলেই কেবলমাত্র আমরা এই শ্রম কাজে লাগাতে পারি। গাড়ি চালানোর মতো শ্রমের ক্ষেত্রে, শ্রম সম্পাদন প্রক্রিয়া চলমান অবস্থায় একে কার্যকর ব্যবহারে নিতে পারি। গাড়ি যখন চলমান রয়েছে, এই অবস্থায়ও গাড়ির যাত্রিরা গাড়ি চালানোর শ্রমকে কাজে লাগাতে পারছেন। এভাবে এই চলমান শ্রমকে ভ্রমণের কাজে লাগাতে পেরে উপকৃত হচ্ছে। ছাত্রদের পড়ানোর কাজ এবং চিকিৎসার কাজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও, জিনিস তৈরি করে এবং জিনিস তৈরি করে না, এই দুই ধরনের শ্রমের ক্ষেত্রে বিশেষত্বের বিচারে প্রকৃতিগত একটা পার্থক্য রয়েছে। আমরা এখানে শ্রমের সেসব দিককেই বিবেচনা করছি যেসব দিকগুলো সব ধরনের শ্রমে সমভাবে প্রযোজ্য। যাহোক এখানে আমরা উদাহরণকে সহজ করার জন্য, আমাদের এই অনুসন্ধান কাজে সেসব শ্রমকেই বিবেচনা করবো যেগুলো দিয়ে জিনিস তৈরি করা যায়। তাই, জিনিস উৎপাদন করে এমন শ্রমের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম হুবহু প্রযোজ্য, জিনিস উৎপাদন করে না এমন শ্রমের ক্ষেত্রেও সেসব নিয়ম প্রযোজ্য এমনটাই আমরা ধরে নিচ্ছি।

যখন আমরা শ্রমের কথা বলি, এটা অপরিহার্য যে শ্রমটা একটা বিশেষ ধরন নিয়ে অস্তিত্বশীল রয়েছে অর্থাৎ মূর্ত শ্রম হিসেবে রয়েছে, যেমন– দর্জিগিরি, বুনন কাজ অথবা মিস্ত্রিগিরি। শ্রম একটা ধরন ছাড়া, অর্থাৎ বিশেষত্ব ছাড়া অস্তিত্ববান হতে পারে না। এটা শ্রমের একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এটা ছাড়াও, শ্রমের একটা পরিমাপযোগ্য পরিমাণ থাকে। আমরা সাধারণত বলি '২ ঘন্টার দর্জি শ্রম'। এখানে 'দর্জি শ্রম' হচ্ছে ওই শ্রমের একটা বিশেষ ধরন (বৈশিষ্ট্য) এবং '২ ঘন্টা' হচ্ছে

শ্রমের পরিমাণ। আমরা সাধারণত বলি '৩ ঘন্টার বুনন শ্রম'। এখানে বুনন হচ্ছে ওই শ্রমের একটা বিশেষ ধরন (বৈশিষ্ট্য) এবং '৩ ঘন্টা' হচ্ছে শ্রমের পরিমাণ। এভাবে বলা যায়, যেকোন শ্রমের অবশ্যই একটা বিশেষ ধরন এবং পরিমাণ থাকে।

একটা জিনিস তৈরির ক্ষেত্রে, ধরা যাক, 'চেয়ার' তৈরির ক্ষেত্রে, আমরা যদি একটা ধাপকে বিবেচনা না করে তক্তার জন্য গাছ লাগানো থেকে শুরু করে চেয়ার রঙ করা পর্যন্ত সকল ধাপকে বিবেচনা করি, আমরা দেখতে পাব চেয়ারটা তৈরি করতে বিভিন্ন ধরনের মূর্ত শ্রমের প্রয়োজন হচ্ছে। কম্বলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যেকোন জিনিসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

২. বিমূর্ত শ্রম (Abstract Labour)

মূর্ত শ্রম থেকে যদি আমরা বিশেষ ধরনকে বাদ দিয়ে পরিমাণকে বিবেচনা করি, তখন সেটাই হবে 'বিমূর্ত শ্রম'। আমরা যদি '১ ঘন্টার দর্জি শ্রম'-কে ১ ঘন্টার শ্রম হিসেবে দেখি, এর অর্থ হবে শ্রমের পরিমাণকে বিবেচনা করা হলো ধরনকে বাদ দিয়ে। '১ ঘন্টার শ্রম' কথাটা থেকে আমরা শ্রমের পরিমাণ জানতে পারি, কিন্তু কোন্ ধরনের শ্রম তা জানতে পারি না। আমরা যখন বলি '১ ঘন্টার দর্জি শ্রম' এবং '২ ঘন্টার বুনন শ্রম' যোগ হয়ে '৩ ঘন্টার শ্রম' হলো, এ থেকে কোন অর্থ প্রকাশ পায়? এর অর্থ হলো, এখানে আমরা দুই ভিন্ন ধরনের শ্রমের কোন্ বিশেষ ধরনকে বিবেচনা না করে কেবলমাত্র শ্রমের পরিমাণকে বিবেচনা করলাম। এখানে আমরা দুই ধরনের মূর্ত শ্রমকে সম্মিলিত করলাম এবং এই সম্মিলিত শ্রমকে 'বিমূর্ত শ্রম' হিসেবে দেখলাম। এভাবে একের অধিক শ্রমকে সম্মিলিত করে তাকে মোট শ্রম হিসেবে দেখার অর্থ হলো বিভিন্ন মূর্ত শ্রমকে 'বিমূর্ত শ্রম' হিসেবে দেখা, যেখানে এসব শ্রমের বিশেষ ধরনকে বিবেচনা করা হয় না।

যখনই আমরা একের অধিক শ্রমকে সম্মিলিত করি এবং 'মোট শ্রম'-এর কথা বলি, এভাবে আমরা মূর্ত শ্রমগুলোকে 'বিমূর্ত শ্রম' হিসেবে প্রকাশ করি।

আমরা যদি একটা পাত্রে ১ গ্লাস দুধ এবং ২ গ্লাস পানি ঢালি এবং বলি এখানে ৩ গ্লাস তরল পদার্থ আছে, তখন এখানে তরল পদার্থের পরিমাণ কত সেটাই বলা হয়, কিন্তু কোন্ কোন্ ধরনের তরল আছে সেটা আর বলা হয় না। আমরা যদি একটা বাস্কেটে ৩ কিলো গুড় আর ২ কিলো ময়দা রাখি এবং বলি এটা ৩ কিলোর একটা বাস্কেট, তাহলে এখানে জিনিসের ওজনই শুধু বলা হয়, কিন্তু কোন্ কোন্ ধরনের জিনিস আছে তা আর বলা হয় না। এভাবে বিভিন্ন শ্রমকে সম্মিলিত করে শ্রমের মোট পরিমাণ কত কেবলমাত্র এটাই বললে, কোন্ কোন্ ধরনের শ্রম আছে তা আর বলা হয় না।

মূর্ত শ্রম -- কোন ধরনের শ্রম এবং কত পরিমাণ শ্রম দুটোই থাকে
বিমূর্ত শ্রম -- কত পরিমাণ সেটাই থাকে

মূর্ত শ্রম		বিমূর্ত শ্রম
১ ঘন্টার দর্জিগিরি	-----	১ ঘন্টার শ্রম
২ ঘন্টার বুনন	-----	২ ঘন্টার শ্রম
২ দিনের মিস্ত্রিগিরি	-----	২ দিনের শ্রম
৪ দিনের খনি খনন	-----	৪ দিনের শ্রম
৩ দিনের লাঙল চাষ	-----	৩ দিনের শ্রম

এভাবে মূর্ত শ্রম থেকে বিশেষ দিক বাদ দিলে, সেটাই হবে বিমূর্ত শ্রম।

৩. বিভিন্ন শ্রমের মধ্যে সমতুল্যতা
(Aspect of equality among different babours)

যখন আমরা ১ ঘন্টার দর্জিগিরি শ্রম এবং ২ ঘন্টার বুনন শ্রমের কথা বলি, আমরা দর্জি শ্রম এবং বুনন শ্রম এই উভয় শ্রম ঘন্টায় কত পরিমাণ তাই বলি। অর্থৎ আমরা দর্জি শ্রম এবং বুনন শ্রম এই উভয় শ্রমকে একই পরিমাপ দণ্ডে অর্থাৎ ঘন্টায় প্রকাশ করি। এই পরিমাপ দণ্ড হলো 'সময়'। কিন্তু, এই উভয় শ্রম পৃথক ধরনের শ্রম – একটা দর্জি শ্রম এবং অন্যটা বুনন শ্রম। কীভাবে ভিন্ন ধরনের শ্রম একই মানদণ্ডে মাপা সম্ভব হলো? এটা সম্ভব হয় কারণ উভয় ধরনের এই শ্রমের মধ্যে বিদ্যমান সমতুল্যতার এমন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি, যা হলো শ্রম। এখানে দর্জিগিরিও একটা শ্রম আবার বুনন কাজও একটা শ্রম। যেহেতু এদের উভয়ের রয়েছে শ্রমের মতো একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাই সাধারণ মানদণ্ড 'সময়' দিয়ে এদের উভয়কে পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে।

যদিও দুধ এবং পানি এমন পদার্থ যাদের রয়েছে ভিন্ন বিশেষত্ব, কিন্তু 'গ্লাস'-এর মতো একই মাধ্যম ব্যবহার করে পরিমাপ করা যাচ্ছে। কেন এমনটি সম্ভব হচ্ছে? কারণ তারা উভয়ই 'তরল' পদার্থ। কারণ উভয়ের রয়েছে এমন সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তারা তরল। তদ্রূপ, গুড় এবং ময়দাও এমন বস্তু যাদের রয়েছে ভিন্ন বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তারা উভয়ই 'কঠিন' পদার্থ। যেহেতু কঠিন পদার্থ হিসেবে তাদের উভয়ের রয়েছে একই বিশেষত্ব, তাই তাদেরকেও একই মাধ্যম দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব, আর তা হলো ওজন মাপার 'বাটকারা'। তদ্রূপ, বিভিন্ন ধরনের শ্রমের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা প্রযোজ্য। বুনন, দর্জিগিরি, মিস্ত্রিগিরি, লেখা, কর্তন করা, খনি খনন করা এবং লাঙল দিয়ে চাষ – এই সকল কাজই হলো শ্রম! যেকোন ধরনের কাজই হলো শ্রম! সকল শ্রমই 'মানুষের শরীর' দিয়ে সম্পাদিত হয়। মানুষের মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশিকে যেকোন কাজ সম্পাদনের জন্য কাজে লাগাতে হয়। সেহেতু 'শ্রম' নামের যেকোন কিছুকে একই ভাবে 'সময়'-এর মতো মাধ্যম ব্যবহার করে পরিমাপ করা সম্ভব।

ধরে নিলাম, চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা উদাহরণ অনুসারে চেয়ার তৈরিতে মোট শ্রম সময় হলো ৩ ঘন্টা এবং কম্বল তৈরিতেও মোট শ্রম সময় ৩ ঘন্টা। কিছু মূর্ত শ্রম দিয়ে চেয়ারটা তৈরি করা হয়েছে এবং কম্বলটাও কিছু মূর্ত শ্রম দিয়ে তৈরি হয়েছে। চেয়ার তৈরির সকল শ্রমকে আমরা বলতে পারি 'কাঠমিস্ত্রির শ্রম' এবং কম্বল তৈরির সকল শ্রমকে আমরা বলতে পারি 'বুনন শ্রম'। চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যকার বিনিময়ের ঘটনা, কাঠমিস্ত্রির শ্রম এবং বুনন শ্রমের মধ্যেকার বিনিময়ের ঘটনাকে প্রকাশ করে। মূলত, নির্দিষ্ট ধরনের শ্রম যা চেয়ার তৈরি করেছে এবং নির্দিষ্ট ধরনের শ্রম যা কম্বল তৈরি করেছে, এই দুয়ের মধ্যেই এই বিনিময়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এমনটা বলাই সঠিক। তবু, সংক্ষেপে বলার জন্য আমরা বলি কাঠমিস্ত্রির শ্রম এবং বুনন শমের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়েছে। যদিও এরা দুই ভিন্ন ধরনের শ্রম, কিন্তু 'শ্রম'-এর মতো একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাদের রয়েছে বিধায় তাদের মধ্যে বিনিময় সম্ভব হচ্ছে এবং 'সময়'-এর মতো একই মাধ্যম ব্যবহার করে তাদেরকে পরিমাপ করাও সম্ভব হচ্ছে।

৪. জিনিস উৎপাদন এবং পরিভোগের জন্য কেবলমাত্র ব্যবহারিক মূল্য পরিমাপের প্রয়োজন হয়, কিন্তু মূল্য নয় (For production and consumption of articles, only meassures of 'use-values' are necessary but not meansures of 'value')

জিনিস তৈরির জন্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি অর্থাৎ হাতিয়ার এবং মূর্ত শ্রমের দরকার হয়। সেহেতু, জিনিস তৈরির জন্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং মূর্ত শ্রম এমন সবকিছু পরিমাপ করা একটা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় বিষয়। একটা চেয়ার তৈরির জন্য কিছু তক্তা, নির্দিষ্ট ধরনের কিছু যন্ত্রপাতি এবং কিছু কাঠমিস্ত্রি-শ্রম লাগে। চেয়ারের সাইজ অনুসারে তক্তা লাগে এবং আমরা সেই পরিমাণ তক্তা সংগ্রহ করি। ধরে নিলাম, চেয়ারের জন্য ১ কিউবিক ফুট তক্তা লাগবে। যন্ত্রপাতি তো আমাদের লাগবে, সেগুলো যে ধরনেরই হোক না কেন। যারাই জিনিস তৈরি করে, এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহারযোগ্য থাকার জীবনকাল সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা রয়েছে। তক্তা দিয়ে চেয়ার তৈরি করতে কত ঘন্টা মিস্ত্রি শ্রম লাগবে তারও একটা হিসেব থাকতে হবে। ধরা যাক, এখানে ২ ঘন্টা মিস্ত্রি শ্রম লাগবে। চেয়ার তৈরি করতে দরকার এমন সব কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতিকে যখন আমরা ব্যবহার মূল্য হিসেবে বিবেচনা করব, আমাদেরকে এদের আকার এবং বিশেষত্বর দিকটা দেখতে হবে। তদ্রূপ, চেয়ার তৈরি করতে দরকার যে শ্রম তাকে মূর্ত শ্রম হিসেবে বিবেচনা করতে

হবে, তাই আমাদেরকে 'কত ঘন্টা মিস্ত্রি শ্রম লাগবে' শ্রমের যে নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে তার ভিত্তিতে সেই হিসাবটা করতে হবে।

ধরে নিলাম, চেয়ারটা তৈরি হয়ে গেল, এখন বার্নিশ করতে হবে। এটা বার্নিশ করার ধাপ। এখানে আমাদেরকে বার্নিশ ছাড়া চেয়ারকে বার্নিশ-করা চেয়ারে রূপান্তরিত করতে হবে। এখানে কিছু বার্নিশ এবং বার্নিশ করার ব্রাশের দরকার হবে। এখানে বার্নিশহীন চেয়ার, বার্নিশ করার কাঁচামাল এবং ব্রাশ হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হবে (এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশে কাঁচামাল এবং হাতিয়ার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে, সেখান থেকে আমরা কাঁচামাল এবং হাতিয়ার কী সেসব জানতে পারব)। এভাবে আমরা জানলাম যে জিনিস তৈরির যেকোন ধাপে কাঁচামাল, হাতিয়ার এবং কিছু শ্রম দরকার হয়।

'কম্বল' তৈরির ক্ষেত্রে আমরা ৩টা ধাপের কথা ভাবতে পারি। তুলা উৎপাদনের ধাপ, তুলা থেকে সুতো তৈরির ধাপ এবং সুতো থেকে কাপড় বুনার ধাপ – এগুলো এখানে লাগবে। এটা যদি ফুলওয়ালা কম্বল হয়, তখন ফুল প্রিন্ট করার আর একটা ধাপ এখানে লাগবে। এভাবে উৎপাদনের প্রত্যেকটা ধাপে আমাদেরকে কাঁচামাল, হাতিয়ার এবং মূর্ত শ্রমের পরিমাণ কত সেটা হিসেব করতে হবে। প্রত্যেকটা ধাপে ব্যবহৃত এসব হাতিয়ার এবং শ্রমকে হিসেবে নিয়ে কম্বল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মোট শ্রমের হিসেব করতে হবে।

যেকোন জিনিস তৈরি করতে এই ধরনের পরিমাপের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং হাতিয়ারের পরিমাপই যথেষ্ট। জিনিসটা তৈরিতে দরকারি শ্রমের পরিমাপ মূর্ত শ্রম হিসেবে বিবেচনা করাই যথেষ্ট। এভাবে জিনিস তৈরি করতে **'ব্যবহারিক মূল্য'**-এর প্রেক্ষাপট ব্যতীত অন্য কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনার দরকার নেই। অন্যান্য ধরনের হিসাব এবং অন্যান্য ধরনের পরিমাপের কোন দরকার নেই। এর অর্থ হলো এই যে জিনিস তৈরির জন্য মূল্যের হিসাব এবং মূল্যের পরিমাপের দরকার হয় না। আমাদের আলোচনা আরও এগিয়ে গেলে এই দিকটার গুরুত্ব ভালভাবে অনুধাবন করা যাবে।

যখন জিনিসের পণ্যে রূপান্তর অবধারিত হয়ে পড়ে, অর্থাৎ 'বিনিময়' সংঘটিত হয়, তখন মূল্যের পরিমাপকে পরিহার করা সম্ভব হয় না। জিনিসের মূল্য জানা না থাকলে বিনিময় সম্ভব নয়। তাই যদি বিনিময় করতে হয়, তাহলে জিনিসের মূল্যের হিসাব ও পরিমাপ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যখন আমরা জিনিসের 'মূল্যের পরিমাপ'-এর কথা বলি, আমরা জানি এর একমাত্র অর্থ হলো জিনিস তৈরিতে ব্যয়িত মোট শ্রমের পরিমাপ। একটা জিনিসের মূল্যের পরিমাপ করতে, অর্থাৎ

জিনিসটা তৈরিতে 'ব্যয়িত মোট শ্রম'-এর হিসাব করতে, বিনিয়োজিত কাঁচামাল, হাতিয়ার এবং মূর্ত শ্রমের বিশেষত্ব সবই বিলীন হয়ে যায় এবং একমাত্র তাদের শ্রমের পরিমাণই বিবেচনা করা হয়।

আমরা যদি একটা চেয়ারের কথা ধরি এবং একে একটা পণ্য হিসেবে বিবেচনা করি, যা বিনিময় হতে যাচ্ছে। এর অর্থ হলো চেয়ারের মূল্যের হিসেব করতে এখন আমরা বাধ্য। ধরে নিলাম এখানে কিছু তক্তা, কিছু হাতিয়ার এবং ২ ঘন্টার কাঠমিস্ত্রি-শ্রম প্রয়োজন। চেয়ার তৈরিতে দরকার এমন তক্তা এবং হাতিয়ারও জিনিস, সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, এগুলোও তৈরি করতে শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা ধরে নিলাম তক্তা তৈরির শ্রম এবং হাতিয়ার তৈরির শ্রম হলো মোট '১ ঘন্টার শ্রম'। এই ১ ঘন্টার শ্রমের সাথে কাঠমিস্ত্রির শ্রম যা তক্তাকে চেয়ারে রূপান্তরিত করেছে, যুক্ত হলে হয় মোট ৩ ঘন্টার শ্রম। এটাই হলো চেয়ার তৈরিতে ব্যয়িত মোট শ্রম। একমাত্র এই শ্রম চেয়ারের মূল্য গঠন করে।

মূল্য দেখার অর্থ হলো 'মোট শ্রম' দেখা। সেহেতু, যখন আমরা মূল্য দেখি, ওই জিনিসটা তৈরিতে ব্যয়িত বিভিন্ন ধরনের শ্রম বিস্তারিত ভাবে উপস্থিত বা প্রকাশিত হয় না এবং এই কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন হাতিয়ারের শ্রমও উপস্থিত বা প্রকাশিত হয় না। 'মূল্য' হলো বিমূর্ত শ্রম। বাস্তবে কোথাও বিমূর্ত শ্রম থাকতে পারে না। শ্রম যেখানেই অস্তিত্বশীল হোক, একটা না একটা ধরন নিয়েই সেটা প্রকাশিত হয়। কিন্তু, একমাত্র মূল্য হিসেব করার প্রয়োজনে একটা অস্বাভাবিক বর্গ হিসেবে বিমূর্ত শ্রমকে বিবেচনায় নিতে হয়।

জিনিস উৎপাদন করতে দরকার এমন বিভিন্ন উপাদানকে নানাবিধ ব্যবহার-মূল্য দিয়ে বিচার করা সম্ভব। এভাবে বলাটাই স্বাভাবিক যে, এতগুলো কাঠ, এসব ধরনের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি এবং এই ক'জন কাঠমিস্ত্রি জিনিসটা তৈরিতে দরকার। ঘটনাকে এভাবে দেখার অর্থ হলো, ঘটনাকে ব্যবহার-মূল্যের প্রেক্ষাপটে দেখা। এর পরিবর্তে, চেয়ারটা তৈরি করতে সব মিলিয়ে মোট এত মূল্য দরকার, এভাবে বলাটা অস্বাভাবিক। এটা হয় জিনিসগুলোকে মূল্যের প্রেক্ষাপটে দেখা।

তদ্রূপ, এমনকি একটা জিনিস ব্যবহার করতে ব্যবহার-মূল্যের পরিমাপ করাটাই কেবলমাত্র দরকার হয়, কিন্তু মূল্য পরিমাপের দরকার হয় না, যেসব জিনিস ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। ব্যবহার করা ব্যতীত কোন জিনিস অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না, এমনকি যদি আমরা জিনিসটার মূল্য হিসেব না করেই তা ব্যবহার করি। একটা জিনিস এভাবেই আমাদের কাজে লাগে, আমরা তার মূল্য হিসেব করি আর না করি। একটা জিনিস তার ব্যবহার-মূল্য দিবে, এক্ষেত্রে জিনিসটার মূল্য হিসেব করা হোক আর না হোক। জিনিস উৎপাদন এবং পরিভোগ যাই করা হোক

না কেন, জিনিসটা তৈরি করতে মোট শ্রম কত তার হিসেবের কোন দরকার নেই। সেহেতু বলা যায়, মূল্যের হিসেব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। এখন আমরা বিমূর্ত শ্রমের কয়েকটা দিক দেখব।

৫. 'মূল্য' অর্থ একমাত্র 'শ্রম'! ('Value' means 'labours' only!) কিন্তু, 'শ্রম' অর্থ মূল্য বোঝায় না!! (But, 'labour' does not mean value!!)

সকল জিনিস শ্রম দিয়ে উৎপাদিত হয়। কোন জিনিস শ্রম ছাড়া তৈরি হয় না। যাহোক, একটা জিনিস তৈরিতে ব্যয়িত শ্রম দিয়ে মূল্য গঠিত হতে হবে, এমনটা অপরিহার্য নয়। একটা জিনিসে ব্যয়িত শ্রম মূল্য হিসেবে পরিগণিত হবে কেবলমাত্র অন্য একটা জিনিসের সাথে জিনিসটার বিনিময় ঘটলে পর। যদি কোন বিনিময় ছাড়াই জিনিসটা ব্যবহার করা হয়, ওই জিনিসের ক্ষেত্রে কোন 'মূল্যর হিসেব'-এর প্রশ্ন আসবে না। এর অর্থ হলো, ওই জিনিসে ব্যয়িত শ্রম 'মূল্য' হিসেবে গণ্য হতে পারল না। তখন ওই জিনিসটা একমাত্র ব্যবহার-মূল্য নিয়েই টিকে থাকে।

কোন ব্যক্তি বা পরিবার কিছু শস্য উৎপাদন করল এবং তা নিজেদের কাজে লাগাল, ওই শস্যের কোন মূল্য থাকবে না। আমরা যদি বলি এটার তো কোন 'মূল্য নেই', এটার অর্থ কি তাহলে শস্যের কোন 'মূল্য' থাকবে না? যখন আমরা বলি এটার কোন মূল্য নেই, তার অর্থ কি জিনিসটা তৈরি করতে কোন শ্রম ব্যয় হয়নি? না, কারণ কোন জিনিস শ্রম ছাড়া তৈরি হয় না। এর একটাই অর্থ, তা হলো, যেহেতু জিনিসটা বিনিময় প্রক্রিয়ায় যাইনি, তাই ওই জিনিসে ব্যয়িত শ্রম মূল্য গঠন করতে পারেনি।

যদিও একমাত্র শ্রমই মূল্য গঠন করে, কিন্তু এমন কোন নিয়ম নেই যে শ্রম মূল্য গঠন করবেই। কথাটা সংক্ষেপে এভাবেই বলা যায় : "মূল্য অর্থ একমাত্র শ্রম, কিন্তু শ্রম অর্থ মূল্য বোঝায় না" – কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য যদি আমরা অনুধাবন করতে না পারি, তাহলে একটা জিনিস মূল্য ধারন করে থাকে এমন একটা ধারণা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে আমাদের কাছে পরিগণিত হবে। ধারণাটা এভাবেই উপস্থিত হয় : যেহেতু কোন জিনিস শ্রম ব্যতীত অস্তিত্বশীল হতে পারে না, এবং সেহেতু আমরা ধরে নিই যে শ্রম অর্থ একমাত্র মূল্য, এটা এভাবেই উপস্থিত হয় যেন-বা একটা জিনিস শ্রম ছাড়া অস্তিত্বশীল হয় না।

একটা জিনিস শ্রম ব্যতীত অস্তিত্বশীল হয় না, এই ঘটনা থেকে এভাবে সিদ্ধান্ত টানাটা ভুল যে একটা জিনিস মূল্য ছাড়া অস্তিত্বশীল হয় না। এই ধারণা থেকে এই দাবি করাও ভুল হবে যে শ্রম অর্থ একমাত্র মূল্য।

এটা সঠিক যে "একটা জিনিস শ্রম ব্যতীত অস্তিত্বশীল হয় না।"

যাহোক, এটা বলা ভুল যে "শ্রম অর্থ একমাত্র মূল্য।" 'শ্রম' আবশ্যিকভাবে 'মূল্য' হয় না। শ্রম তখনই একমাত্র মূল্য গঠন করে, যখন জিনিস বিনিময় করা হয়, অন্যথায় শ্রম মূল্য গঠন করবে না। একটা জিনিস যদিও শ্রম দিয়ে তৈরি হয়, তবুও মূল্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে।

বিনিময়ের মতো অস্বাভাবিক ঘটনার কারণে শ্রম মূল্য হয়ে ওঠে, অন্যথায় শ্রম স্বাভাবিক ভাবে বা নিজ থেকে মূল্য হয়ে ওঠে না।

যদি শ্রমের মূল্যে রূপান্তরের ঘটনা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম হতো, তাহলে মূল্য না দিয়ে জিনিস ব্যবহার করা সম্ভব হতো না (জিনিসের বিনিময় না সংঘটিত করে)। নিজ কর্তৃক তৈরি জিনিস নিজের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। যেহেতু মানুষের পক্ষে নিজের তৈরি জিনিস নিজের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে, মূল্যের বিষয়টা হিসেবে না এনেই, এটার অর্থ হলো শ্রমের মূল্যে রূপান্তর একটা অপরিহার্য নিয়ম নয়।

জিনিসের মূল্য পরিমাপের মতো এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, কেন আমাদের বাস্তব জীবনে ঘটছে? দৈনন্দিন জীবনে জিনিসের সাথে জিনিসের বিনিময়ের ঘটনা ঘটেই চলেছে, এটাই হলো এর কারণ। জিনিস বিনিময়ের জন্য, জিনিসের মূল্য কত সেটা আমাদের জানতে হয়। যখন থেকে বিনিময়ের ঘটনা ঘটছে, সেই সময় থেকেই মূল্য পরিমাপের ঘটনাও নির্দিষ্টরূপে ঘটে চলেছে।

কী কারণে মূল্য মাপার মতো একটা অপ্রাকৃতিক (অস্বাভাবিক) ঘটনা ঘটেই চলেছে? এর উত্তর হলো "এর কারণ হলো বিনিময় আছে তাই"। তখন এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে "কেন অস্বাভাবিক বিনিময় টিকে রয়েছে?" এর উত্তর হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থা। এর অর্থ হলো : সম্পত্তির উপর ব্যক্তির মালিকানা স্বত্বই বিনিময়ের মূল ভিত্তি তৈরি করেছে। আমরা আলোচনাকে যতই সামনে এগিয়ে নেব, এই বিষয়টাকে বিশদ ভাবে জানতে এর আরও গভীরে ততই আমাদের যেতে হবে। বর্তমানে আমরা বিষয়টা সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করব।

আমরা যদি এই অস্বাভাবিক মূল্য পরিমাপের ঘটনাকে থামিয়ে রাখি, তাহলে বিনিময় বন্ধ হয়ে যাবে। এর অর্থ হল : সমগ্র সমাজ বিনিময় ছাড়াই জিনিসপত্র ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এটা সম্ভব করতে, কিছু পরিবর্তন পূর্বেই সম্পূর্ণ করতে হবে। সমাজে সমগ্র মানব জাতির জন্য উৎপাদন এবং পরিভোগের কাজ অভাব অনুসারে সমবেত ভাবে সম্পন্ন হতে হবে। একমাত্র এ পথেই আমরা বিনিময়কে পরিহার করতে পারব। এক্ষেত্রে আমাদেরকে কয়েকটা বিষয় বিশদ ভাবে জানতে হবে। আমরা এখানে সংক্ষেপে জানলাম "মূল্য অর্থ একমাত্র শ্রম, কিন্তু শ্রম অর্থ মূল্য বুঝায় না"।

৬. জিনিস এবং পণ্য (Article and commodity)

চেয়ার তো একটা জিনিস, যা নির্দিষ্ট একটা বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে, এখানে চেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন কাঠ। এটা তৈরি করতে নির্দিষ্ট কিছু যন্ত্রপাতি এবং কিছু মূর্ত শ্রম লেগেছে। এই চেয়ারটার একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে, যা বসার প্রয়োজনে কাজে লাগে।

কম্বলও একটা জিনিস, যা সুতার মতো একটা নির্দিষ্ট বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে। এখানেও নির্দিষ্ট কিছু যন্ত্রপাতি এবং কিছু মূর্ত শ্রম লেগেছে। এই কম্বলটারও একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে, যা শীতার্ত শরীরকে গরম রাখতে দেহটাকে ঢেকে রাখার কাজে লাগে।

যদি এই দুটো জিনিসের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়, তখন তারা উভয়ে পণ্য হয়ে যায়, যতক্ষণ এই বিনিময় সম্পর্ক বজায় থাকে। চেয়ার এবং কম্বল তৈরি করতে ব্যয়িত মোট শ্রমই হলো তাদের বিনিময় মূল্য। চেয়ারের মোট শ্রম হলো চেয়ারের বিনিময় মূল্য এবং কম্বলের মোট শ্রম হলো কম্বলের বিনিময় মূল্য।

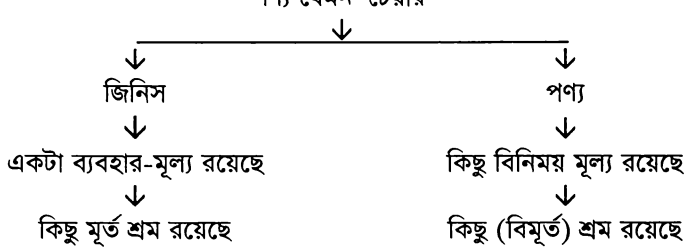
আমরা যদি এই চেয়ারকে বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে না নিয়ে ব্যবহার করি, তাহলে এটা জিনিসই থেকে যাবে পণ্য হতে পারবে না। অন্য যে-কোন জিনিসের ক্ষেত্রেও একই কথা। কোন জিনিস বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করলে, জিনিসটা দ্বৈত্য চরিত্র পেয়ে যায়, একদিকে সে জিনিস আবার পণ্যও। আমরা বিষয়টাকে একটু বিশদ ভাবে এখানে পরীক্ষা করব।

চেয়ারটা যখন বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তার চেয়ার থাকার গুণাবলি রুদ্ধ হয়ে যায় না। এর বস্তুগত বৈশিষ্ট্য নিঃশেষ হয়ে যায় না। এমনকি বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করেও সে চেয়ারই থেকে যায়। এভাবেই সে পণ্য হওয়ার বৈশিষ্ট্যও অর্জন করে। এর অর্থ হলো : একটা জিনিস বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করলে, জিনিস হিসেবে তার থাকে ব্যবহারিক মূল্য এবং পণ্য হিসেবে থাকে বিনিময় মূল্য। এভাবে বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে থাকা অবস্থায় একটা জিনিস যেমন পণ্য হয়ে ওঠে আবার জিনিসও থেকে যায়। যদিও এই দুই চরিত্র একই সময়ে কার্যকর থাকতে পারে না। যখন কোন জিনিসকে আমরা বস্তুগত দিক থেকে দেখি, তখন তার থাকে ব্যবহার-মূল্য এবং যখন তার মূল্যকেই কেবলমাত্র বিবেচনা করি, তখন এটা হয় একটা পণ্য যার কিছু মূল্য রয়েছে। যখন চেয়ার বা কোন জিনিসকে ব্যবহার-মূল্য রয়েছে এমন একটা জিনিস হিসেবে দেখি, এটার শ্রম তখন হয়ে যায় মূর্ত শ্রম। যখন একে কিছু মূল্য রয়েছে এমন একটা পণ্য হিসেবে দেখি, এটার শ্রম তখন হয় বিমূর্ত শ্রম।

প্রাকৃতিক	অপ্রাকৃতিক
জিনিস	পণ্য
ব্যবহারিক মূল্য	বিনিময় মূল্য
মূর্ত শ্রম	বিমূর্ত শ্রম

পণ্য হিসেবে জিনিসটার থাকে প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক উভয় বৈশিষ্ট্যই, এভাবে একটা পণ্য এমন দুটো বৈশিষ্ট্য নিয়েই বিদ্যমান থাকে, যে বৈশিষ্ট্য দুটো পরস্পরের সাথে দ্বান্দ্বিক চরিত্রের। একটা জিনিস যা পণ্য হয়ে ওঠেনি, তার এই ধরনের দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্য থাকবে না।

আমাদের একটা জিনিসকে কখনও 'পণ্য' বলা ঠিক হবে না। কিন্তু একটা পণ্যকে জিনিসও বলতে পারি, কারণ একটা পণ্য একদিকে জিনিস আবার পণ্যও বটে।



এই যৌক্তিকতা যেকোন জিনিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

যারাই 'অর্থনীতি বিদ্যা' বুঝতে চান, তাদের প্রথমেই উচিত হবে এটা জানা যে, একটা পণ্যের জিনিস এবং পণ্য হিসেবে দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদি এটা জানা না থাকে, তাহলে সমাজে নিরন্তর ঘটে চলা ঘটনাগুলোর মধ্যে কোন্‌টা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক এবং কোন্‌টা অপ্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক, সেটা জানা সম্ভব হবে না। কোন একটা জিনিস (পণ্য) যার ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময় মূল্য উভয়ই রয়েছে, তাকে যথার্থ অর্থে না বুঝলে, এই দুটো বৈশিষ্ট্যকে স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হবে। অর্থাৎ, কোন জিনিসের জন্য মূল্য অর্জন করাটা ব্যবহার-মূল্য অর্জনের মতো একটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হবে, এবং এটাও মনে হবে যে কোন জিনিসের পক্ষে মূল্য ব্যতীত অস্তিত্ববান থাকা সম্ভব নয়। পণ্যের মধ্যে বিদ্যমান এই দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্যকে যদি আমরা পরীক্ষা করি, তাহলে দেখতে পাব যে একটা জিনিসের পক্ষে মূল্য ছাড়াও অস্তিত্ববান থাকা সম্ভব। অর্থাৎ, একটা জিনিস পণ্যে রূপান্তরিত না হয়েও থাকতে পারে, যদিও শ্রম দিয়েই সেটা তৈরি হয়েছে।

৭. 'উৎপাদনশীলতা' কী? (What does 'productivity' mean?) ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময় মূল্যের সাথে এর সম্পর্ক কী? (What is its relationship with use-value and exchange value?)

উৎপাদনশীলতার অর্থ হলো জিনিস তৈরির ক্ষমতা। ধরে নিলাম, একজন দর্জি হাতের সেলাই দিয়ে এক ঘন্টায় ১টা শার্ট সেলাই করতে পারে। কিন্তু, সেলাই মেশিন প্রবর্তনের কারণে এই দর্জি সেলাই মেশিন ব্যবহার করে যদি ১ ঘন্টায় ২টা বা ৩টা শার্টের সেলাই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে, তাহলে এটা হবে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি। (কেবলমাত্র মেশিন প্রবর্তনের কারণে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটে না, আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে যার প্রয়োগে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব, পরবর্তী আলোচনায় আমরা সেসব জানতে পারব)।

একই কাল পরিধিতে অতীতে যতটুকু কাজ করা যেত, তার তুলনায় বর্তমানে যদি ওই কাল পরিধিতে বেশি পরিমাণ কাজ করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটা হবে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি। অতীতের তুলনায় যদি কম পরিমাণ কাজ করা হয়, তাহলে সেটা হবে উৎপাদনশীলতার হ্রাস।

একটা সুদীর্ঘ সময়কে যদি আমরা বিবেচনায় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখা যাবে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটেছে যা অবধারিত; এবং এটার কখনও হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটছে না।

হস্তচালিত তাঁতের বুনন কাজ যদি পাওয়ারলুম চালিত বুনন কাজ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়, এটা হবে একটা অগ্রগতি যা একটা দীর্ঘ কাল পরিধিতে ঘটে। এটা কখনই ঘটে না যে, পুনরায় হস্তচালিত লুমের প্রবর্তন হবে যেভাবে আগে বুনন কাজ চলত তাই আবার চালু হবে, ফলে উৎপাদনশীলতা পুনরায় অতীতের মতো হবে। আমরা যদি প্রতি ১০ বা ২০ বছরের কাল পরিধিতে উৎপাদনশীলতাকে পরীক্ষা করি, দেখা যাবে অতীতের তুলনায় এর অগ্রগতি ঘটেছে এবং এটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দীর্ঘ কাল পরিধির তুলনায়, আমরা যদি ৬ মাস বা ১ বছর এমন কম সময়ের কাল পরিধিকে বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদনশীলতাকে পরীক্ষা করি, তাহলে এটা কমেও যেতে পারে আবার বাড়তেও পারে। কোন এক বছরের উৎপাদনশীলতা পরবর্তী বছরে একই না-ও থাকতে পারে। এক সময়ের উৎপাদন ক্ষমতা অন্য কোন সময়ে এক না-ও থাকতে পারে। উৎপাদন ক্ষমতা আর উৎপাদনশীলতা একই কথা। আমরা যেকোন একটা ব্যবহার করতে পারি।

ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময় মূল্যের সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক

যখন আমরা বলি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কথাটার অর্থ কী? ওই শ্রমটা কী, যার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে? এর অর্থ কি বুনন শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটেছে? কিছু মেশিন প্রবর্তিত হলে, ওসব মেশিন দিয়ে কিছু বিশেষ ধরনের শ্রমভিত্তিক কাজ সম্পাদিত হয়। যদি দর্জি কাজের জন্য নতুন একটা মেশিন কাজে লাগান হয়, তাহলে দর্জি শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটবে। যদি কাঠমিস্ত্রির কাজে নতুন একটা মেশিন প্রবর্তন করা হয়, এই কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। যদি অন্য কোন কাজে নতুন মেশিন প্রবর্তন না করে কেবলমাত্র দর্জি কাজেই একটা নতুন মেশিন প্রবর্তন করা হয়, তাহলে দর্জি কাজের শ্রমের উৎপাদনশীলতাই একমাত্র বৃদ্ধি পাবে অন্য কাজের নয়।

যখন আমরা 'উৎপাদনশীলতা'-র কথা বলবো, যেকোন একটা শ্রমের কথাই কেবলমাত্র বিবেচনা করতে হবে। আমরা এখানে চেয়ার তৈরির শ্রমের কথা বিবেচনা করতে পারি। এটা হলো কাঠমিস্ত্রির শ্রম, যা কাঠকে চেয়ারে পরিণত করে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আগে, ধরা যাক, ১ ঘন্টায় ১টা চেয়ার তৈরি হয় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরে ১ ঘন্টায় ৪টা চেয়ার তৈরি হয়। ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময় মূল্যে এই পরিবর্তন কী ফলাফল আনবে?

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আগে ১ ঘন্টায় ১টা চেয়ার তৈরি হতো। বর্তমানে একই শ্রমে (১ ঘন্টার শ্রমে) ৪টা চেয়ার তৈরি হচ্ছে। তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবহার-মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন একই শ্রমে অধিক জিনিস তৈরি হচ্ছে। যদিও ১টা চেয়ারের ব্যবহার-মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আগে ও পরে একটা জিনিসের ব্যবহার-মূল্য একই থেকে যাচ্ছে। উৎপাদনশীলতার সাথে ব্যবহার-মূল্যের ক্ষেত্রে এটাই ফলাফল।

এই ফলাফল বিনিময় মূল্যের ক্ষেত্রে উদ্ভূত ফলাফলের সাথে দ্বান্দ্বিক। ১ ঘন্টার শ্রমের মূল্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আগেই যেমন ছিল এখনও একই থাকছে। ১ ঘন্টার শ্রম সর্বদাই ১ ঘন্টার শ্রম। ১ ঘন্টার শ্রমের মূল্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে ১ ঘন্টার শ্রমের মূল্যের সমানই থেকে যাচ্ছে। কিন্তু, একটা জিনিসের মূল্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে কমে যাচ্ছে। ঘটনাটা এভাবেই ঘটছে : চেয়ারের মূল্য গঠনে কাঁচামালের শ্রম, যন্ত্রপাতির শ্রম এবং কাঠমিস্ত্রির শ্রম যুক্ত হয়ে সম্মিলিত ভূমিকা রাখে, কিন্তু এখানে কাঠমিস্ত্রির শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চেয়ার তৈরিতে যে পরিমাণ কাঠমিস্ত্রির শ্রম প্রয়োজন, তার একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেহেতু, 'উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে ১ ঘন্টার শ্রম'-এ ৪টা চেয়ার এখন তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে, যে '১ ঘন্টার শ্রম' পূর্বে ১টা চেয়ার তৈরি করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছিল। এভাবে চেয়ার তৈরির জন্য প্রয়োজন এমন কাঠমিস্ত্রি শ্রমের

একটা বিশাল পরিমাণ অর্থাৎ মোট শ্রমের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটেছে, ফলে চেয়ারের মূল্য কমে যাবে। এর অর্থ হলো, যখন একটা নির্দিষ্ট শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, মোটের ওপর ১ ঘন্টার শ্রমের মূল্য না কমলেও, ওই ১ ঘন্টার শ্রম দিয়ে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করা সম্ভব হয় বিধায়, ওসব জিনিসের প্রতিটা তৈরিতে শ্রম সময় কমে যায়, ফলে মূল্য কমে যায়।

যদি কৃষি কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যে কৃষিজ শ্রম চেয়ার তৈরিতে কাজে লাগে যে-তক্তা সেই কাঁচামাল উৎপাদন করছিল, তখন তক্তা তৈরির প্রয়োজনীয় শ্রম সময় কমে যায়, ফলে তক্তার মূল্য কমে যাবে এবং চেয়ারের মূল্যও কমে যাবে। তদ্রূপ, চেয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছিল যেসব যন্ত্রপাতি, সেসব যন্ত্রপাতি তৈরির শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে, তাদের মূল্য কমে যায়, ফলে চেয়ারের মূল্যও কমে যাবে। এভাবে, চেয়ার তৈরি করতে যেসব শ্রম কাজে লাগে, তাদের অন্ততঃ যেকোন একটার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে, চেয়ারের মূল্য কমে যায়। মূল্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটলে এমনটাই হয় ফলাফল।

ধরে নিলাম, চেয়ার তৈরিতে প্রয়োজন '১ ঘন্টার কাঠমিস্ত্রি শ্রম' এবং কম্বল তৈরিতে প্রয়োজন '১ ঘন্টার বুনন শ্রম'। এর অর্থ হলো চেয়ার এবং কম্বলের মূল্য সমান। এখানে '১টা চেয়ার' এবং '১টা কম্বল' এই দুটো জিনিসের বিনিময় সম্ভব।

১টা কম্বল = ১টা চেয়ার
(১ ঘণ্টার বুনন শ্রম) = (১ ঘণ্টার কাঠমিস্ত্রি শ্রম)

এমনটাই যদি আমরা ধরে নেই যে, কাঠমিস্ত্রি শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে '১ ঘন্টা'-র শ্রমে ৪টা চেয়ার তৈরি করা যাচ্ছে। এর অর্থ হলো, ১টা চেয়ার তৈরিতে প্রয়োজন এমন কাঠমিস্ত্রির শ্রম এখন আর '১ ঘন্টা' তো নয়ই, তা হলো '১৫ মিনিট'। এখানে ১টা চেয়ারের পূর্বেকার মূল্য ৪টা চেয়ারের মূল্যে অর্পিত হচ্ছে না।

ধরা যাক, কম্বলের উৎপাদনশীলতায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি, এখন পর্যন্ত ১ ঘন্টার শ্রমই কম্বল তৈরিতে কাজে লাগছে। এমন অবস্থায়ও কি পূর্বের মতো ১টা কম্বল এবং ১টা চেয়ারের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হবে? না, এমনটা ঘটবে না। কারণ এই জিনিস দুটো তৈরিতে ব্যয়িত শ্রম সময় এখন আর পূর্বের মতো একই নেই। এখন কম্বল তৈরিতে লাগছে '৬০ মিনিট'-এর শ্রম এবং চেয়ার তৈরিতে লাগছে '১৫ মিনিট'-এর শ্রম। কম্বলের মূল্য পূর্বের মতো একই থাকছে, কিন্তু চেয়ারের মূল্য দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। সেহেতু চেয়ারের মালিকের পক্ষে কম্বলের প্রয়োজন থাকলেও, চেয়ারের বিনিময়ে তা পাওয়া সম্ভব হবে না। যদি সে ৪টা চেয়ার দেয়, তাহলে কম্বলটা পাওয়া সম্ভব হবে। সমীকরণটা হবে এমন :

১টা কম্বল = ৪টা চেয়ার
(১ ঘন্টার বুনন শ্রম) = (১ ঘন্টার কাঠমিস্ত্রির শ্রম)

৪টা চেয়ারের জন্য ১টা কম্বল, এর অর্থ এই নয় যে '১ ঘন্টার বুনন শ্রম'-এর বিনিময়ে '১ ঘন্টার কাঠমিস্ত্রির শ্রম'-এর অধিক শ্রম বিনিময় করতে হবে। এটার একমাত্র অর্থ হলো : এমন কি এখনও পূর্বের মতোই '১ ঘন্টার বুনন শ্রম'-এর সাথে '১ ঘন্টার কাঠমিস্ত্রি'র শ্রমের বিনিময় ঘটছে।

এখন আমরা আগের উদাহরণে আবার ফিরে যাব। ওই উদাহরণে চেয়ার এবং কম্বল এই উভয়ের প্রত্যেকের শ্রম সময় ছিল '১ ঘন্টা'। এটা বিবেচনায় রেখেই আমরা ধরে নিলাম, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে অর্ধেকে নেমে গেছে। এর অর্থ হলো, এখন ১টা চেয়ার তৈরি করতে '১ ঘন্টা' তো নয় বরং '২ ঘন্টা' সময় লাগছে। ধরে নিলাম কম্বল তৈরির শ্রমের উৎপাদনশীলতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি, এখনও কম্বল তৈরিতে '১ ঘন্টা' শ্রম লাগছে। এখন কী ধরনের বিনিময়ের ঘটনা কম্বল এবং চেয়ারের মধ্যে সংঘটিত হবে? এখনও কি '১টা কম্বল' এবং '১টা চেয়ার'-এর মধ্যে বিনিময়ের ঘটনা সংঘটিত হবে? না, তেমনটা ঘটবে না। কারণ দুটো জিনিস তৈরিতে ব্যয়িত শ্রম পূর্বের মতো আর একই নেই। এখন চেয়ারে রয়েছে ২ ঘন্টার শ্রম এবং কম্বলে রয়েছে ১ ঘন্টার শ্রম। সমীকরণটা এমন :

১টা চেয়ার = ২টা কম্বল
(২ ঘন্টার কাঠমিস্ত্রির শ্রম) = (২ ঘন্টার বুনন শ্রম)

কম্বলের উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন ঘটলে এই সমীকরণের যুক্তিধারাই প্রযোজ্য থাকবে। তখনও ফলাফল একই প্রকৃতির থাকবে। যে পদ্ধতিতেই হোক যেকোন শ্রমের উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন ঘটলে (এটা বৃদ্ধি পাক বা কমে যাক বা যাকিছুই ঘটুক না কেন), মূল্য দেওয়ার এবং নেওয়ার উভয় ঘটনার মূলভিত্তি একই থাকবে, জিনিসের পরিমাণের পরিবর্তন সমীকরণ অনুযায়ীই ঘটবে।

কৃষি ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা সব সময় একই থাকে না। কোন এক বছরে তুলার উৎপাদন ভাল হতে পারে এবং শস্যের ফলন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অথবা গত বছরের তুলনায় ফসল ভাল হতে পারে। অথবা সকল শস্যের উৎপাদন কমে যেতে পারে। এভাবে সব সময় উৎপাদন ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে চলেছে। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যদি আমরা বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারকে আয়ত্ত করে তা দক্ষতার সাথে প্রয়োগে নিতে পারি। উৎপাদনশীলতার যে প্রকৃতিরই পরিবর্তন ঘটুক, ব্যবহার-মূল্যে এবং (বিনিময়) মূল্যে এর প্রভাব কী হবে, তা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হলো।

যখন একটা শ্রমের 'উৎপাদনশীলতা'-র পরিবর্তন ঘটে :

১. ব্যবহার-মূল্যের ওপর এর প্রভাব

যদি আমরা '১ ঘন্টা' বা '১ দিন' বা '১ বছর' বা একটা নির্দিষ্ট সময়কালকে বিবেচনা করি, আমরা দেখতে পাব 'জিনিসের বস্তুসামগ্রী' অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্য পরিমাণে বৃদ্ধি অথবা হ্রাস একটা না একটা ঘটবে। যদিও জিনিসের একক ইউনিটের ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

২. মূল্য অর্থাৎ বিনিময় মূল্যের উপর এর প্রভাব

যদি একটা নির্দিষ্ট সময়কালকে বিবেচনায় নিই, আমরা দেখতে পাব ওই নির্দিষ্ট সময়কালে উৎপাদিত মূল্যের পরিমাণে মোটের ওপর কোন পরিবর্তন ঘটছে না। যদিও একটা জিনিসের একক ইউনিট তৈরিতে প্রয়োজন যে শ্রম সময় তার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটছে, ফলে জিনিসের মূল্য কমতে পারে বা বাড়তে পারে।

৮. 'সামাজিক শ্রম সময়' (Social Labour Time) এবং 'উৎপাদনশীলতা'-এর (Productivity) মধ্যকার সম্পর্ক

'সামাজিক শ্রম সময়' অর্থ হলো সেই সময় যা একটা কাজ সম্পন্ন করতে লাগে, এটাই 'গড় শ্রম সময়'। একটা কাজ করার গড় শ্রম সময় ওই কালপর্যায়ে বিদ্যমান ওই কাজের উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে।

আমরা ধরে নিলাম, একটা কাল পরিধিতে বুনন কাজ হস্তচালিত তাঁতে সম্পন্ন হচ্ছে এবং অন্য এক কাল পরিধিতে পাওয়ারলুম দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এই দুই কালের ভেতর সময়ের ব্যবধান ২০ বছর। প্রথম সময়কালে (হস্তচালিত তাঁতের স্তরে) '১টা কম্বল' তৈরি করতে গড়ে সময় লাগে '১ ঘন্টা'। যদিও গড়টা ওই কালপর্যায়ের সব সময় সুনির্দিষ্টভাবে একই থাকবে না।

ধরা যাক, দ্বিতীয় সময়কালে (পাওয়ারলুম ব্যবহারের স্তরে) '১টা কম্বল' তৈরি করতে গড়ে সময় লাগছে 'আধা ঘন্টা'। যদিও এই পর্যায়েও সব সময় শ্রম সম্পাদনের সময় সুনির্দিষ্টভাবে একই থাকবে না। এভাবেই হোক বা ওভাবেই হোক এর পরিবর্তন ঘটবে। তবুও যতই পরিবর্তন ঘটুক সময়টা আধা ঘন্টার কাছাকাছিই থাকবে।

ধরে নিলাম, একমাত্র বুনন কাজে নতুন মেশিন চালু করা হয়নি, জমি চাষ কাজেও নতুন মেশিন চালু করা হয়েছে। ধরে নিলাম, স্পিনিং কাজেও নতুন মেশিন চালু করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় ওই সব শ্রমেরও উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যাবে। যেহেতু নতুন মেশিন চালু হওয়ায় কম্বলের কাঁচামাল তৈরিতে কম সময় লাগছে, কম্বল তৈরির শ্রম সময়ও পরিমাণে অনেক কমে যাবে।

এভাবে, যেহেতু কম্বল তৈরির জন্য প্রয়োজন যেসকল উপাদান সেসব তৈরিতে কাজে লাগে যেসব শ্রম তার প্রত্যেকের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটেছে, জিনিসটা তৈরির গড় শ্রম সময় কমে যাবে।

বুনন কাজে পাওয়ারলুমের প্রবর্তন মানে এই নয় যে হ্যান্ডলুম সম্পূর্ণ উঠে যাবে, এবং কেউই আর হ্যান্ডলুম ব্যবহার করছে না। সমগ্র সমাজের প্রয়োজন যত কাপড়, এর একটা বৃহৎ অংশ পাওয়ারলুম দিয়ে উৎপাদিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র অংশ হ্যান্ডলুম দিয়ে উৎপাদিত হবে, তবুও এই পর্যায়কে পাওয়ারলুমের যুগই বলতে হবে। এই কালপর্যায়ে পাওয়ারলুম ব্যবহার করে '১ মিটার' কাপড় তৈরি করতে গড়ে যে সময় লাগছে সেটাই হবে ওই কাজের গড় শ্রম সময়। যদিও এই পর্যায়ে কিছু মানুষ হ্যান্ডলুম দিয়ে কাপড় বুনে যাবে, যেখানে '১ মিটার' কাপড় তৈরি করতে বেশি সময় লাগবে। যদিও এখানে সময় বেশি লাগছে, এটাকে বিবেচনায় না নিয়ে পাওয়ারলুম চালুর কারণে গড় সময় যা হয়েছে, তাকেই হিসেবে নিয়ে গড় শ্রম সময় নির্ধারণ করা হয়। এভাবে একটা নির্দিষ্ট ধরনের কাজের সামাজিক শ্রম সময় বা গড় শ্রম সময় ওই সময়ে বিদ্যমান ওই নির্দিষ্ট শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে। এটাই হলো 'সামাজিক শ্রম সময়' এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যকার সম্পর্কর বৈশিষ্ট্য।

৯. 'শ্রম বিভাজন' (Division of Labour) কথাটার অর্থ কী? কোথায় এর অবস্থান?

আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন এমন জিনিস নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে। এখানে আমরা ধরে নিলাম, কয়েকটা পরিবারের সক্ষম সদস্যরা শস্য উৎপাদন করছে এবং কয়েকটা পরিবারের সদস্যরা কাঠমিস্ত্রির কাজ করছে। অন্য কয়েকটা পরিবারের সক্ষম সদস্যরা কেবলমাত্র মাটির পাত্রই তৈরি করছে। এভাবে কয়েকজন ব্যক্তি যদি একই প্রকৃতির কাজ করে এবং কয়েকজন ব্যক্তি যদি অন্য আর একটা একই প্রকৃতির কাজ করে, তাহলে এটাই হলো 'শ্রম বিভাজন'। এই উদাহরণ অনুসারে কাঠমিস্ত্রির শ্রম হলো স্বতন্ত্র বা স্বাধীন একটা শাখা। আমরা যদি সমগ্র সমাজের সকল ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন এমন সকল ধরনের শ্রমকে সমগ্রভাবে একটা 'সামাজিক শ্রম বৃক্ষ' হিসেবে কল্পনা করি, তাহলে কাঠমিস্ত্রির শ্রম হবে এই বৃক্ষের একটা শাখা এবং মাটির পাত্র তৈরির শ্রম হবে আর একটা শাখা। সমাজে একটা নির্দিষ্ট কালপর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের শ্রম চালু থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিটা একই প্রকৃতির এই স্বতন্ত্র স্বাধীন শ্রম হবে ওই সামাজিক শ্রম বৃক্ষের এক একটা শাখা। এই স্বতন্ত্র শ্রম শাখা সমগ্র সমাজের জন্য দরকার এমন বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্য তৈরি করে চলেছে।

এখন আমরা একটা বা দুটা স্বাধীন বা স্বতন্ত্র শ্রমকে একটু বিশদ ভাবে দেখতে পারি। বর্তমানে কিছু ব্যক্তির যদি জামা-কাপড়ের প্রয়োজন থাকে, তাহলে তারা নিজেরাই এসব তৈরি করছে না। তারা চাহিদা মতো দর্জির কাছ থেকে জামা-কাপড় সেলাই করিয়ে নিচ্ছে, যে দর্জি কেবলমাত্র এই সেলাই কাজেই নিয়োজিত রয়েছে।

কিন্তু, অনেক কাল আগে কোন এক সময় সমাজে দর্জির আবির্ভাব ঘটেনি, যারা কেবলমাত্র সেলাই কাজ করে। এটার অর্থ এই নয় যে, মানব জাতি তখন কাপড়-চোপড় ব্যবহার করত না। তুলা উৎপাদন, কাপড় বুনন, পোশাক সেলাই এবং পোশাক পরিধান করা এসবই তখনও চালু ছিল। যদিও তখনকার সমাজে দর্জির আবির্ভাব ঘটেনি, তাহলে কে সেলাই কাজ করে দিত? মানুষ তখন নিজেদের পোশাক নিজেরাই সেলাই করে নিয়ে পরিধান করত।

কোন কৃষক পরিবারের সদস্যরা নিজেদের কাপড় নিজেরাই সেলাই করে নিত, কাঠমিস্ত্রির পরিবারের সদস্যরাও নিজেদের পোশাক নিজেরাই সেলাই করে নিত। মৃৎ পাত্র তৈরির পরিবারও একই কাজ করত। এমন এক সময় ছিল, যখন মানুষ নিজেদের প্রয়োজনীয় সেলাই কাজ নিজেরাই করে নিত, এমন কোন ব্যক্তির উদ্ভব ঘটেনি যার কাছ থেকে সেলাই কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হতো। এর অর্থ হলো, তখনকার সমাজে এমন কোন একক ব্যক্তির উদ্ভব ঘটেনি, যিনি সেলাই কাজ করে দিবে, অর্থাৎ তখনকার সমাজে দর্জিগিরি পেশার আবির্ভাব ঘটেনি। যদিও সেই সমাজে 'সেলাই কাজ' চালু ছিল, সমাজে বিদ্যমান শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে এই কাজটা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন শাখা হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। এটার অর্থ হলো তখন পর্যন্ত আবির্ভূত হয়েছে শ্রমের এমন স্বতন্ত্র বা স্বাধীন শাখাগুলোর সাথে এই কাজটাকে পৃথক করা যেত না।

কোন কৃষক পরিবারের সদস্যদের কেউ যদি কৃষি কাজের সাথে সেলাই কাজটাও করতো, সেলাই কাজকে কৃষি কাজ থেকে পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হতো না। অন্য কোন পরিবারের কেউ তার নিজস্ব কাঠমিস্ত্রির কাজের সাথে সেলাই কাজটাও করে নিত, তখনও সেলাই কাজকে পৃথক একটা কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। তদ্রূপ কামারের কাজ বা সুতোর মিস্ত্রির কাজ থেকে সেলাই কাজটাকে পৃথক একটা কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো না। সেলাই কাজ অন্যান্য স্বতন্ত্র কাজের সাথে মিলেমিশে বিদ্যমান ছিল।

পরবর্তী কোন এক সময় দর্জির আবির্ভাব ঘটল, এভাবে সমাজে সকলের সেলাই কাজ করে দেওয়া শুরু হলো। দর্জি কেবলমাত্র নিজের সেলাই কাজটা করত না, সাথে সাথে অন্যদের সেলাই কাজটাও করে দিত। তার নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সে অন্যদের কাছ থেকে নিয়ে নিত। এভাবে যখন দর্জির আবির্ভাব ঘটল, মানুষ নিজেদের পোশাক আর নিজেরা সেলাই করত না।

কোন কৃষক পরিবারের সদস্য দর্জিকে কিছু শস্য দিয়ে নিজেদের পোশাক ওই দর্জির কাছ থেকে সেলাই করিয়ে নিত। কুমোরের পরিবারের সদস্য দর্জিকে কিছু মাটির পাত্র দিয়ে তাদের কাপড় সেলাই করিয়ে নিত। কাঠমিস্ত্রির পরিবারের সদস্যরাও কাঠের আসবাব দর্জিকে দিয়ে তাদের পোশাক সেলাই করিয়ে নিত। এভাবে যারাই ভিন্ন ভিন্ন কাজে জড়িত ছিল, তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় এমন সব পোশাক সেলাই করা বন্দ করে দিল এবং নিজেদের শ্রমে তৈরি স্বতন্ত্র স্ব স্ব দ্রব্যাদি দর্জিকে দিয়ে, তার পরিবর্তে সেলাই কাজটা করিয়ে নিতে শুরু করলো।

এর অর্থ হলো, সেলাই কাজ যা এতদিন অন্য স্বতন্ত্র বিভিন্ন শ্রমের সাথে মিলেমিশে ছিল, তা এখন পৃথক হয়ে একটা স্বতন্ত্র শ্রম হিসেবে বেরিয়ে আসল। এর অর্থ হলো, অন্যান্য কাজের সাথে দর্জি কাজ নিজেকে পৃথক করে নিতে পারল। এখন দর্জি কাজটা অন্যান্য স্বাধীন শ্রমের মতো নিজেই একটা স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করল।

ধরে নিলাম, সেই অনেক কাল আগে সমাজে কৃষি কাজ, কাঠমিস্ত্রির কাজ, কামার এবং কুমোরের কাজ, এই ৪ ধরনের কাজ স্বতন্ত্র কাজ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যখন দর্জি কাজ একটা স্বতন্ত্র কাজ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, তখনকার সমাজে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন কাজ হয়ে দাঁড়াল ৫ ধরনের।

একটা শ্রম স্বাধীন শ্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, ওই শ্রম দিয়ে তৈরি দ্রব্যাদি কেবলমাত্র ওই শ্রমদাতাদের কাছেই পাওয়া যেত। ওই শ্রম কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব প্রয়োজনই মিটাতো। কিন্তু ওই শ্রম যখন স্বাধীন শ্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন ওই শ্রম মূলত অন্যদের প্রয়োজন মেটাতে কাজ করতে লাগল। তখন ওই শ্রম দিয়ে তৈরি দ্রব্যাদি সকলের কাছে প্রাপ্তিযোগ্য হয়ে গেল। কোন শ্রম স্বাধীন শ্রম হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মানেই হলো, সমাজে এক বা একাধিক শ্রমদাতার আবির্ভাব ঘটলো যারা সকলের জন্য নিজেদের শ্রম সম্পাদন করা শুরু করল।

ধরে নিলাম, সমাজের কোন এক কালপর্যায়ে ৫ ধরনের স্বাধীন শ্রম এবং ১০ ধরনের সাধারণ শ্রম – যা স্বতন্ত্র হওয়ার অপেক্ষায় আছে – বিদ্যমান রয়েছে। এই ১৫ ধরনের শ্রম দিয়ে তৈরি দ্রব্যাদিকে একত্রে গোটা হিসেবে বিবেচনা করলে, ওগুলো হবে সমাজের জন্য প্রস্তুতকৃত সমগ্র উৎপাদন। কিন্তু এই বক্তব্য থেকে এটাও বেরিয়ে আসে যে, ওই সমাজে এমন অনেক শ্রম রয়েছে যা সমাজের জন্য প্রস্তুত সমগ্র উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। এভাবে প্রস্তুতকৃত সমগ্র উৎপাদনই হলো সমাজের বস্তুগত সম্পদ। এটা এই কথাই প্রকাশ করে যে, সমাজটা এই গোটা উৎপাদনের উপর বেঁচে আছে।

অন্যান্য শ্রম থেকে একটা শ্রমের পৃথকীকরণ এবং ওই শ্রমের পক্ষে একটা স্বাধীন শ্রম হিসেবে বেরিয়ে আসার ঘটনা হঠাৎ কোন একদিন বা কোন এক মাসে ঘটে না। এর জন্য বয়ে যায় এক সুদীর্ঘ কাল। ওই শ্রমের পক্ষে অন্যান্য শ্রম থেকে পৃথকীকরণের শুরুটা এটাই প্রকাশ করে না যে ওই শ্রমের অবির্ভাব একমাত্র তখনই ঘটে। ওই শ্রমটা সমাজে অতীত কাল থেকে সুদীর্ঘ কাল ধরে চালু থাকে এবং ব্যবহার-মূল্য তৈরি করে যায়। একটা সময়ের ব্যবধানে শ্রমটা পৃথক হয়ে স্বাধীন শ্রম হয়ে ওঠে। ওই শ্রমের পক্ষে অন্যান্য শ্রম থেকে পৃথক হওয়া সমাজের জন্য একটা অপরিহার্য ঘটনা। এভাবে স্বাধীন শ্রমদাতার আবির্ভাব ঘটে, যেমন আমাদের ক্ষেত্রে দর্জি।

সেই আদিকালেও 'শ্রম বিভাজন'-এর অস্তিত্ব ছিল, যখন সমাজে এমনকি জিনিস 'বিনিময়'-এর মতো ঘটনা শুরু হয়নি। আদিম ভারতীয় সমাজে 'বিনিময়' শুরুর আগেই 'শ্রম বিভাজন'-এর অস্তিত্ব ছিল। আমরা ধরে নিতে পারি, ওই সমাজে কিছু মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করছিল। এদের মধ্যে কিছু মানুষ শিকার করত, অন্যরা তখন পশু পালন করছিল। একটা সরল উদাহরণের স্বার্থে এই ধরনের শ্রমের কথা আমরা তুলে ধরছি। সকলে শিকার করে পাওয়া মাংস একত্রে বসে খেত। কিছু মানুষের পশু পালন থেকে পাওয়া বিভিন্ন বস্তু সকলে মিলে গ্রহণ করত। এই দ্রব্যাদি নিয়ে কেউই মূল্য পরিমাপের বা বিনিময়ের মতো ভাবনা ভাবত না। এর অর্থ হলো মূল্য উল্লেখ ছাড়াই 'শ্রম বিভাজন' সম্ভব। এর একটা প্রমাণ হিসেবে আদিম ভারতীয় সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।

বর্তমান সমাজে শত শত স্বাধীন শ্রমের অস্তিত্ব রয়েছে। একমাত্র বিনিময় আবির্ভূত হওয়ার পর থেকেই এই অসংখ্য শ্রমের শুরু। যখন 'বিনিময়' এবং 'মূল্য পরিমাপ'-এর আবির্ভাব ঘটল, 'মূল্যের ভিত্তি'-তে কোন একটা শ্রমের স্বাধীন শ্রম হিসেবে গঠন প্রক্রিয়া উপস্থিত হলো। 'বিনিময় মূল্যের পরিমাপ' করা সম্ভব হওয়ার পর থেকেই, আমরা ধরে নিতে পারি, 'সেলাই শ্রম' স্বাধীন শ্রম হিসেবে দাঁড়াতে পেরেছে। কারণ তখন '১ ঘন্টার সেলাই শ্রম'-টাও অন্যান্য শ্রমের মতো মূল্য অর্জন করতে পেরেছে।

সেলাই শ্রম একটা স্বাধীন শ্রম হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগে, ধরা যাক, কোন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির একটা শার্ট সেলাই করে দিল, এই কাজের জন্য কিছু হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে কোন মূল্য পরিশোধের প্রশ্ন এখানে আসছে না। এটা কাউকে 'সাহায্য' করার মতো একটা কাজ হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ কাজটার একটা ব্যবহার-মূল্য রয়েছে, এমনটাই আমরা ভেবে নিতে পারি। যিনি সেলাই করা শার্টটা পেলেন, তিনি বড়জোর ওই ব্যক্তিকে একটা ধন্যবাদ জানাতে পারেন, এর বেশিকিছু এখানে ঘটে না। কিন্তু, বর্তমানে যখন একজন দর্জির উপস্থিতি সমাজে

রয়ে গেছে, এটা দর্জির কাছেই শুধু নয় অন্য সকলের কাছেও পরিষ্কার যে সেলাই কাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়েছে। যিনি সেলাই করা শার্টটা পাচ্ছেন, তাকে ওই কাজের জন্য মূল্য হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে একটা মূল্য অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়েছে।

সেলাই শ্রমটা একটা স্বাধীন শ্রম হিসেবে গঠিত হওয়ার ঘটনা এটাই প্রকাশ করে যে, কোন ব্যক্তি যিনি সেলাই কাজটা করছেন, তিনি বিশেষ একটা পেশা অনুশীলন করছেন। সেহেতু এই শ্রমটা একটা বিশেষ পেশা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়।

আমরা ধরে নিতে পারি, স্বাধীন শ্রমদাতা হিসেবে দর্জির উপস্থিতি সমাজে থাকার পরেও, কোন এক ব্যক্তি তার শার্ট কোন দর্জিকে না দিয়ে নিজের শার্টটা নিজেই সেলাই করে নিল। এখানে তার এই শ্রমটা বিনিময় মূল্য হিসেবে নয় ব্যবহার-মূল্য হিসেবেই গণ্য হয়। যাহোক, এখন ওই ব্যক্তির পক্ষে নিজের শ্রমের মূল্য কত সেটা হিসাব করা সম্ভব হয়। "আমি যদি দর্জি দিয়ে এই শার্টটা সেলাই করিয়ে নিতাম, তাহলে আমাকে এত মূল্য পরিশোধ করতে হতো। সেহেতু আমার কাজের মূল্য এত" – এভাবে ওই ব্যক্তি তার কাজের মূল্য কত তা হিসেব করতে পারে।

শ্রম বিভাজনের কারণে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে নির্দিষ্ট ওই কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন সম্ভব। সেলাই কাজে আগ্রহী ব্যক্তি তার কাজটাকে প্রধান পেশা হিসেবে নিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কাপড় অন্যদের জন্য প্রতিনিয়ত তাকে সেলাই করতে হচ্ছে, একই কাজ তাকে বার বার করতে হচ্ছে, এভাবে সে ব্যাপক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দক্ষ হয়ে ওঠে। কোন ব্যক্তি তার নিজের সকল শার্ট তৈরির প্রয়োজনে বার বার সেলাই করল, এমন পরিস্থিতিতেও কোন একক ব্যক্তির পক্ষে দর্জির মতো দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়।

আমরা এখন জুতা তৈরি শ্রমটাকে দেখতে পারি : এই শ্রমটা স্বাধীন শ্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও মানুষ জুতা পরতো। তবে যে-কেউ জুতা পরতে চাইলে তাকে নিজের জুতা নিজেকেই তৈরি করে নিতে হতো, কারও কাছ থেকে এক জোড়া জুতা মূল্যের বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব ছিল না, যেহেতু সমাজে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যিনি কোন কিছুর বিনিময়ে জুতা তৈরি করে দিবে। বিনিময়ের মাধ্যমে এক জোড়া জুতা পেতে হলে, জুতা তৈরির শ্রমটা অন্যান্য শ্রম থেকে পৃথক হতে হয়। এটার অর্থ হলো জুতা তৈরির শ্রমও মূল্য পাওয়ার অধিকার অর্জন করল।

যদি অন্যান্য কাজের জন্য মূল্য পরিশোধ করতে হয়, কিন্তু জুতা তৈরির কাজের জন্য নয়, তখন কেউ অন্য কারো জন্য জুতা তৈরির কাজ শুরু করতে পারে না। জুতা যদি মানুষের 'দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন' হিসেবে একটা সামাজিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে, এবং মানুষ যদি অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে জুতা নিতে রাজি

থাকে, তখনই কেবলমাত্র জুতা তৈরির কাজটা একটা মূল্য পরিমাপের অধিকার অর্জন করে। যখন জুতা মূল্য পাওয়ার মতো এমন একটা পণ্য হয়ে ওঠে, বিনিময়ের প্রয়োজনে কোন একজন অন্যদের জন্য জুতা তৈরির কাজটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। তখন থেকেই জুতা তৈরি কাজটা অন্যান্য শ্রম থেকে পৃথক হতে থাকে। এটা দাঁড়িয়ে যায় মূল্য পাবে এমন শ্রম হিসেবে অন্যান্য স্বাধীন শ্রমের সাথে সমান মর্যাদা নিয়ে।

কথাটার অর্থ এই নয় যে, ওই শ্রমটা মূল্য পাওয়ার অধিকার অর্জন করলেই পর, ওই শ্রমটা এবং অন্যান্য শ্রমের মধ্যে বিভাজন ঘটে। কারণ কোন সমাজে 'বিনিময় মূল্য' চালু না থাকলেও ওই সমাজে 'শ্রম বিভাজন' থাকতে পারে। যাহোক, যে সমাজে একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবহার-মূল্য পাওয়া সম্ভব, সেখানে কোন শ্রম মূল্য পেলেই কেবলমাত্র ওই শ্রমের পক্ষে স্বাধীন শ্রম হিসেবে আবির্ভূত হওয়া সম্ভব।

সকল ধরনের শ্রম কিছু 'ব্যবহার-মূল্য' বা অন্যকিছু আমাদেরকে দিয়ে থাকে। এভাবে দেখলে সকল শ্রমই সমান। কিন্তু, যেহেতু ব্যবহার-মূল্য বিভিন্ন ধরনের, তাই যখন শ্রমকে 'বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্য দিচ্ছে' এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, 'সকল শ্রম সমান' কথাটা আর সঠিক থাকে না। যদি বলা হয় কোন একটা শ্রম যে শস্য দিচ্ছে এবং অন্য একটা শ্রম যে জুতা দিচ্ছে, এরা উভয় সমান, জুতা এবং শস্য এই দু'ধরনের জিনিসের দিকে তাকালে সেটা আর সঠিক থাকে না। যাহোক, ঘটনা কিন্তু এমন যে যে-কোন দুটা শ্রম সমান এটা প্রমাণিত হয়, যখন শ্রম দুটা মূল্যে রূপান্তরিত হয়।

আমরা এখানে ধরে নিলাম, অন্যদের সাথে বিনিময়ের প্রয়োজনে জুতা তৈরি শুরু হলো এবং অন্যরা জুতা তৈরি শ্রমের 'মূল্য' দিতে শুরু করল। তাহলে এটা প্রমাণিত হয় : "জুতা-তৈরি শ্রমেরও 'মূল্য' আছে, যেমন অন্যান্য শ্রমের মূল্য আছে। এর অর্থ হলো, অন্যান্য শ্রমের যাকিছু বৈশিষ্ট্য আছে, জুতা-তৈরি শ্রমেরও সেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই অর্থে, জুতা-তৈরি শ্রম অন্যান্য শ্রমের সমতুল। এভাবেই জুতা-তৈরি শ্রম অন্যান্য শ্রমের সমান।"

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'শ্রমের সমতুল্যতা' প্রমাণিত হয় একমাত্র তখনই, যখন প্রত্যেকটা শ্রম বিনিময়ের জন্য জিনিস উৎপাদন করে।

জুতা-তৈরির শ্রমকে স্বাধীন শ্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, এটা আবশ্যক নয় যে ওই শ্রম সম্পাদনকারী চর্মকারকে কেবলমাত্র ওই কাজটা বা শ্রমটা করতে হবে, অন্যান্য শ্রম নয়। একজন জুতা প্রস্তুতকারী কিছু সময়ের জন্য চাষাবাদ করতে পারে, সে কিছু সময়ের জন্য পশু পালনও করতে পারে। সে যেকোন কাজ করতে পারে। কিন্তু, তাকে অন্যদের জন্য জুতা তৈরির কাজটা অবশ্যই করতে হয়। যদি

অন্যদের জন্য জুতা তৈরি করছে এমন একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি সমাজে থাকে, তখন এটার অর্থ হয় জুতা-তৈরি একটা স্বাধীন শ্রম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

আমরা ধরে নিলাম যে কোন একই ব্যক্তি বিনিময়ের জন্য জুতা তৈরির কাজের সাথে সাথে দর্জির কাজও করছে। এটার অর্থ হলো : ওই ব্যক্তি ২টা স্বাধীন শ্রম সম্পাদন করছে। ওই ২ ধরনের শ্রম দিয়ে সে ২ ধরনের ব্যবহার-মূল্য তৈরি করছে। যদিও এই ২ ধরনের শ্রম একজন দিয়ে সম্পাদিত হচ্ছে, ওই দুটো শ্রম পৃথক পৃথক শ্রম।

'শ্রম বিভাজন' যত বেশি সংখ্যক হতে থাকে, ব্যবহার-মূল্যও সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে তত বেশি ধরনের হবে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার-মূল্য'র বৃদ্ধি পাওয়ার এই ঘটনা এটাই প্রকাশ করে যে, বিভিন্ন ধরনের পণ্যও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিনিময়ের ঘটনা বেশি বেশি ঘটতে হলে, অধিক সংখ্যক 'শ্রম বিভাজন'-এর মাধ্যমে নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের পণ্য অবশ্যই উৎপাদিত হতে হয়, এভাবে নতুন ধরনের বিভিন্ন শ্রম সমাজে আবির্ভূত হতে থাকে। যদি সমাজে 'প' হাজার ধরনের শ্রমের উপস্থিতি থাকে, তাহলে আমরা 'প' হাজার সংখ্যক পণ্যও পেয়ে যাই।

নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের জন্য, শ্রমেরও নতুন নতুন 'বিভাজন'-এর আবশ্যকতা রয়েছে। অর্থাৎ, পণ্য-উৎপাদনের জন্য শ্রম বিভাজন সবচেয়ে জরুরি। কিন্তু, 'শ্রম বিভাজন'-এর জন্য পণ্য উৎপাদন আবশ্যক নয়। এর অর্থ হলো : সমাজে যদি জিনিসের পণ্যে রূপান্তরের জন্য বিনিময় পদ্ধতির উপস্থিতি না-ও থাকে, তবুও 'শ্রম বিভাজন' বন্ধ থাকে না। বিভিন্ন ধরনের নতুন ব্যবহার মূল্যের জন্য সমাজে শ্রম বিভাজন সর্বদাই চলতে থাকে।

আমরা এখানে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চাই, জিনিস পণ্যে যদি রূপান্তরিত না-ও হয়, এমন অবস্থায়ও সমাজে শ্রম বিভাজনের প্রয়োজন রয়েছে।

একটা ফ্যাক্টরিতে রয়েছে কয়েকটা সেকশন, সমস্ত ফ্যাক্টরিটা রয়েছে একজনের মালিকানায়। ওই সব সেকশন থেকে বিভিন্ন ধরনের শ্রম কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিস উৎপাদিত হচ্ছে। এক সেকশনের জিনিস অন্য সেকশনে নেওয়া হলো, এভাবে দুটো সেকশনের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হলো এটা বলা যায় না। এখানে 'মূল্য' বিষয়টা বিবেচনায় না নিয়ে যেকোন সংখ্যক জিনিস যেকোন সেকশন কর্তৃক ব্যবহৃত হতে পারে। এই ফ্যাক্টরির বিভিন্ন ধরনের শ্রম দিয়ে উৎপাদিত বিভিন্ন জিনিসের জন্য পণ্যে রূপান্তরিত হওয়াটা কি অপরিহার্য? না, যদিও ফ্যাক্টরির এক সেকশনের জিনিস অন্য সেকশনের জন্য পণ্য হতে পারে না, কিন্তু এখানে বিভন্ন ধরনের জিনিস উৎপাদনের জন্য শ্রম বিভাজন জরুরি।

পশু-পাখিরা জীবন ধারন করে একমাত্র প্রকৃতি থেকে সরাসরি সংগৃহিত বিভিন্ন বস্তু আহার করে। তারা তাদের শ্রম দিয়ে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এসব বস্তুসমূহকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করে নেয়, যাতে করে সেসব তাদের কাজে লাগে। এই রূপান্তরিতকরণের কাজটা তারা তাদের সহজাত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়ে করে থাকে।

যখনই মানুষ শ্রম সম্পাদনের কাজ থেকে নিজেকে বিরত করবে, তাদের জীবনের প্রয়োজন কমে আসবে। এই অবস্থায় যদি তারা আবার বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন শুরু না করে, মানুষকে আবার পশু জীবনে ফিরে যেতে হবে। তখন মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং যাকিছু প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, সেসব খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে। তখন মানুষ সভ্য জগতের মানুষের মতো জীবন যাপন করতে পারবে না। যা মানুষকে মানুষের মতো করে তা হলো কার্যকর শ্রম, যা মানুষ প্রতিনিয়ত সম্পাদন করে চলেছে। সমাজটা যে স্তরেই থাকুক না কেন, সেখানে মূল্যের হিসাব-নিকাশ থাকুক আর না থাকুক, শ্রম হলো মানব জাতির জন্য একটা অপরিহার্য আবশ্যকতা। এটা হলো মানব জাতির এক চিরন্তন প্রয়োজন যা প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

মানুষের অভাব পূরণ করছে যেসব বস্তুগত সম্পদ, মানব শ্রমই তার একমাত্র উৎস নয়। আমাদেরকে প্রকৃতির দেওয়া বস্তুসমূহের কথা ভুলে গেলে চলবে না। প্রকৃতির দেওয়া এসব বস্তুর উপর মানুষের শ্রম সম্পাদিত হলেই পর সমাজের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন এমন সম্পদ তৈরি হয়।

অধ্যায় তিন

মূল্য রূপ
(Form of Value)

> পুঁজিবাদী বিকাশের পথ ছাড়া অন্য পথে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পথ খোঁজা **প্রতিক্রিয়াশীলতা**। রাশিয়ার মতো দেশে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের জন্য যত না কষ্ট পায় তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পায় পুঁজিবাদের সামান্য বিকাশের ফলে। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর নিশ্চিত স্বার্থ আছে যাতে পুঁজিবাদের দ্রুত, স্বাধীন ও বিস্তৃত বিকাশ হয়। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার যেসব অবশেষ পুঁজিবাদের বিস্তৃত, স্বাধীন ও দ্রুত বিকাশের পথে বাধা জন্মায় তার অপসারণ শ্রমিকশ্রেণীর জন্য নিশ্চিত সুবিধাজনক। ...সংস্কারের পথ বিলম্বের পথ, দীর্ঘসূত্রতার পথ, জাতীয় দেহের গলিত অংশের ধীরে ধীরে পচনের পথ। শ্রমিক ও কৃষকরাই সবচেয়ে বেশি ও সবার প্রথম এই পচনের ফল ভোগ করে। বিপ্লবের পথ হলো এই পচাগলা অংশ সোজাসুজি ও তাড়াতাড়ি কেটে ফেলার পথ, শ্রমজীবীদের নিকট এই পথই সবচেয়ে কম যন্ত্রণাদায়ক, এই পথ সোজাসুজি গলিত অংশ বাদ দেওয়ার পথ।
>
> –ভ. ই. লেনিন, *গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির দুই কৌশল*, (প্রথম প্রকাশ, ১৯০৫), সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১ম খণ্ড, ইংরেজি সংস্করণ মস্কো, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯।

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে একটা জিনিস বা পণ্যের মূল্য হলো তার উপর ব্যয়িত 'মোট শ্রম'। কিন্তু, আমরা যখন কোন জিনিসকে দেখি, তখন তার আকার, রঙ ও ধরন এসব বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে; শ্রমকেও কি আমরা সেভাবে দেখতে পাই? এটা কি দৃশ্যমান। না, কারণ শ্রম জিনিসের বস্তুগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে দৃশ্যমান হয় না। যখন আমরা একটা চেয়ারকে দেখি, শ্রমকে আমরা চেয়ারের মধ্যে দেখতে পাই না। মূল্য দৃশ্যমান ভাবে প্রকাশিত হয় না। তদ্রূপ, কম্বলকেও যদি আমরা দেখি, কম্বলের ভেতর আমরা মূল্যকে দেখতে পাব না। যেকোন জিনিসকেই আমরা দেখি না কেন, শ্রমকে তার ভেতরে আমরা দেখতে পাব না।

১. কীভাবে আমরা একটা জিনিসের শ্রমকে দেখতে পাব? (How can we see the value of an article?)

তাহলে কীভাবে আমরা একটা জিনিস তৈরিতে ব্যয়িত শ্রমকে দেখতে পাব? যে শ্রম কোন জিনিসের বস্তুগত বৈশিষ্ট্য নয়, তাকে কীভাবে আমরা জানতে পারব? কখন মূল্যটা প্রকাশিত হয়? একটা জিনিসের 'মূল্য' তখনই প্রকাশিত হয়, জিনিসটা যখন একটা 'বিনিময়' প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে।

মূল্য হচ্ছে ওই জিনিসটার বিনিময়ে যা পাওয়া যায়, যখন জিনিটা একটা বিনিময় প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। একমাত্র এভাবেই আমরা একটা জিনিসের 'মূল্য' দেখতে সক্ষম হই এবং 'মূল্য' কী তা জানতে পারি।

আমরা ধরে নিলাম, একটা চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হলো। চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হলে, তখন কী ঘটে? এর অর্থ হয়, চেয়ারের মালিক এবং কম্বলের মালিকের মধ্যে চেয়ার ও কম্বলের একটা আন্তঃবিনিময় সংঘটিত হলো। এটাই হলো 'বিনিময়'-এর অর্থ। বিনিময় কাজটা সম্পূর্ণ হয় যখন একজনের জিনিস অন্যের কাছে যায় এবং অন্যের জিনিসটা ওই ব্যক্তির কাছে চলে আসে। যদি প্রকৃত অর্থে বিনিময় সংঘটিত হয়, এই লেনদেনে ১টা জিনিসের পরিবর্তে ২টা জিনিস থাকাটা অপরিহার্য। এক দিক থেকে অন্য দিকে যাওয়ার মাধ্যমে জিনিসের এই আন্তঃবিনিময় সম্ভব হয় একমাত্র ২টা জিনিস উপস্থিত থাকলে। এর অর্থ হলো ২টা জিনিসের মধ্যে বিনিময় সম্পর্ক তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন ২টা জিনিস এই বিনিময়ে যুক্ত হয়। আমাদের উদাহরণে চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে একটা বিনিময় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যখন আমরা কোন 'বিনিময়' সম্পর্কে বলি, সেখানে ২টা জিনিস থাকতে হয় এবং তাদের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হলে, কেবলমাত্র ১টা জিনিসের মূল্য প্রকাশিত হয় না ২টা জিনিসের মূল্য অবশ্যই প্রকাশিত হয়।

চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রেও চেয়ার এবং কম্বলের মূল্য প্রকাশিত হয় । এখানেও একই ঘটনা ঘটছে। আমরা এখন দেখবো এই বিনিময়ে চেয়ার এবং কম্বলের ক্ষেত্রে প্রকৃতই কী ঘটে?

চেয়ারের পরিবর্তে যা নেওয়া হচ্ছে তা হলো ---------- চেয়ারের মূল্য
কম্বলের পরিবর্তে যা নেওয়া হচ্ছে তা হলো ---------- কম্বলের মূল্য

বাস্তবে যেটা ঘটছে তা হলা :
চেয়ারের মূল্য হলো কম্বল।
কম্বলের মূল্য হলো চেয়ার।

এভাবে আমরা 'মূল্য'-কে দেখতে সক্ষম হলাম। চেয়ার যখন বিনিময় প্রক্রিয়ায় রয়েছে, চেয়ারের পরিবর্তে আমরা যাকিছু গ্রহণ করি না-কেন, তাহলো চেয়ারের মূল্য। তদ্রূপ, কম্বলের ক্ষেত্রেও একই কথা।

যদি এই দুই ব্যক্তি তাদের স্ব স্ব জিনিস নিজেদের কাছেই রেখে দেয়, তখন আমরা উভয় জিনিসের মূল্য কী তা দেখতে পাই না।

যদি চেয়ারকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, তখন চেয়ারের মূল্যকে আমরা দেখতে পাই না। যেহেতু চেয়ারের বদলে কম্বলটা নেওয়া হচ্ছে চেয়ার এবং কম্বলের বিনিময়ের মধ্য দিয়ে, তখন কম্বল নিজেই চেয়ারের মূল্য ধারন করছে। ওই কম্বলটার দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি : "এটা হচ্ছে চেয়ারের মূল্য"। এর

অর্থ হলো, এখন চেয়ারের মূল্য একটা ধরন বা রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, যা এতক্ষণ অপ্রকাশিত ছিল।

কোন্ রূপে মূল্য প্রকাশিত হলো? 'কম্বল' রূপে এটা প্রকাশিত হলো। অর্থাৎ, চেয়ারের মূল্য হলো কম্বল। একটা জিনিসের মূল্য হলো আর একটা জিনিস।

যদি চেয়ারের বিনিময় কম্বলের সাথে না ঘটে এক জোড়া জুতার সাথে সংঘটিত হয়, তখন ওই এক জোড়া জুতাই চেয়ারের মূল্য গঠন করবে। তখন ওই জুতা জোড়ার ধরন বা রূপটা একাই চেয়ারের মূল্য রূপ গঠন করে। যদি চেয়ারের বিনিময় এক ব্যাগ শস্যের সাথে ঘটে, তখন চেয়ারের মূল্য হয় এক ব্যাগ শস্য। ওই এক ব্যাগ শস্যের রূপটা একাই চেয়ারের মূল্য রূপ গঠন করে। এভাবে, যখন একটা জিনিস দিয়ে অন্য আরেকটা জিনিস নেওয়া হয়, প্রথম জিনিসটার মূল্য হয় দ্বিতীয় জিনিসটা। এর অর্থ হলো : একটা জিনিসের মূল্য হলো অন্য একটা জিনিস, যে জিনিসটা প্রথম জিনিসটার সাথে বিনিময় করা হয়েছে।

ঘটনা হলো : "যখন একটা জিনিস (চেয়ার) আর একটা জিনিসের (কম্বল) সাথে বিনিময় করা হয়, দ্বিতীয় জিনিসটা প্রথম জিনিসটার মূল্য গঠন করে"। এ থেকে এই অর্থই বেরিয়ে আসে যে, প্রথম জিনিসটার (চেয়ার) মূল্য দ্বিতীয় জিনিসটার (কম্বল) মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর অর্থ হলো : কোন একটা জিনিসের মূল্যের ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ওই জিনিসের মূল্য অন্য জিনিসের রূপে প্রকাশিত হয়।

একটা জিনিসের মূল্য তখনই দৃশ্যমান হয়, যখন জিনিসটাকে অন্য জিনিসের সাথে বিনিময় করা হয়। জিনিসটার মূল্য দৃশ্যমান হয় না, যদি জিনিসটা বিনিময়ের মধ্যে প্রবেশ না করে। তখন মূল্যও কোন রূপ পরিগ্রহ করে না। এখন আমরা মূল্যের রূপের কয়েকটা আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্যকে কিছুটা বিশদ ভাবে দেখব। আমরা 'চেয়ার' এবং 'কম্বল' এই দুটো জিনিসকে বাদ দিয়ে '২০ মিটার কাপড়' এবং '১টা কোট' এই দুটো জিনিসকে নিয়ে আলোচনাকে এগিয়ে নেব। মার্কসও মূল্যের রূপ নিয়ে আলোচনায় '২০ মিটার কাপড়' এবং '১টা কোট' উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমরা এখানে '২০ মিটার কাপড়'-কে একটা 'পণ্য' হিসেবে ধরতে পারি। ধরে নিলাম কাপড়ের মালিক তার কাপড়কে ১টা কোটের সাথে বিনিময় করল। অর্থাৎ, এখানে এই বিনিময়ে ২টা পণ্য (জিনিস) জড়িত হলো, 'কাপড়' এবং 'কোট'। এখানে তাদের মধ্যে একটা বিনিময় সংঘটিত হয়েছে। 'কাপড়ের মালিক' কোটটা পেয়েছে এবং 'কোটের মালিক' কাপড়টা পেয়েছে। যখন কাপড়ের মালিক কোটটা নিয়েছে, সে কি এটা বিনামূল্যে নিয়েছে? একই ভাবে কোটের মালিকও কাপড়টা বিনামূল্যে নিতে পেরেছে? না, কাপড়ের মালিক বা কোটের মালিক কেউই

দ্বিতীয় জিনিসটা বিনামূল্যে নিতে পারেনি। উভয়ে একটা জিনিস দিয়েছে এবং ওই জিনিসটার সূত্রে অন্য জিনিসটা নিয়েছে। যখন কাপড়ের মালিক তার কাপড়টা দিয়েছে, তার পরিবর্তে সে একটা কোট নিয়েছে এবং কোটের মালিক যখন তার কোটটা দিয়েছে, তার পরিবর্তে সে কাপড়টা নিয়েছে। কেউই অন্যের জিনিসটা বিনামূল্যে পাইনি।

এই বিনিময়ে যেকোন পক্ষকে যদি আমরা দেখি, আমরা দেখতে পাই এক পক্ষ যে জিনিসটা পেয়েছে, ওই জিনিসটাকে সে তার ইতিমধ্যে দেওয়া জিনিসটার মূল্য হিসেবে বিবেচনা করছে। কাপড়ের মালিক যখন কোটের দিকে তাকায়, সে ভাবে "এটাই হচ্ছে আমার দেওয়া কাপড়ের ফল"। এটার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার কাপড়ের মূল্যকে দেখছে। কাপড়ের মূল্য যা বিনিময়ের আগে প্রকাশিত হয়নি, বিনিময়ের পরে এখন সেটা প্রকাশিত হলো। কোটের ক্ষেত্রেও একই কথা। যখন কোটের মালিক তার কোটটা দিয়ে কাপড়টা নেয়, এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার কোটের মূল্যটা নিচ্ছে এবং কাপড়কে তার কোটের মূল্য হিসেবে ধরে নিচ্ছে।

কাপড় এবং কোটের বিনিময়ের ক্ষেত্রে যা ঘটে :

কাপড়ের মূল্য	=	কোট
কাপড়ের মূল্য রূপ	=	কোটের রূপে বা আকারে (কাপড়ের মূল্য কার্যকর হচ্ছে কোটের মধ্য দিয়ে বা রূপে)
কোটের মূল্য	=	কাপড়
কোটের মূল্য রূপ	=	কাপড়ের রূপে বা আকারে (কোটের মূল্য কার্যকর হচ্ছে কাপড়ের মধ্য দিয়ে বা রূপে)

এখন আমরা ২০ মিটার কাপড় এবং ১টা কোটকে বিনিময় প্রক্রিয়ার একটা জোড় হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনাকে এগিয়ে নেব এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। একমাত্র এই বিষয়গুলোকে আত্মস্থ করেই আমাদের পক্ষে ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্য রূপকে প্রকৃত অর্থে বোঝাটা সম্ভব হবে।

১. ২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট।

এর অর্থ হলো, এখানে নির্দিষ্ট মাপের কিছু কাপড় এবং একটা কোটের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়েছে। ঘটনা হলো এই যে, ২টা পণ্যের মধ্যে একটা বিনিময় সংঘটিত হয়েছে যা এটাই প্রকাশ করে : ২০ মিটার কাপড়ের যা মূল্য, কোটেরও মূল্য তাই। যদি উভয়ের মূল্য সমান না হতো তবে বিনিময় সংঘটিত হতো না। এর অর্থ হলো দুটো পণ্যেরই মূল্য সমান। তবে ২টা পণ্যের মূল্য রূপ কিন্তু এক নয়। কোটের মালিক তার কোটের ব্যবহার-মূল্য পরিত্যাগ করেছে এবং কাপড়ের ব্যবহার-মূল্য গ্রহণ করেছে। যখন কোট হচ্ছে কাপড়ের মূল্য, একই সাথে কাপড়

হয়ে যাচ্ছে কোটের মূল্য। এই রূপে, যদিও এখানে দুটো পণ্য হচ্ছে সমান মূল্যের, তাদের মূল্য রূপ হয়ে যাচ্ছে ভিন্ন। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ভিন্ন মূল্য রূপ।

২. ২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট।

এটা প্রকাশ করে যে 'কাপড় এবং কোট সমান'। এই সমতুল্যতা তাদের ভৌত গুণাবলির সাথে সম্পর্কিত নয়। এটা তাদের মূল্যের সাথে সম্পর্কিত। এই দুটো পণ্য মূল্যের বিচারে সমান। এই সম্পর্কটা হলো মূল্য সম্পর্ক। সেহেতু যখন আমরা বলি ২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট, এটা এই অর্থ করে যে ২০ মিটার কাপড়ের মূল্য = ১টা কোট। কথাটা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় : ২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট, এর অর্থ এই নয় যে কাপড় এবং কোট সমান এবং তাদের ভৌত গুণাবলিও সমান।

৩. ২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট।

এর অর্থ হলো কাপড়কে ইতিমধ্যে কোটের সাথে বিনিময় করা হয়েছে। যদি কাপড় কোটের সাথে বিনিময় করা হয়, এটার অর্থ হয় কোটও কাপড়ের সাথে বিনিময় করা হয়েছে। এটার আরও অর্থ দাঁড়ায় কোট যদি কাপড়ের মূল্য হয়, কাপড়ও হবে কোটের মূল্য। এতক্ষণ এখানে আমরা কেবলমাত্র কাপড়ের মূল্য হিসেব করেছি এই সূত্র দিয়ে "কাপড় = কোট"। আমরা এখানে একই ভাবে কোটের মূল্য দৃশ্যমান দেখি না। আমরা এখানে একই সূত্র ব্যবহার করে কোটের মূল্য দেখি নাই। যাহোক, আমরা কোটের মূল্য দেখতে পাই, যখন আমরা এভাবে বলি 'কোট = কাপড়'। এর অর্থ দাঁড়ায়, কোটের মূল্য = কাপড়! এই দ্বিতীয় সূত্রে আমরা শুধুমাত্র কোটের মূল্য দেখি তবে কাপড়ের মূল্য নয়।

যখন আমরা বলি 'কাপড় = কোট', কাপড়ের মূল্য 'সরাসরি' প্রকাশিত হয় আর একই সাথে কোটের মূল্য 'অপ্রত্যক্ষ' ভাবে প্রকাশিত হয়। যখন আমরা বলি 'কোট = কাপড়', তখনও একই যুক্তিধারার ভিত্তিতে ঘটনা ঘটে, আর তখন কোটের মূল্য কাপড় রূপে সরাসরি প্রকাশিত হয় ।

৪. যখন ২টা জিনিসের মধ্যে বিনিময়ের ঘটনা ঘটে, একজন ব্যক্তি একটা জিনিস দিয়ে অন্যের আর একটা জিনিস নিয়ে থাকে।

যদি কোট এবং কাপড়ের মধ্যে বিনিময় ঘটে, কোটটা গৃহীত হয় কাপড়ের মূল্য হিসেবে একই সাথে কাপড় গৃহীত হয় কোটের মূল্য হিসেবে। অর্থাৎ, এখানে একটা জিনিস অবস্থান করছে অন্য একটা জিনিসের মূল্য হিসেবে।

এভাবে বলাটাই সঠিক :

কাপড়ের মূল্য = কোট (অথবা অন্য কোন জিনিস)

এভাবে বলাটা সঠিক নয় :

কাপড়ের মূল্য = কাপড়ের মূল্য

যদি আমরা বলি 'কাপড়ের মূল্য = কোটের মূল্য', আমাদের প্রথমে জানতে হবে কোটের মূল্য কত, অর্থাৎ কাপড়ের মূল্য জানার প্রয়োজনেই আমাদের প্রথমে জানতে হবে কোটের মূল্য কত। আমরা যদি কোটের মূল্য কত সেটা জানতে চাই, এটা হবে তো আর একটা জিনিসের মূল্য। সেই জিনিসের মূল্য হবে আবার আর একটা জিনিসের মূল্য। এভাবে সমস্ত প্রক্রিয়াটা চলতে থাকবে, শেষ না হয়ে । আমরা প্রক্রিয়াটাকে এভাবে দেখতে পারি :

২০ মিটার কাপড়ের মূল্য কত?

কাপড়ের মূল্য তো আর কিছু নয় কিন্তু কোটের মূল্য।
তখন কোটের মূল্য কত হবে?
কোটের মূল্য আর কিছু নয় কিন্তু কম্বলের মূল্য।
তখন কম্বলের মূল্য কত হবে?
কম্বলের মূল্য আর কিছু নয় কিন্তু চেয়ারের মূল্য।
.....?
.....?

এভাবে চললে এই প্রশ্নের কোন শেষ হবে না।

কোন জিনিসের মূল্য কখনও এভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। এভাবে মূল্যকে বুঝতে যাওয়াটা সম্পূর্ণ ভুল একটা পথ। সেহেতু, 'কাপড়ের মূল্য = কোটের মূল্য' এভাবে না বলে, আমরা যদি বলি 'কাপড়ের মূল্য = কোট' (অথবা অন্য যেকোন জিনিস), আমরা তখন একটা জিনিসের মূল্য দেখতে পাই, এক্ষেত্রে কাপড়ের মূল্য। সমস্যাটাকে এভাবে উত্তর দিয়ে সমাধা করা সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে, একটা জিনিসের মূল্য হয় অন্য একটা জিনিস রূপে এবং অন্য আর একটা জিনিসের মূল্য হিসেবে নয়।

৫. 'কাপড়ের মূল্য হলো কোট (অথবা অন্য কোন জিনিস)' – এটা সম্ভব। 'কাপড়ের মূল্য = কাপড়' – এটা কি সম্ভব? না, কারণ কাপড়কে কাপড়ের সাথে বিনিময় করা যায় না। কোন জিনিস একই ধরনের জিনিসের সাথে বিনিময় করা হয় না। এটা অন্য ধরনের কোন জিনিসের সাথে বিনিময় করতে হবে। সেহেতু, কোন জিনিসের মূল্য একই ধরনের জিনিস রূপে প্রকাশিত হয় না, হয় ভিন্ন ধরনের কোন জিনিস আকারে বা রূপে।

৬. যদি কাপড়ের মূল্য কোট আকারে প্রকাশিত হয়, এর অর্থ হয়, কাপড়ের মূল্য পৃথক হলো এবং কাপড় থেকে বেরিয়ে আসল। কিন্তু, কাপড়ের ব্যবহার-মূল্য কাপড় থেকে ছিন্ন হলো না। কোন জিনিসের ওজন, আকার এবং রঙ হলো ওই জিনিসের প্রাকৃতিক গুণাবলি, যা জিনিসের ভৌত গুণাবলি গঠন করে, এবং এগুলো জিনিস থেকে ছিন্ন হতে পারে না। এগুলো জিনিসের অখণ্ড সত্তা। কিন্তু, মূল্য

জিনিসের প্রাকৃতিক ভৌত গুণাবলি নয়, এটা জিনিসের বাইরে প্রকাশ পেতে পারে। 'লোকটা তার কাপড়টা দিয়ে দিল' – এটা বলার অর্থ হয়, লোকটা ওই কাপড়ের ব্যবহার-মূল্য পরিত্যাগ করল। 'সে কাপড়টা দিল এবং কোটটা নিল' – এটা বলার অর্থ হয়, লোকটা তার কাপড়ের ব্যবহার মূল্য পরিত্যাগ করে কোটের ব্যবহার-মূল্য গ্রহণ করল। এর অর্থ হলো এই : কাপড়ের মূল্য = কোটের ব্যবহার-মূল্য। কোটের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। 'কোটের মূল্য কাপড় রূপে রয়েছে' কথাটার অর্থ হলো : কোটের মূল্য চলে গেল এবং কোট থেকে ছিন্ন হলো। তবে কোটের ব্যবহার মূল্য কোটের সাথেই থাকবে। কোট মালিককে অবশ্যই কোটের ব্যবহার-মূল্য পরিত্যাগ করতে হবে এবং কাপড়ের ব্যবহার-মূল্য গ্রহণ করতে হবে।

৭. মূল্য' প্রাকৃতিক রূপ ধারন করতে পারে না। সেহেতু, মূল্য নিজেই প্রকাশিত হতে চাইলে, তাকে প্রাকৃতিক রূপে আছে এমন জিনিসের উপর ভর করতে হবে।

মূর্ত জিনিসকে বিমূর্ত জিনিসের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে হলে, একমাত্র পথ হলো মূর্ত জিনিসের রূপ ধারন করা এবং তার মাধ্যমে আবির্ভূত হওয়া। 'মূল্য'-কেও দৃশ্যমান রূপে আসতে হলে একই ঘটনা। 'কাপড়ের মূল্য কোট হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে' কথাটার অর্থ হলো কাপড়ের মূল্য যার নিজস্ব কোন রূপ নেই, তা কোর্ট রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। কাপড়ের মূল্য, যা একটা বিমূর্ত শ্রম, 'সেলাই'-এর মতো একটা মূর্ত শ্রমের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, যে শ্রমটা কোটের মধ্যে রয়েছে। একটা জিনিসের মূল্য অন্য একটা জিনিসের বস্তুগত রূপ হিসেবে প্রকাশিত হয়।

৮. যদি কোটের সাথে কাপড়ের বিনিময় ঘটে :
কাপড়ের মূল্য হলো : কোট
যদি চেয়ারের সাথে কাপড়ের বিনিময় ঘটে :
কাপড়ের মূল্য হলো : চেয়ার
যদি এক জোড়া জুতার সাথে কাপড়ের বিনিময় ঘটে :
কাপড়ের মূল্য হলো : এক জোড়া জুতা
যদি অন্য কোন জিনিসের সাথে কাপড়ের বিনিময় ঘটে :
কাপড়ের মূল্য হলো : উল্লেখিত জিনিসটা
ওই জিনিসটার রূপ হলো : কাপড়ের মূল্য রূপ
যেকোন জিনিসের ক্ষেক্ষত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

একটা জিনিসের মূল্য নির্ভর করে বিনিময় সম্পর্কের উপর, একটা জিনিস অন্য জিনিসের সাথে যে বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে। সেহেতু, একটা জিনিসের মূল্য রূপ সর্বদাই একটা আপেক্ষিক রূপ (কারণ রূপটাকে একটা

জিনিসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে হচ্ছে, যে জিনিককে নির্ভর করতে হচ্ছে অন্য জিনিসের সাথে তার সম্পর্কের ওপর)।

'মূল্য' কথাটার পুরো নাম হলো 'বিনিময় মূল্য'। 'মূল্য রূপ' কথাটার অর্থ হলো 'বিনিময় মূল্য রূপ'। যেহেতু, এই রূপটাকে দ্বিতীয় জিনিসটার উপর নির্ভরশীল বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, এর পুরো নাম হবে 'বিনিময় মূল্যের আপেক্ষিক রূপ'। তবে সংক্ষেপে আমরা একে মূল্য রূপ বলি।

৯. যখন আমরা বলি 'কাপড় = কোট', এখানে কাপড় এবং কোট একই ধরনের অবস্থানে থাকে না। তারা একই ভূমিকা পালন করে না। কাপড় এমন একটা জিনিসের ভূমিকা পালন করে, যে জিনিস তার মূল্য এভাবে দেখায় :'আমার মূল্য হলো ....'। কিন্তু কোট তার মূল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এভাবে দেখায় না : 'আমার মূল্য হলো ....', এর পরিবর্তে কাপড়ের মূল্য হিসেবে ভূমিকা রেখে সে বলে 'আমি হচ্ছি কাপড়ের মূল্য ....'। একই ভাবে, যখন আমরা বলি 'কোট = কাপড়', তখন দুটো জিনিসের ভূমিকা পাল্টে যায়। এখন কোট যখন তার মূল্য প্রকাশের অবস্থানে রয়েছে, কাপড় একই সময়ে দাঁড়িয়ে আছে 'কোটের মূল্য'-এর অবস্থানে। এটার অর্থ হলো : যখন আমরা বলি 'কাপড় = কোট' অথবা 'কোট = কাপড়', এখানে 'কাপড় এবং কোট'-এর অবস্থান দুই ক্ষেত্রে একই থাকছে না, ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমরা একটা রুটি ওজন করতে চাই। আমরা হাতে ধরে এর একটা ওজন অনুমান করতে পারি, সেটা হবে কিছু কম বা কিছু বেশি। কিন্তু, আমরা যদি এর সঠিক ওজন জানতে চাই, রুটিটাকে ওজন মাপার দাড়িপাল্লায় রাখতে হবে। আমরা ধরে নিলাম, পাল্লার একদিকে রয়েছে রুটিটা এবং অন্যদিকে রয়েছে আধা কেজি বাটকারা। এখানে কোন্ জিনিসটার ওজন নির্দেশিত হচ্ছে? রুটি না-কি বাটকারার? উত্তর হবে রুটি, বাটকারা নয়।

রুটি এবং বাটকারার মধ্যকার সম্পর্ক হলো 'ওজনের সম্পর্ক'। এখানে রুটি রয়েছে ওজন কত সেটা নির্ধারিত হওয়ার অবস্থানে। এটাই হলো 'আপেক্ষিক' অবস্থান। রুটিটা এখানে রয়েছে এই আপেক্ষিক অবস্থানে, যা বাটকারার সাথে সম্পর্কের সূত্রে নিজের ওজন বলতে পারছে।

বাটকারা তার নিজের ওজন বলতে পারে না। সে নিজের চরিত্রগত গুণে রুটির ওজনটা বলে দিতে পারে। রুটির ওজনের অবস্থানে বাটকারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা হলো 'সমতুল্য' অবস্থান। এখানে দুটো জিনিস 'ওজনের সম্পর্ক' সূত্রে যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকে ভিন্ন ভূমিকা পালন করছে।

একই ভাবে আমরা যদি একটা 'রশি' এবং 'মিটার স্কেল' নিই, এই দুটো জিনিস 'দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক' এই সূত্রে পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে। এখানে বিষয়টা এমন দাঁড়াবে :

রশি থাকবে – আপেক্ষিক অবস্থানে
মিটার স্কেল থাকবে – সমতুল্য অবস্থানে

একই ভাবে, আমরা যদি দুটো জিনিসের 'মূল্য সম্পর্ক' বিবেচনা করি, তাহলে দেখবো :

একটা জিনিস থাকবে – আপেক্ষিক অবস্থানে
অন্য জিনিসটা থাকবে – সমতুল্য অবস্থানে

২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট
↑ ↑
আপেক্ষিক অবস্থান সমতুল্য অবস্থান

১টা কোট = ২০ মিটার কাপড়
↑ ↑
আপেক্ষিক অবস্থান সমতুল্য অবস্থান

এতক্ষণ আমরা নির্দিষ্ট জিনিসের মূল্য রূপ নিয়ে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করেছি। যখন একটা জিনিসের সাথে অন্য একটা জিনিসের বিনিময় ঘটে, দ্বিতীয় জিনিসটা প্রথম জিনিসটার মূল্যকে প্রকাশ করে। দ্বিতীয় জিনিসটার মূল্য রূপ নিজেই প্রথম জিনিসটার মূল্য রূপ। এভাবে আমরা 'মূল্য রূপ' কথাটার অর্থ কী, তা জানলাম। কিন্তু, 'মূল্যের পরিমাণ' বিষয়টা কী, সেটা জানতে এখন আমরা আলোচনাকে এগিয়ে নেব।

২. মূল্যের 'পরিমাণ' ('Quantity' of Value')

'মূল্য' মানে 'আকার'। যেহেতু কিছু জিনিস 'মূল্য' ধারন করে ভূমিকা রাখছে, ওই জিনিসটার যে আকারই থাক না কেন, সেই আকারটা হবে মূল্যের পরিমাণ। যদি ১০ কিলো শস্যের সাথে ১টা চেয়ারের বিনিময় ঘটে, ওই শস্য নিজেই 'চেয়ারের মূল্য' গঠন করবে। ওই শস্যের পরিমাণ এখানে ১০ কিলো, এটাই মূল্যের পরিমাণ। ওই শস্যের রূপটাই এখানে মূল্যের রূপ হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। যদি এই চেয়ারটা ৮ কিলো শস্যের সাথে বিনিময় করা হয়, এটার অর্থ হবে এখানে চেয়ারের মূল্যের রূপ এবং পরিমাণ দুটোই একই সাথে পাল্টে যাচ্ছে।

ধরে নিলাম, একটা নির্দিষ্ট ধরনের চেয়ার দিয়ে আমরা ১০ কিলো শস্য পেলাম। যখনই ওই ধরনের শস্য বিনিময় করা হয়, এটার অর্থ হয় কি ওই পণ্যগুলোর অনুপাত একই থেকে যাবে? না, যখনই ওই চেয়ারের উৎপাদনশীলতা পরিবর্তিত হয়ে যায় বা শস্যের উৎপাদনশীলতা পরিবর্তিত হয়ে যায়, ওই

পণ্যগুলোর বিনিময়ের অনুপাতেরও পরিবর্তন ঘটে। ওই অনুপাতগুলো নানা ভাবে গঠিত হতে পারে।

১. ধরা যাক, শস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে চেয়ারের উৎপাদনশীলতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে '১ কিলো শস্য'-এর মোট শ্রম কমে যায়, কিন্তু ১টা চেয়ারের মোট শ্রমের, মোটের ওপর, কোন পরিবর্তন ঘটে না। এর অর্থ হলো শস্যের মূল্য কমে গেল, কিন্তু চেয়ারের মূল্যের, মোটের উপর, কোন পরিবর্তন ঘটল না। সেহেতু, এখন আমরা ১টা চেয়ারের পরিবর্তে ১০ কিলোর বেশি শস্য পাব।

২. ধরে নিলাম, শস্যের উৎপাদনশীলতা কমে গেল, কিন্তু চেয়ারের উৎপাদনশীলতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এক্ষেত্রে আমরা ১টা চেয়ারের জন্য ১০ কিলোর কম শস্য পাব।

৩. ধরে নিলাম, চেয়ারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু শস্যের উৎপাদনশীলতা মোটের উপর একই রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা ১টা চেয়ারের বিনিময়ে ১০ কিলোর কম শস্য পাব, কারণ এখানে চেয়ারের মোট শ্রম কমে গেছে। একই ভাবে আমরা ধরে নিলাম, চেয়ারের উৎপাদনশীলতা কমে গেছে, কিন্তু শস্যের উৎপাদনশীলতা মোটের উপর একই রয়েছে। এক্ষেত্রে ১টা চেয়ারের পরিবর্তে ১০ কিলোর বেশি শস্য আমরা পাব, কারণ এখানে চেয়ারের মোট শ্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. ধরা যাক, চেয়ার এবং শস্য উভয়ের উৎপাদনশীলতা একই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন এই দুটা পণ্যের শ্রম একই অনুপাতে কমে যাবে। এর অর্থ হলো : উভয় পণ্যের শ্রমের পরিমাণ একে অপরের সাথে সমান। যাহোক, ঘটনা হলো এই যে, পণ্য দুটোর উৎপাদনশীলতা এবং মূল্য পরিবর্তিত হলেও, তা পণ্য দুটোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে না। এর কারণ হলো এই যে, "১টা চেয়ার = ১০ কিলো শস্য" পণ্য দুটোর এই অনুপাত পূর্বের মতো একই থেকে যাচ্ছে, মূল্যের পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও। এখন আমরা যদি চেয়ারকে অন্য কোন পণ্যের (চেয়ার নয়) সাথে বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে আনি, যার উৎপাদনশীলতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি, তাহলে আমরা চেয়ারের মূল্যের পরিবর্তন দেখতে পাব। আমরা ধরে নিলাম, চেয়ারের মূল্যের পরিবর্তন ঘটেছে, এখন আমরা যদি এই চেয়ারকে অন্য একটা পণ্যের সাথে বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করি, যে পণ্যের মূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, চেয়ারের পরিবর্তে যে পরিমাণ পণ্য আমরা পাব তা অবশ্যই পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তখন আমরা জানতে পারব চেয়ারের মূল্য পাল্টে যাবে কি না এবং যদি পাল্টে যায়, তাহলে সেটা কত। শস্যের ক্ষেত্রেও একই কথা।

৫. ধরে নিলাম, সমাজে সকল পণ্যের উৎপাদনশীলতা সমতালে বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন চেয়ারের মূল্যের পরিমাণ কত হবে? এটার মোটের উপর কোন পরিবর্তন ঘটবে না। তখনও আমরা ১টা চেয়ারের জন্য ১০ কিলো শস্য পাব। এমন অবস্থায় প্রশ্ন হলো চেয়ারের মোট শ্রম পাল্টে যাবে কি না, আর এটা অগ্রসর হবে চেয়ারের উৎপাদনশীলতার মধ্য দিয়ে। এর উত্তর জানা যাবে চেয়ারটা তৈরির জন্য পূর্বেকার এবং এখনকার প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাণের পার্থক্যের মধ্যে।

এসব উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে যখন আমরা একটা পণ্যকে বিনিময়ের মধ্যে আনি, প্রথম পণ্যের পরিবর্তে পাওয়া দ্বিতীয় পণ্যের পরিমাণ সব সময় একই থাকবে না। বিনিময়ের সাথে যুক্ত দুটো পণ্যের যেকোন একটা পণ্যের শ্রম সময় যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে প্রথম পণ্যের পরিবর্তে পাওয়া দ্বিতীয় পণ্যের পরিমাণ হয় বাড়বে অথবা কমবে।

বাস্তবতা হলো এই যে, বিনিময়ের সাথে যুক্ত পণ্যগুলোকে আমরা নির্দিষ্ট একটা পরিমাণে পাই, যা নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা। যখন আমরা বলি '১টা চেয়ার' এবং '১০ কিলো শস্য'-এর মধ্যে বিনিময় ঘটেছে, প্রকৃতই যেটা ঘটে তাহলো – চেয়ারটা হয় একটা নির্দিষ্ট আকারের এবং শস্য হয় ১০ কিলো ওজনের যা নির্ভর করে ওই পণ্যগুলোর মূল্যের ওপর। দুটো পণ্যের পরিমাপ একে অপরের সাথে মিলে যায় কারণ হলো ১টা চেয়ার এবং ১০ কিলো শস্য উভয় পণ্যের মধ্যে থাকে একই পরিমাণ মূল্য। এই পরিমাপগুলো তবুও আকাস্মিক অনুপাতেরই হয় এবং এমন কোন নিয়ম নেই যাতে করে এই পরিমাপগুলো সর্বদাই একই থাকবে। তাদের পরিমাপগুলো পাল্টে যাবে এমনকি একটা পণ্যের মূল্য পাল্টে গেলে। এতক্ষণ আলোচিত কথার সারমর্ম এই যে, যখন পণ্যগুলোর মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হয়, একমাত্র তাদের মূল্য অনুসারে ওসব পণ্যের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে।

অধ্যায় চার

মূল্যের 'প্রাথমিক' রূপ
(`Elementary' form of Value)

বলশেভিকরা আড়াই বছর তো দূরের কথা, আড়াই মাসও ক্ষমতায় থাকতে পারতো না, যদি পার্টিতে কঠোরতম প্রকৃত লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা বজায় না থাকত। ... শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিতে শৃঙ্খলা কেমন করে বজায় রাখা হয়? কীভাবে তার যাচাই চলে? কোন উপায়ে তাকে জোরদার করা হয়? প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশের শ্রেণীসচেতনা, বিপ্লবী নিষ্ঠা, তাদের অধ্যবসায়, আত্মত্যাগ ও বীরত্ব দিয়ে। দ্বিতীয়ত, শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপকতম অংশের সঙ্গেই শুধু নয়, অ-শ্রমিক মেহনতী মানুষের সঙ্গেও কতটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তারা রাখতে সমর্থ হন; শুধু যোগাযোগ নয়, খানিকটা বলা চলে, কতটা তাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন, তার ওপর। তৃতীয়ত, নির্ভর করে অগ্রণী অংশের রাজনীতিক নেতৃত্ব, কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের নির্ভুলতার ওপর, যাতে করে ব্যাপক জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্থির নিশ্চিয় হবে যে এগুলো নির্ভুল। ... দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নির্ভুল বিপ্লবী তত্ত্ব এদের সৃষ্টি কার্য সহজ করে তোলে, এমন তত্ত্ব যেটা আবার অন্ধ বিশ্বাস নয়, যে তত্ত্ব প্রকৃত গণ-আন্দোলন বা খাঁটি বিপ্লবী আন্দোলনের বাস্তব কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেই চূড়ান্ত আকার গ্রহণ করে থাকে।

–ভ. ই. লেনিন, *'বামপন্থী' কমিউনিজম – শিশুসুলভ রোগ*, (প্রথম প্রকাশ ১৯২০) জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৭০, পৃ. ৫-৬।

সেই প্রাচীন কালে মানব সমাজে তখনও জিনিসের বিনিময় শুরু হয়নি তাই জিনিসেরও তখন কোন 'মূল্য' ছিল না। মূল্য দিয়ে কোন জিনিস নেওয়ার বিষয়টাও তখন মানুষের ভাবনায় আসেনি।

আদিম কৌমিক সমাজে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করত, একটা কোমের বা গোত্রের সদস্যরা যেসব জিনিস আহরণ করত, সেগুলো তারা সকলে মিলে ব্যবহার করত, তাই ওসব জিনিসের কেবলমাত্র ব্যবহার-মূল্য ছিল, বলা যায়। যেসব জিনিস তারা তৈরি করত সেসবই তাদের তখনকার অতি সরল প্রকৃতির সাধারণ চাহিদাগুলো পূরণ করত, আর এসব নিয়েই গঠিত হয়েছিল তাদের সেই আদিকালের জীবনের প্রয়োজনগুলো। খাদ্য ও বাসস্থান ছাড়া, বলতে গেলে, তাদের কোন চাহিদা ছিল না। অন্যান্য অভাব সম্পর্কে মানুষ তখনও জানতে পারেনি। এভাবে কয়েক হাজার বছর চলে গেছে, বিনিময় তখনও সমাজে শুরু হয়নি। এক গোত্রের মানুষ তখন অন্য গোত্রের মানুষকে বা তাদের বসবাসের এলাকাকে জানতে পারেনি। তাই অন্য গোত্রের মানুষের তৈরি অন্য ধরনের জিনিস সম্পর্কে এই

গোত্রের মানুষ জানতে পারেনি, অন্য এলাকার জিনিসের সাথে এই এলাকার জিনিসের বিনিময়ও ঘটেনি।

ইতিমধ্যে কয়েক হাজার বছর চলে গেছে, সমাজ বিকাশের কোন এক স্তরে জিনিসের বিনিময়ের ঘটনা ঘটতে শুরু করল। যখন মানুষ বিনিময়ের প্রয়োজন বোধ করেছে, তখনই এটা শুরু হয়েছে বলা যায়। এক গোত্রের মানুষ তাদের জিনিস অন্য গোত্রের মানুষকে দিয়েছে এবং ওই গোত্রের মানুষের তৈরি অন্য ধরনের জিনিস তার পরিবর্তে নিয়েছে। এর অর্থ হলো, যে মুহূর্তে এটা ঘটল তখনই শুরু হলো 'জিনিসের বিনিময়'-এর অন্তহীন যাত্রা। আর 'বিনিময় মূল্য' সেই মুহূর্ত থেকে পেয়ে গেল তার অস্তিত্ব। এভাবে বিনিময় শুরু হলে, তখন পর্যন্ত যেসব জিনিস নিতান্তই কেবলমাত্র ব্যবহার-মূল্য নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তারা পেতে শুরু করল 'বহিঃস্থ বৈশিষ্ট্য' হিসেবে 'মূল্য'। জিনিসের এই মূল্য গঠন বা অর্জন হলো মানব ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা, আর এরই অনুসন্ধান হলো অর্থনীতি বিজ্ঞানের মূলকথা, মার্কস তার *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে পণ্যের চরিত্র বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করে অর্থশাস্ত্রকে এক ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। 'বিনিময়'-এর সাথে যুক্ত উভয় জিনিসই যেহেতু মানুষের শ্রম দিয়ে তৈরি (অন্যথা হলে মোটের উপর বিনিময়ই ঘটত না), বিনিময় শুরুর এই ঘটনা এটাই প্রকাশ করে যে 'শ্রম' (যা জিনিস তৈরিতে লেগেছে) 'মূল্য'-এ (ওই সব জিনিসের) রূপান্তরিত হওয়া শুরু হল। তখন পর্যন্ত যেসব জিনিস 'মূল্য' অর্জন-ছাড়া রয়ে গেছিল, তারা মূল্য অর্জন করে জিনিস (পণ্য) হতে শুরু করল।

এটার অর্থ এই নয় যে বিনিময় শুরুর সময় থেকে মানুষ 'শ্রম' এবং 'মূল্যের পরিমাপ' সম্পর্কে জানত। মানুষ জিনিসের বিনিময় শুরু করেছিল কেবলমাত্র তাদের অভাব পূরণের জন্য। শুরুতে মূল্যের পরিমাপ সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণাই ছিল না। তারা কেবলমাত্র জানতো দিতে। এর মানে এই নয় যে, বিনিময় শুরুর সেই নির্দিষ্ট দিন থেকে মানুষ শ্রম এবং 'মূল্যের পরিমাপ' সম্পর্কে জানতো। মানুষ অন্যদের সাথে বিনিময় শুরু করেছে সেসব জিনিস দিয়ে যা অন্যদের প্রয়োজন হতো এবং সেসব জিনিস নিয়ে যা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে লাগতো। যেসব জিনিস দেওয়া হচ্ছে এবং যেসব জিনিস নেওয়া হচ্ছে, এই উভয় জিনিসের 'মূল্য'-র মধ্যে 'মানানসই' হওয়ার কোন প্রশ্ন সেকালে ওঠেনি। 'মূল্য' সম্পর্কে কোন ধারণা মানুষের মাথায় একটা সুদীর্ঘকাল ধরে আসেনি। সেহেতু, আমরা ধারণা করতে পারি, বিনিময় শুরুর সেই সময়ে অধিক শ্রম দিয়ে তৈরি জিনিসের সাথে অল্প শ্রম দিয়ে তৈরি জিনিসের বিনিময় ঘটতো। এর অর্থ হলো সেই সময় 'মূল্যের সমতা' এই নীতির ভিত্তিতে বিনিময়ের ঘটনা ঘটতো না, ঘটতো সুযোগ এবং অযৌক্তিক ভাবে।

বিনিময় শুরুর জন্য, কিসের ভিত্তিতে বিনিময়টা ঘটবে তা জানার প্রয়োজন তখন হয়নি। যদি একটা জিনিস দেওয়া হতো এবং অন্য একটা জিনিস নেওয়া হতো, সেটা হতো নিতান্তই একটা সাধারণ বিনিময়ের সমতুল্য। এমনকি যে ব্যক্তি এই বিনিময়ের সাথে যুক্ত থাকতো, সে জানতো না মূল্যটা কী। বিনিময় শুরুর অর্থ হলো মূল্যের শুরু।

যদিও বিনিময় শুরুর সেই প্রারম্ভিক পর্যায়ে, কোন্ জিনিসটার সাথে কোন্ জিনিসটা সমতুল্য এটা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি, সময়ের সাথে ধীরে ধীরে মানুষ জিনিস তৈরি করার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা জানতে পেরেছে, কোন জিনিসটা তৈরি করা সহজ এবং কোন জিনিসটা তৈরি করা কষ্টকর; এর ভিত্তিতে মানুষ কোন্ জিনিসের সাথে কোন্ জিনিস বিনিময় করা যেতে পারে সেটা জেনেছে। একটা সমাজে যেসব পণ্য তৈরি হচ্ছে তার সাথে সম্পর্কিত 'মূল্যের জ্ঞান', ওই সমাজের সদস্যরা কেবলমাত্র তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই জানতে পেরেছে। এই জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষ বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ের অনুপাত কাছাকাছিই নির্ধারণ করতে পেরেছিল।

মানুষ 'মূল্য' সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে, কথাটা এটাই তুলে ধরে না যে, 'মূল্য অর্থ একমাত্র শ্রম; একটা জিনিসে ব্যয়িত মোট শ্রমই গঠন করে জিনিসটার মূল্য' – এই যুক্তিধারা মানুষ তখন পর্যন্ত জানতে পারেনি, ঘটনার নিজস্ব ধারা থেকেই মানুষ এটা সময়ের সাথে জানতে পেরেছে। যদিও মানুষ মূল্য সম্পর্কে জানতো না, তবে জিনিস মূল্যের মতো একটা কিছু এই চেতনা মানুষ পেল যখন বিনিময় শুরু করলো। সময়ের সাথে সাথে মানুষের এটা জানা হয়ে যাচ্ছিল যে, মাটির পাত্রটা কম মূল্যের, কাঠের গুঁড়ি তার চেয়ে একটু বেশি মূল্যের এবং শস্যের মূল্য তার চেয়েও বেশি। এভাবে কোন একজনের পক্ষে জিনিসটা কম মূল্যের নাকি বেশি মূল্যের এটা জানা হয়ে গেল।

'এই জিনিসটা কম মূল্যের আর ওই জিনিসটা বেশি মূল্যের' – যদি এটাই হয়ে থাকে মানুষের চিন্তার যুক্তিধারা, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় মানুষ জিনিসটার শ্রম সম্পর্কে কথা বলছে, কিন্তু শ্রম সংক্রান্ত সমগ্র বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন না হয়ে। মানুষের 'মূল্য সংক্রান্ত চেতনা' কয়েক হাজার বছর ধরে একটা অস্বচ্ছ অবস্থায় ছিল এমন কি বিনিময় শুরুর পরেও।

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, যখন একটা পণ্যের সাথে অন্য একটা পণ্যের বিনিময় ঘটে, দ্বিতীয় পণ্যটা প্রথম পণ্যের মূল্য রূপ হিসেবে প্রকাশিত হয়। জিনিসের মূল্য রূপ, যা ধীরে ধীরে মানুষের ধারণায় এভাবে এসেছে, এই ধারণাই এক পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে 'অর্থ' রূপ এই ধারণায়। এখন পর্যন্ত আমরা 'অর্থ' শব্দটা ব্যবহার করি না। আমরা জানি জীবন বিবর্তনের কয়েকটা স্তর অতিক্রম করে

শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি জন্ম নেয়, তেমনি ভাবে পণ্যের মূল্য রূপ কয়েকটা স্তর অতিক্রম করে আজকের পর্যায়ে এসে অর্থ রূপ হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এটার অর্থ হলো পণ্যের মূল্য এমন ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে এসে সেটা 'অর্থ রূপ' হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। তারপর থেকে 'অর্থ রূপ' নিজেই 'মূল্য রূপ' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেহেতু, 'অর্থ' বলতে প্রকৃতই কী বুঝায়, তা জানতে আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মূল্য রূপের বিবর্তনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। এখন থেকে আমরা জানতে চাইবো কীভাবে মূল্য রূপ বিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে 'অর্থ' হিসেবে রূপান্তরিত হলো।

আমরা ধরে নিলাম, বিনিময়ের সেই শুরুর পর্যায়ে দুটো পণ্য একটা 'বিনিময় জোড়' গঠন করেছে।

ধনুক = গরুর চামড়া – একটা বিনিময় জোড়
পাত্র = জুতা জোড়া – একটা বিনিময় জোড়

এখানে একটা বিনিময় জোড়ে যুক্ত জিনিসগুলো কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যেই বিনিময়ে যেতে পারে। এর অর্থ হলো, এক জোড়ে যুক্ত পণ্যগুলোর কোনটাই অন্য জোড়ে যুক্ত কোন পণ্যের সাথে বিনিময় করা যাবে না। এখানে ধনুক ও গরুর চামড়া 'একটা জোড়' গঠন করেছে, তাই ধনুককে কেবলমাত্র গরুর চামড়ার সাথে বিনিময় করা সম্ভব, কিন্তু অন্য জোড়ের পাত্র বা জুতা জোড়া কোনটার সাথে বিনিময় করা সম্ভব হবে না। তদ্রূপ, গরুর চামড়া কেবলমাত্র ধনুকের সাথে বিনিময় করা সম্ভব, তবে অন্য জোড়ের পাত্র বা জুতা জোড়ার সাথে বা অন্য জোড়ের কোন জিনিসের সাথে বিনিময় করা সম্ভব নয়। ধরে নিলাম, সেই আদিকালের সমাজে সর্বমোট ১০০ ধরনের জিনিস রয়েছে। এটার অর্থ হলো, জিনিসগুলো ৫০টা বিনিময় জোড় গঠন করতে পারবে। এক জোড়ের কোন জিনিস বাকি অন্য জোড়ের কোন জিনিসের সাথে বিনিময় করা যাবে না। আমরা ধরে নিতে পারি, বিনিময় শুরুর সেই আদিকালে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল।

তখনকার সময়ে অবস্থাটা এমনই ছিল, যে ব্যক্তির ধনুক রয়েছে সে ধনুকটা দিয়ে গরুর চামড়াই কেবলমাত্র নিতে পারতো। যাহোক তার পক্ষে এভাবে গরুর চামড়া ছাড়া অন্য কোন জিনিস পাওয়া সম্ভব ছিল না। যদি তার পাত্র বা এক জোড়া জুতার দরকার হতো, সে তার ধনুকটা দিয়ে সরাসরি অন্য জোড়গুলোর কোন জিনিসই পেত না। কারণ ধনুকের সাথে গরুর চামড়ারই একমাত্র বিনিময় সম্পর্ক রয়েছে অন্য কোন জিনিসের নয়।

যদি কোন ব্যক্তির এক জোড়া জুতার প্রয়োজন হতো, তাকে সেটা তৈরি করতে হতো এবং এটা দিয়ে সে আর এক জোড়া অন্য মাপের জুতা পেয়ে যেত।

ওই ব্যক্তির পক্ষে তার কাছে যা (জুতা নয়) রয়েছে, সেটা দিয়ে জুতা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

যখন একটা পণ্যের বিনিময়ে অন্য একটা নির্দিষ্ট পণ্যই (জোড়ের বাইরের নয়) কেবলমাত্র পাওয়া সম্ভব হতো, মূল্যের এই রূপই হলো 'মূল্যের প্রাথমিক রূপ'। এটা মূল্যের প্রথম রূপও বটে। এটা হচ্ছে মূল্যের সেই রূপ, বিনিময় শুরুর পর্যায়ে যার অস্তিত্ব ছিল, যার মধ্যে মূল্য নতুন ভাবে জন্ম নিচ্ছিল।

১. মূল্যের প্রাথমিক রূপের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটা বিষয়
(Some points relating to the elementary form of value)

১. আমরা 'পাত্র = এক জোড়া জুতা', একে একটা 'বিনিময় জোড়' হিসেবে ধরে নিতে পারি। তাদের (এক জোড়ের) বিনিময় রহিত হয়ে যায় যখন তাদের মধ্যে একবার বিনিময় সংঘটিত হয়। কোন ব্যক্তি অন্যকে পাত্রটা দিয়ে দিল এবং জুতা জোড়াটা তার কাছ থেকে নিয়ে নিজের জন্য ব্যবহার করতে লাগল। এই জুতা জোড়াটা দিয়ে তার পক্ষে অন্য কোন কিছু পাওয়া সম্ভব হয় না, করণ জুতা জোড়া পাত্র ছাড়া অন্য কোন জিনিসের সাথে বিনিময়যোগ্য নয়। যদি সে এটা বিনিময় করতে চায়, তাকে এটা অন্য কাউকে দিয়ে পাত্রটা পেতে হবে। সেহেতু, কোন বিনিময় জোড়ে যুক্ত পণ্যের বিনিময় জীবন শেষ হয়ে যায়, বিনিময়টা একবার সংঘটিত হলে। এরপর তারা ব্যবহার-মূল্য হিসেবে থেকে যায়।

২. যে পর্যায়ে একটা পণ্য কেবলমাত্র অন্য একটা নিদিষ্ট পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায়, প্রতিটা পণ্যের থাকবে একমাত্র একটাই সমতুল্যতা। 'পাত্র = এক জোড়া জুতা' এই বিনিময় জোড়ে পাত্রের একমাত্র সমতুল্যতা রয়েছে জুতা জোড়ার সাথে। একই ভাবে, এক জোড়া জুতার সাথে সমতুল্যতা রয়েছে পাত্রের। এর অর্থ হলো : পাত্রের মূল্য দেখা যায় কেবলমাত্র জুতা জোড়ার রূপে এবং তদ্রূপ জুতা জোড়ার মূল্য দেখা যায় একমাত্র পাত্র রূপে।

পাত্রের মূল্য – একমাত্র জুতা জোড়া
জুতার মূল্য – একমাত্র পাত্র

অন্য বিনিময় জোড়ে যুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে।

যদি মূল্যকে একটা রূপেই কেবলমাত্র দেখা যায়, সেই রূপটাই হবে 'মূল্যের প্রাথমিক রূপ'। এর অর্থ হলো যখন বিনিময় এই প্রকৃতির রূপে থাকে, মূল্য রূপ তখন প্রথম স্তরে রয়েছে। এমন কোন প্রশ্ন আসতে পারে না : "ওই পণ্যটা কী, যা প্রাথমিক স্তরের এই মূল্য রূপ অধিকার করে আছে?" যেকোন পণ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা। যেকোন পণ্য কেবলমাত্র একটা পণ্যের সাথেই বিনিময় করতে হবে। যেকোন পণ্যের মাত্র একটাই সমতুল্যতা থাকবে। যেকোন পণ্যের একমাত্র একটাই

মূল্য রূপ থাকবে। সেহেতু, এর অর্থ দাঁড়ায় যেকোন পণ্যের মূল্য রূপ রয়েছে প্রথম স্তরে।

যখন সমাজে বিনিময়ই শুরু হয়নি, সেই সময় 'মূল্য' সংক্রান্ত কোন ধারণা সমাজে উপস্থিত ছিল না। পরবর্তী কোন এক সময়ে সমাজে প্রতি জোড়ে যুক্ত ২টা পণ্যের মধ্যে বিনিময় শুরু হলো, মূল্য এবং মূল্য রূপ বাস্তব হতে শুরু করল। যেকোন বিনিময় জোড়ে যুক্ত একটা পণ্যের মূল্য হলো একমাত্র দ্বিতীয় জিনিসটা। এভাবে প্রাথমিক স্তরের মূল্য রূপ হলো 'শিশু স্তর'-এর মূল্য রূপ।

মায়ের জঠর থেকে এইমাত্র যে শিশু জন্ম নিল সেও একজন মানুষ। কিন্তু, ওই শিশু মানুষ হলেও এমন মানুষ, যে রয়েছে মানুষের 'শিশু স্তরে'। এই শিশুকে বেড়ে ওঠে বড় হয়ে সম্পূর্ণ মানুষের শারীরিক গঠন পেতে হয়।

তদ্রূপ, মূল্যের প্রাথমিক রূপ যে রয়েছে শিশু অবস্থায়, তাকে বিকশিত হয়ে সম্পূর্ণ রূপ পেতে হয়।

৩. যখন আমরা বলি 'পাত্র = এক জোড়া জুতা', এটার অর্থ হলো, পাত্রের মূল্য এক জোড়া জুতার রূপে রয়েছে এবং জুতা জোড়ার মূল্য পাত্রের আকারে বা রূপে রয়েছে। এর অর্থ হলো, এই প্রাথমিক স্তরে, একটা পণ্যের মূল্য রূপ ঠিক অন্য পণ্যের মূল্য রূপের মতো একই নয়। প্রত্যেকটা পণ্যের রয়েছে তার নিজস্ব এবং ভিন্ন মূল্য রূপ।

৪. যখন মূল্য রূপ রয়েছে প্রাথমিক স্তরে, এক জোড় পণ্যই মাত্র অর্জন করে 'গুণগত সমতুল্যতা' এবং 'পরিমাণগত সমানুপাতিক' রূপ।

২. গুণগত সমতুল্যতা (Qualitative Equality)

ধরা যাক, সমাজে ১০০ প্রকারের জিনিস রয়েছে এবং এগুলো ৫০টা বিনিময় জোড় গঠন করেছে। এই অবস্থায়, এক জোড়ের সাথে যুক্ত শুধুমাত্র ২টা জিনিসের থাকবে বিনিময় সম্পর্ক (মূল্য সম্পর্ক) এবং এই ২টা জিনিসের সাথে অন্য ৯৮টা জিনিসের কোন বিনিময় সম্পর্ক থাকবে না। যেহেতু এই দুটো জিনিস একে অপরের সাথে বিনিময় হতে পারে, এখন এটাই প্রমাণিত হবে যে মাটির পাত্র-তৈরি কাজ এবং জুতা-তৈরি কাজ 'মূল্য' অর্জনের অধিকার পাবে। এই দুই ধরনের কাজের থাকবে একটা 'সমতুল বৈশিষ্ট্য' – এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয়। এখানে সমতুল বৈশিষ্ট্য'র অর্থ হলো 'মূল্য' হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য। এটা হলো ওই শ্রম দুটোর একমাত্র 'গুণগত সমতুল্যতা'। গুণের বিচারে 'সমান'। এখানে 'গুণ' অর্থ 'মূল্য হয়ে ওঠা'। ঘটনা হলো পাত্র-তৈরি শ্রম এবং জুতা-তৈরি শ্রম সমান এটা প্রমাণিত হয় একমাত্র তখনই যখন পাত্র এবং জুতা, যা ওই শ্রম দুটো দিয়ে তৈরি হয়েছে, পরস্পরের সাথে বিনিময় করা যায়। যদি ওই দুটো জিনিস পরস্পরের সাথে বিনিময় করা না

যেত, তখন ওই শ্রম দুটো সমান এটা প্রমাণিত হয় না। মানুষ যদি ভাবে "পাত্র দিয়ে জুতা নেওয়া সম্ভব এবং এর বিপরীতটাও সম্ভব", এবং "এই দুটো জিনিস সমান", তখন তারা জিনিসগুলোর 'মূল্য' দেখতে পেল, এমনটা বলা যায়। এটার অর্থ হলো মানুষ দুটো শ্রমকে সমান হিসেবে ভেবে নিচ্ছে এ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন না হয়ে।

যেহেতু, একটা বিনিময় জোড়ের ২টা জিনিসের সাথে অন্য ৯৮টা জিনিস বিনিময় করা যায় না, পরিস্থিতিটা তখনও এমন থেকে যায়, ওই জোড়ের শ্রম দুটো সমান হিসেবে বিবেচিত হলেও অন্য সকল শ্রম সমান, এই অবস্থাটা তখনও উপস্থিত হয় না। অর্থাৎ "সকল শ্রম সমান" এটা প্রমাণিত হয় না।

ঘটনা হলো তখনকার সমাজে বিদ্যমান ১০০টা পণ্য শ্রম দিয়েই তৈরি হচ্ছে। এই শ্রমগুলো একটা গুণ অর্জন করেছে, সেটা হলো 'শ্রম'। প্রত্যেকটা পণ্য অন্যান্য পণ্যের মতো এটা ঠিক। প্রত্যেকটা পণ্য মূল্যের বিচারে সমান, যেহেতু তারা ইতিমধ্যে মূল্য এই গুণটা অর্জন করেছে। তবুও, যেহেতু সকলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হতে পারছে না, ঘটনা হলো এই যে, "সকল শ্রম সমান" নিজ থেকেই এটা প্রকাশিত হচ্ছে না। এর অর্থ হলো 'শ্রমের সমতুল্যতা' এখনও সমাজে হাজির হয়নি।

৩. পরিমাণগত সমানুপাতিক রূপ (Quantitative Proportionality)

২টা পণ্য যখন বিনিময় করা হয়, ওই ২টা পণ্যের 'পরিমাপ' করার প্রয়োজন হয়। ধরে নিলাম কাপড় এবং শস্যের মধ্যে একটা বিনিময় সংঘটিত হয়েছে। কত পরিমাণ কাপড় এবং কত ওজনের শস্যের মধ্যে? বিনিময়টা কি ১ মিটার পরিমাণ কাপড়ের সাথে ২ কিলো অথবা ৩ কিলো পরিমাণ শস্যের মধ্যে ঘটেছে? 'কত পরিমাণ' শস্য এখানে প্রয়োজন? তদ্রূপ, আমরা যদি শস্যের দিক থেকে দেখি, ১ কিলো শস্যের জন্য কত পরিমাণ কাপড় লাগবে? ১ মিটার অথবা ২ মিটার কাপড় লাগবে কি? কত পরিমাণ কাপড় লাগবে? সেহেতু, কাপড় এবং শস্যের মধ্যে যদি একটা বিনিময় সংঘটিত হয়, কাপড় এবং শস্যের 'পরিমাণ' কত সেটা জানতে হবে। এটাই হচ্ছে একটা বিনিময়ে যুক্ত পণ্যগুলোর 'পরিমাণগত সমানুপাতিক' রূপ। এর অর্থ হলো : পণ্যগুলোর পরিমাণের একটা নির্দিষ্ট বিশেষ অনুপাত থাকবে।

সমাজের এমন এক স্তরে, যেখানে একটা পণ্যের সাথে কেবলমাত্র অন্য একটা পণ্যের বিনিময় করা সম্ভব হয়, পরিমাণগত অনুপাত ওই বিনিময়ে যুক্ত দুটো পণ্যেরই থাকবে, অবশিষ্ট ৯৮টা পণ্যের জন্য এটা থাকবে না। কারণ এই পণ্য দুটো

অন্য ৯৮টা পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায় না। এর অর্থ হলো, যখন দুটা পণ্য একটা বিনিময় জোড় গঠন করে, তখন 'গুণগত সমতুল্যতা' এবং 'পরিমাণগত সমানুপাত' কেবলমাত্র ওই ২টা পণ্যের জন্য গঠিত হয়।

৪. মূল্যের 'প্রাথমিক' রূপের সীমাবদ্ধতা
(Limitation of 'elementary' from of value)

পাত্র = ১ জোড়া জুতা – এটা হলো একটা বিনিময় জোড়। আমরা পাত্রটা দিতে পারি এবং জুতা জোড়াটা নিতে পারি। একই ভাবে, আমরা জুতা জোড়াটা দিতে পারি এবং পাত্রটা নিতে পারি। এটাই যথেষ্ট। এখানে ওই দুটো পণ্যের মধ্যেই একমাত্র বিনিময় সম্পর্ক রয়েছে।

সমাজে বিদ্যমান এমন পরিস্থিতিতে, আমরা যদি পাত্রটা দিয়ে শস্য নিতে চাই? অথবা আমরা যদি গুড় নিতে চাই? এটা সম্ভব হয় না। কারণ পাত্রের সাথে অন্য কোন পণ্যের বিনিময় সম্পর্ক নেই, একমাত্র জুতা ব্যতীত।

জুতার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। জুতার মাধ্যমে পাত্র ছাড়া অন্য কোন পণ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

এর অর্থ দাঁড়ায়, এমন অবস্থায় যেখানে একটা পণ্যের বিনিময়ে কেবলমাত্র অন্য একটাই পণ্য পাওয়া যায়, এখানে আমরা যে পণ্যটা চাইবো তা পাওয়া সম্ভব হয় না। এটাই হলো 'প্রাথমিক মূল্য রূপ'-এর সীমাবদ্ধতা। সেই আদিকালের সমাজের এটাই ছিল সীমাবদ্ধতা। এখানে আমরা জানার চেষ্টা করবো সমাজের পরবর্তী স্তরগুলোতে কীভাবে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে।

অধ্যায় পাঁচ

মূল্যের 'সম্প্রসারিত' রূপ
(Expanded form of Value)

> কোন রাজনৈতিক পার্টি কতখানি একনিষ্ঠ এবং নিজ শ্রেণী আর মেহনতি জনগণের কাছে নিজের দায়িত্ব সে কতখানি পালন করে তা বিচার করার নিশ্চিত আর মূল্যবান উপায়ের অন্যতম হলো নিজের ভুল সম্বন্ধে পার্টির মনোভাব। অকপটে ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করা, তার কারণ খুঁজে বের করা, কোন অবস্থায় এই ভুল হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা এবং সংশোধন করার উপায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা—এই সবই হলো দায়িত্বশীল রাজনৈতিক পার্টির লক্ষ্য : এই ভাবেই তার কর্তব্য পালন করা উচিত, এভাবেই তার উচিত প্রথমে নিজ শ্রেণীকে, তারপরে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা।
>
> –ভ. ই. লেনিন, *'বামপন্থী' কমিউনিজম—শিশুসুলভ রোগ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৭০, পৃ. ৪৪।

মূল্যের প্রাথমিক রূপ'-এর মধ্যে আমরা কেবলমাত্র দুটো পণ্যের মধ্যকার বিনিময় সম্পর্কটা কী, সেটা দেখেছি। এটা হচ্ছে এমন একটা বিনিময় সম্পর্ক, যেখানে একটা পণ্যকে কেবলমাত্র অন্য একটাই পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়। আমরা এখন দেখবো এমন একটা বিনিময় সম্পর্ক, যেখানে একটা পণ্যের সাথে অনেকগুলো পণ্যের বিনিময় সম্ভব হয়। যদি ২০ মিটার কাপড়ের সাথে শুধুমাত্র ১টা কোটের নয় কয়েকটা পণ্যের বিনিময় সংঘটিত হয়, তাহলে কী ঘটে?

১. ২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট
২. ২০ মিটার কাপড় = ৮ জোড়া জুতা
৩. ২০ মিটার কাপড় = ১০টা কলম
৪. ২০ মিটার কাপড় = ২৫ কেজি শস্য
৫. ২০ মিটার কাপড় = ২ গ্রাম সোনা

যদি বিনিময় সম্পর্ক এমন হয়, তাহলে এর অর্থ হয় কী? এর অর্থ হবে, ২০ মিটার কাপড় কেবলমাত্র ১টা কোটের সাথে বিনিময় করা যায় না; জুতা, কলম, শস্য এবং সোনার সাথেও বিনিময় করা যায়। অর্থাৎ, ২০ মিটার কাপড়ের মূল্য কেবলমাত্র ১টা কোটের রূপে প্রকাশিত হয় না; ৮ জোড়া জুতা, ১০টা কলম, ২৫ কেজি শস্য এবং ২ গ্রাম সোনার রূপেও প্রকাশিত হয়। যার অর্থ হয় : কাপড়ের বিনিময় যে যে পণ্যের সাথে সংঘটিত হলো, ওগুলোর যে-কোনটার রূপে। আমাদের উদাহরণকে সরল করার স্বার্থে, ধরে নিলাম, কাপড়ের বিনিময় সম্পর্ক রয়েছে ৫ ধরনের পণ্যের সাথে। এর অর্থ হলো সমাজের ওই স্তরে কাপড়কে, এগুলোর (৫ ধরনের পণ্য) মধ্যে একমাত্র কাপড় ব্যতীত অন্য সকল পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায়।

ধরা যাক, সমাজের ওই স্তরে সব মিলিয়ে মোট ১০০ ধরনের পণ্য রয়েছে, কাপড়কে এখন অবশিষ্ট ৯৯ ধরনের পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায়। এখন কাপড় ৯৯ ধরনের সমতুল্যতা অর্জন করল। অর্থাৎ, এখানে কাপড়ের ৯৯ ধরনের মূল্য রূপ রয়েছে। কাপড়ের মূল্য রূপ এখন বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হবে। কাপড় এখন যে পণ্যের সাথে বিনিময় করা হবে, সেই পণ্যের মূল্য রূপ নিয়ে প্রকাশিত হবে।

সমাজে যারা কাপড় তৈরি করছে, তাদের যে কেউ কোটের সাথে তার কাপড়ের বিনিময় করতে পারে, অন্য একজন তার শস্য, তৃতীয় আরেক জন তার গুড় এবং চতুর্থ একজন তার জুতা বিনিময় করতে পারে। এভাবে কাপড়কে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায়।

এটা কেবলমাত্র কাপড়ের ক্ষেত্রে ঘটে তা নয়, সমাজে উৎপাদিত হচ্ছে এমন সকল পণ্যের ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটে। প্রতি একটা পণ্য অবশিষ্ট ৯৯ ধরনের পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায়। প্রত্যেকটা পণ্যের থাকে ৯৯টা সমতুল্যতা। অর্থাৎ ৯৯ ধরনের মূল্য রূপ।

সুতরাং, কী ধরনের পরিবর্তন এখন সমাজে এই স্তরে ঘটছে? এটাই এখন আমাদের দেখা দরকার। পূর্বে যেখানে একটা পণ্যের সাথে কেবলমাত্র একটা পণ্যেরই বিনিময় ঘটা সম্ভব হচ্ছিল, এখন আর সেই সীমাবদ্ধতা আর থাকছে না; একটা পণ্য এখন অনেকগুলো পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থৎ, যেকোন পণ্য এখন যেকোন পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে।

এখন যেকোন পণ্যের মূল্য রূপ কেবলমাত্র একটা রূপেই প্রকাশিত হচ্ছে না, বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এটার অর্থ দাঁড়ায় মূল্য রূপ এখন সম্প্রসারিত হলো। এটা হলো সম্প্রসারিত মূল্য রূপ, মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ।

১. মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের কয়েকটা দিক
(Some points concerning expanded form of value)

১. সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের রূপান্তর ঘটছে, সমাজের আগের স্তরে একটা পণ্যের সাথে কেবলমাত্র একটা পণ্যেরই বিনিময় সংঘটিত হতে পারছিল, সমাজের পরবর্তী অগ্রসর এই স্তরে যেকোন পণ্যের সাথে যেকোন পণ্যের বিনিময় সংঘটিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে (১০০টা পণ্যের মধ্যে), যা বিনিময় জগতের একটা অগ্রবর্তী 'বিকাশ'। তবে সমাজের এই রূপান্তর ধীরে ধীরেই ঘটে। ধরা যাক, পাত্র প্রথমে একবারই একমাত্র শস্যের সাথে বিনিময় করা হচ্ছিল, কিন্তু এখন এই পাত্র কাপড়ের সাথেও বিনিময় করা যাচ্ছে, আর এই অগ্রগতিটা ঘটে ধীরে ধীরেই। তখন থেকে পাত্র দিয়ে একজনের পক্ষে কাপড় এবং শস্য নেওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ, এখন পাত্রের '২টা সমতুল্যতা' অর্জিত হলো। এমন অবস্থাই কিছু কাল ধরে চলতে থাকে,

পরে ধীরে ধীরে এমন অবস্থা আসে যখন পাত্র দিয়ে জুতাও পাওয়া সম্ভব হয়। তখন থেকে পাত্রের '৩টা সমতুল্যতা' অর্জিত হলো। এভাবে সমাজের বিবর্তন ধারায় এমন একটা পরিস্থিতি আসে যখন একটা পণ্য ধীরে ধীরে ২টা ভিন্ন ধরনের পণ্য, ৩টা ভিন্ন ধরনের পণ্য এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে যেকোন ভিন্ন ধরনের পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায়। এখন সামাজিক অবস্থা যেখানে "দুটা পণ্যই একটা বিনিময় জোড় গঠন করতে পারছিল" সেটা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ধরা যাক, সমাজে ধীরে ধীরে নিজ থেকেই এমন একটা অবস্থা এসে গেল যেখানে একটা পণ্যকে যেকোন পণ্যের সাথে বিনিময় করা যাচ্ছে। 'মূল্যের প্রাথমিক রূপ' নিজ থেকেই 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'-এ বিকশিত হলো।

২. 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ' কীভাবে 'মূল্যের প্রাথমিক রূপ' অপেক্ষা অধিক বিকশিত? অথবা, কথাটা আমরা একটু ভিন্ন ভাবে বলতে পারি : "কীভাবে 'একটা পণ্যের সাথে কেবলমাত্র একটা পণ্যের বিনিময়' অপেক্ষা 'একটা পণ্যের সাথে যেকোন পণ্যের বিনিময়' অধিক বিকশিত"? প্রশ্নটা নিজেই উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছে। যে অবস্থায় পাত্রগুলো কেবলমাত্র শস্যের সাথেই বিনিময় করা যায়, সেখানে আমরা পাত্র দিয়ে একমাত্র শস্যই পেতে সক্ষম হচ্ছি, আমরা শস্য ব্যতীত অন্য কোন জিনিস নিতে পারছি না। এর পরিবর্তে, যে অবস্থায় পাত্র দিয়ে যেকোন জিনিস পাওয়া সম্ভব, সেটা অবশ্যই অধিকতর বিকশিত। সেহেতু, 'মূল্যের প্রাথমিক রূপ'-এর চেয়ে 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ' অধিকতর বিকশিত ।

৩. আমরা 'মূল্যের প্রাথমিক রূপ'-এর সীমাবদ্ধতা কী, সেটা জানলাম। সীমাবদ্ধতাটা হলো : এখানে একটা পণ্যকে কেবলমাত্র অন্য একটা পণ্যের সাথেই বিনিময় করা যায়, একটা ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয় না। এই সীমাবদ্ধতা 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'-এ অতিক্রম করা সম্ভব হয়। একটা পণ্য যেকোন পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে, এই সম্ভাব্যতা দিয়ে পূর্বের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা যাচ্ছে। যদিও, মূল্যের প্রাথমিক রূপের সীমাবদ্ধতা মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছে, এর অর্থ এটা নয় যে সমাজ থেকে মূল্যের প্রাথমিক রূপ সম্পূর্ণ উঠে গেল। 'মূল্যের প্রাথমিক রূপ'-এর 'একটা ইতিবাচক' দিক আছে, যা 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'-এ বজায় থাকে। এই বৈশিষ্ট্যটা হলো : যখন কোন বিনিময় সংঘটিত হয়, এটা '২টা পণ্যের মধ্যকার সম্পর্ক' হিসেবেই একমাত্র প্রকাশিত হয়। এটা হলো বিনিময়ের একটা প্রয়োজনীয় এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটা মূল্যের সম্প্রসারিত রূপেও উপস্থিত থাকে। একটা পণ্যকে যে-কোন পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব, কিন্তু প্রত্যেকটা বিনিময়ের ঘটনা '২টা পণ্যের মধ্যকার সম্পর্ক' হিসেবেই একমাত্র অস্তিত্বশীল হয়। আর এটা বিভিন্ন পণ্যের মধ্যকার সম্পর্ক হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারে না। এটা কীভাবে ঘটে সেটা আমরা দেখতে পারি : যে ব্যক্তি পাত্র তৈরি করছে সে পাত্রটা দিয়ে শস্য ক্রয় করছে। কিন্তু এটা ব্যবহারের আগে তার দরকার হলো কাপড়ের, তখন সে শস্য দিয়ে কাপড়

ক্রয় করবে। এর অর্থ হলো : এখানে শস্যের দুইবার বিনিময় ঘটলো। প্রথমে পাত্রের সাথে, দ্বিতীয়বার কাপড়ের সাথে। যেহেতু কোন পণ্যের জন্য দুইবার বিনিময় ঘটার সুযোগ রয়েছে, শস্যকে দুইবার দুই ধরনের পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে। যদিও শস্যের এই দুই বিনিময় এক সময়ে ঘটছে না। শস্যকে প্রথমে একটা পণ্যের সাথে বিনিময় করা হচ্ছে, অন্য আরেকটা পণ্যের সাথে এর পরেই একমাত্র বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে। যদি ওই শস্যকে, ব্যবহার-মূল্য হিসেবে কাজে লাগানো ব্যতীত, ৪ বার ৪ ধরনের পণ্যের সাথে বিনিময় করা হতো, তখনও ওই বিনিময়গুলো একের পর এক ঘটতো। এর অর্থ হলো : একটা পণ্যকে যেকোন সংখ্যক পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায়, কিন্তু ওই সকল বিনিময়ের ঘটনা একই সাথে ঘটে না। একটা পণ্যকে সকল পণ্যের সাথে একই সাথে বিনিময় করা যায় না। প্রতিটা বিনিময় একমাত্র দুইটা পণ্যের মধ্যকার বিনিময় হিসেবে কার্যকর হয়। মূল্যের প্রাথমিক রূপের এই বৈশিষ্ট্যটা, যা মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে উপস্থিত থাকে, তা অন্য কোথা থেকে এসে নতুন ভাবে উপস্থিত হয়নি। মূল্যের প্রাথমিক রূপ ঘাটতি থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে বিকশিত হয়েছে। সেহেতু এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মূল্য রূপ বিকশিত হয়ে সম্প্রসারিত স্তরে পৌঁছালেও তখনও প্রাথমিক স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো বিলীন হয়ে যায় না।

৪. আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, 'মূল্যের প্রাথমিক রূপ'-এ একটা পণ্যের কেবলমাত্র একটাই 'সমতুল্যতা' থাকে এবং 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'-এ একটা পণ্যের কয়েকটা 'সমতুল্যতা' থাকে। এভাবে বিষয়টা দেখানো যায় :

মূল্যের প্রাথমিক রূপে :

২০ মিটার কাপড়	=	১টা কোট
↑		↑
আপেক্ষিক অবস্থান		সমতুল্য অবস্থান

এখানে যেহেতু কাপড়ের মাত্র একটাই সমতুল্যতা রয়েছে, কাপড়ের মূল্যের মাত্র একটা রূপই থাকছে।

মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে :

২০ মিটার কাপড়	=	১টা কোট
	=	৮ জোড়া জুতা
	=	১০টা কলম
	=	২৫ কেজি শস্য
	=	২ কেজি সোনা
↑		↑
আপেক্ষিক অবস্থান		সমতুল্য অবস্থান

এখানে কাপড়ের রয়েছে কয়েকটা সমতুল্যতা। এখন কাপড় তার মূল্যকে মাত্র একটা রূপেই প্রকাশ করছে না, বরং যেকোন পণ্যের রূপেই নিজের মূল্য কাপড় প্রকাশ করতে পারছে। অর্থাৎ, এখন কাপড়ের মূল্য সম্প্রসারিত হয়ে বিভিন্ন পণ্যের রূপে দৃশ্যমান হয়েছে। সেহেতু সমতুল্যতার সকল রূপ, যা কাপড়ের সম্মুখে এখন দাঁড়িয়ে আছে, সেসবই গঠন করছে 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'।

৫. প্রাথমিক স্তরে প্রত্যেকটা পণ্যের থাকবে নিজস্ব পৃথক মূল্য রূপ। আমরা এখন দেখতে পারি, মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটা পণ্যের নিজস্ব পৃথক মূল্য রূপ বজায় রয়েছে কি না। আমরা ৩টা পণ্যকে ধরে নিলাম, যথা – ২০ মিটার কাপড়, ১টা কোট এবং ২ গ্রাম শস্য। আমরা এখানে এই পণ্যগুলোর প্রত্যেকের সমতুল্যতার চরিত্র কি সেটা দেখবো।

১. ২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট
= ২ গ্রাম সোনা
২. ১টা কোট = ২০ মিটার কাপড়
= ২ গ্রাম সোনা
৩. ২ গ্রাম সোনা = ২০ মিটার কাপড়
= ১টা কোট

এখানে একটা পণ্যের সমতুল্যতাগুলোর সাথে অন্য পণ্যের সমতুল্যতাগুলোর পার্থক্য.কী সেটা দেখতে হবে। একটা পণ্যের সমতুল্যতাগুলো এবং অন্য পণ্যের সমতুল্যতাগুলো একই থাকছে না।

কাপড়ের বিপরীতে যে সমতুল্যতাগুলো এখানে উল্লেখিত হয়েছে – সেখানে কাপড়ের উল্লেখ নাই; সেখানে রয়েছে কোট এবং সোনা।

কোটের বিপরীতে এখানে যে সমতুল্যতাগুলোর উল্লেখ রয়েছে – সেখানে কোটের উল্লেখ নাই; রয়েছে কাপড় এবং সোনা।

সোনার বিপরীতে এখানে যে সমতুল্যতাগুলোর উল্লেখ রয়েছে – সেখানে সোনার উল্লেখ নাই; রয়েছে কাপড় এবং কোট।

আমরা যদি ধরে নিই যে 'সমতুল্যতাগুলোর সমগ্রটা' গঠন করেছে 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ', তখন দেখতে পাচ্ছি একটা পণ্যের মূল্য রূপ এবং অন্য পণ্যের মূল্য রূপ একই রূপের নয়।

ধরা যাক, সমাজে ওই সময়কালে মোট ১০০ ধরনের পণ্য রয়েছে। ওই সকল পণ্যের মধ্যে যেকোন একটা পণ্যের সমতুল্যতাগুলো অন্য সকল পণ্য নিয়ে গঠিত হয় তবে ওই নির্দিষ্ট পণ্যটা ব্যতীত। সেহেতু একটা পণ্যের সমতুল্যতাগুলো অন্য পণ্যের সমতুল্যতাগুলোর মতো এক নয়। এর অর্থ হলো : একটা পণ্যের মূল্য রূপ

অন্য পণ্যের মূল্য রূপের মতো এক নয়। এটার আরও অর্থ হলো এই যে, সম্প্রসারিত স্তরেও প্রত্যেকটা পণ্যের রয়েছে নিজস্ব পৃথক মূল্য রূপ যেমনটা ছিল প্রাথমিক স্তরে।

৬. মূল্যের প্রাথমিক রূপের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, এখানে একটা পণ্যের সাথে অন্য একটাই পণ্যের একটা বিনিময় সম্পর্ক রয়েছে, দুইটা শ্রম একটা জোড়েই অবস্থান করে অর্জন করছে গুণগত সমতুল্যতা এবং ওই পণ্য দুটোর বস্তুগত সম্পদ অর্জন করছে পরিমাণগত সমানুপাত। তবে, মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের ক্ষেত্রে যেহেতু একটা পণ্যকে অন্য সকল পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায়, যে শ্রম দিয়ে ওই পণ্যটা তৈরি করা হয়েছে সেই শ্রমটা অর্জন করে গুণগত সমতুল্যতা এবং পরিমানগত সমানুপাত অন্য সকল শ্রমের সাথে।

যখন কাপড়ের সাথে একমাত্র কোটের বিনিময় ঘটে, বুনন শ্রম একমাত্র দর্জি শ্রমের সাথে সমতুল্যতা অর্জন করে।

মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের ক্ষেত্রে :

বুনন শ্রম	–	অন্য সকল শ্রমের সমান।
দর্জি শ্রম	–	অন্য সকল শ্রমের সমান।
কাঠমিস্ত্রি শ্রম	–	অন্য সকল শ্রমের সমান।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা শ্রম অন্য সকল শ্রমের সামন।

একটা শ্রমের অন্য সকল শ্রমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এটাই প্রকাশ করে ওই শ্রমের সাথে পণ্যের সমগ্র জগতটার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটা শ্রমই যেন এক একজন নাগরিক।

বুনন শ্রম	–	একজন নাগরিক
দর্জি শ্রম	–	একজন নাগরিক
খনন শ্রম	–	একজন নাগরিক

সমাজে একজন নাগরিকের অন্যান্য নাগরিকের মতো বসবাসের অধিকার রয়েছে, একটা শ্রমও এখন অন্যান্য শ্রমের মতো বাজারে থাকার অধিকার অর্জন করলো।

একটা শ্রম অন্যান্য শ্রমের সমান কথাটা বলার অর্থ হলো, সকল শ্রম একে অপরের সমান। যদিও বাস্তবতা হলো সমাজের এই স্তরে 'সকল শ্রম সমান' এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। পরের অধ্যায়ে 'মূল্যের সাধারণ রূপ' সম্পর্কে জানলে বিষয়টাকে প্রকৃত অর্থে আমরা পরিষ্কার ভাবে জানতে পারবো।

২. মূল্যের 'সম্প্রসারিত' রূপের সীমাবদ্ধতা
(Limitations of the 'expanded' form of value)

যখন মূল্যের রূপ ছিল প্রাথমিক স্তরে ছিল একটা পণ্যকে কেবলমাত্র একটাই পণ্যের সাথে বিনিময় করা হতো। এটাই ছিল মূল্যের প্রাথমিক রূপের সীমাবদ্ধতা। মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের আবির্ভাব ঘটলে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব হলো। যদিও এই স্তরেও কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে যায়, সেগুলো এখানে তুলে ধরা হলো :

১. মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে 'মূল্যের প্রকাশ' পরিপূর্ণ ভাবে ঘটে না। অর্থাৎ, এই স্তরে মূল্যের পরিপূর্ণ রূপকে দেখা সম্ভব হয় না। কী ঘটে এটা দেখতে আমরা ধরে নিলাম, সমাজে ১০০ ধরনের শ্রম বিদ্যমান রয়েছে। আমরা ধরে নিলাম, ওসব শ্রম দিয়ে তৈরি পণ্যের মধ্যে কাপড় একটা পণ্য। কাপড়ের রয়েছে ৯৯টা সমতুল্যতা। এর অর্থ হলো কাপড়ের মূল্যকে ৯৯টা রূপে দেখা যাবে। তাহলে এটা বলা কি সম্ভব "কাপড়ের মূল্য কেবলমাত্র এই ৯৯টা রূপেই প্রকাশিত হচ্ছে, অন্য কোন রূপে নয়"? যদি সমাজে তখন ১০০ ধরনের পণ্যই থেকে থাকে, তখন আমরা বলতে পারি শ্রমের মূল্য কেবলমাত্র ৯৯টা রূপেই দেখা সম্ভব হচ্ছে। আমরা ধরে নিলাম, একটা নতুন ধরনের পণ্য (নতুন ব্যবহার-মূল্য) বাজারে এসেছে, ইতিমধ্যে একটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। তখন কী ঘটবে? এখন কাপড়ের ১০০টা সমতুল্যতা উপস্থিত হবে। যার অর্থ হলো কাপড় আর একটা নতুন মূল্য রূপ অর্জন করলো। এভাবেই যখনই সমাজে নতুন ধরনের নানা পণ্যের আবির্ভাব ঘটবে, কাপড়ের মূল্য রূপ ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমরা বলতে পারি না এই হলো কাপড়ের মূল্য রূপের সমগ্রটার নির্দিষ্ট সীমা। কথাটা যদি আমরা এভাবে বলি, তাহলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে "কাপড়ের মূল্য রূপ কেবলমাত্র এই ১০০টার মধ্যে অস্তিত্বশীল রয়েছে, কেবলমাত্র এই ২০০টায় এবং অন্যকোন রূপে নয়"। যতক্ষণ আমরা বলতে পারছি না "এটাই হলো একমাত্র কাপড়ের মূল্য রূপ এবং এখানে অন্য কোন রূপ নাই"। এই স্তরে এমনটা আমরা বলতে পারি না যে কাপড়ের মূল্য রূপ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হলো। এমনটা এই সম্প্রসারিত স্তরে সম্ভব নয়। তাই পণ্যের মূল্যের প্রকাশ এই স্তরে 'অসম্পূর্ণ' থেকে যাচ্ছে। এটাই হলো মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের সীমাবদ্ধতা।

২. একটা পণ্যের সাথে অন্য সকল পণ্যের বিনিময় সম্পর্ক মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে দৃশ্যমান হয়। যাই হোক, বাস্তবতা হলো অন্যান্য পণ্যেরও যে এই প্রকৃতির সম্পর্ক কার্যকর রয়েছে, এটা এই স্তরে দৃশ্যমান হয় না। একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা ঘটনা কী ঘটে তা দেখতে পারি। আমরা ধরে নিলাম কাপড়ের বিপরীতে রয়েছে ২টা সমতুল্যতা (এই ২ সমতুল্যতাকে কয়েকটা সমতুলত্যা হিসেবে বিবেচনা করলাম)।

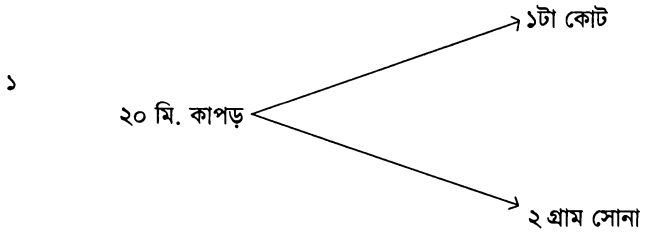
২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট
= ২ গ্রাম সোনা

এখানে কাপড় রয়েছে আপেক্ষিক অবস্থানে। কোট এবং সোনা রয়েছে কাপড়ের সমতুল হিসেবে। এখানে আমরা কাপড়ের মূল্য দেখতে পাই, কিন্তু কাপড়ের সমতুল জিনিসগুলোর মূল্য দেখতে পাই না (এখানে কোট ও সোনা)।

এই উদাহরণ থেকে আমরা কী দেখতে পেলাম? কাপড় কোটের সাথে নিজেই বিনিময়কৃত হচ্ছে। অর্থাৎ, ঘটনা হলো এই যে কাপড় এবং কোট উভয়ের মধ্যে একটা বিনিময় সম্পর্ক রয়েছে যা এখানে দৃশ্যমান। কাপড় নিজেই সোনার সাথে বিনিময়কৃত হচ্ছে। অর্থাৎ, কাপড় এবং সোনার মধ্যকার বিনিময় সম্পর্কটাও এখানে দৃশ্যমান।

ভাল কথা, এই উদাহরণ থেকে কোট এবং সোনার মধ্যকার বিনিময় সম্পর্ক এখানে কি দৃশ্যমান হচ্ছে? না, এটা এখানে দৃশ্য হচ্ছে না। কেন?

আমরা এভাবে সম্পর্কগুলোকে দেখতে পারি :



এখানে, কাপড় এবং কোটের মধ্যকার সম্পর্ক দৃশ্যমান; কাপড় এবং সোনার মধ্যকার সম্পর্কও দৃশ্যমান; কিন্তু, কোট এবং সোনার মধ্যকার সম্পর্কটা এখানে দৃশ্যমান হচ্ছে না।

ঘটনা হলো, কোট এবং সোনার মধ্যকার সম্পর্কের কথাটা বলার অর্থ হলো কোট এবং সোনার মধ্যেও এই ধরনের একটা সম্পর্ক এখানে আছে। যদিও সেটা দৃশ্যমান হচ্ছে না। কারণ হলো : আমরা এখানে কাপড়ের দিক থেকে এই সম্পর্কগুলোকে দেখছি, তাই ওই সম্পর্কগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকছে।

কাপড়ের সাথে কোটের সম্পর্কটা হলো – একটা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক
কাপড়ের সাথে সোনার সম্পর্কটা হলো – একটা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক

যেহেতু আমরা কাপড়ের সম্পর্কগুলোকে এখানে আলাদা আলাদা ভাবে দেখছি, তাই 'কোট এবং সোনার মধ্যেও যে সম্পর্ক আছে' – সেটা দৃশ্যমান হচ্ছে না। কিন্তু কীভাবে দেখলে এই সম্পর্কটাও দৃশ্যমান হবে? ঘটনাটাকে আমাদেরকে এভাবে দেখতে হবে :

'কাপড় এবং কোটের সম্পর্ক' আর 'কাপড় এবং সোনার সম্পর্ক' – এই দুই সম্পর্ককে এক বিন্দুতে মিলিত হতে হবে। সেটা কোথায়? কাপড় অভিমুখে। এটার অর্থ হলো : কাপড়ের দিক থেকে (একটা জিনিসের দিক থেকে দেখা) না দেখে, যদি আমরা কোট এবং সোনার দিক থেকে দেখি (বিভিন্ন জিনিসের দিক থেকে দেখা), তখন সকল জিনিসের সম্পর্ক উভয় দিক থেকে দৃশ্যমান হবে। কিন্তু আমরা যদি ওভাবে দেখি, সেটা 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ হবে না। আমরা একটু পরে সেটা জানতে পারব।

'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'-এর অর্থ হলো একটা জিনিসের সাথে সকল জিনিসের বিনিময়, কিন্তু সকল জিনিসের সাথে একটা জিনিসের বিনিময় নয়। সুতরাং, আমাদের এখানে কেবলমাত্র সেসব জিনিসই দেখতে হবে, যেগুলো 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'-এ এসে উপস্থিত হয়।

এখানে একটা জিনিস সকল জিনিসের সাথ বিনিময় করা হচ্ছে। অর্থাৎ, যা এখানে উপস্থিত হচ্ছে, সেটা হলো একটা শ্রম সকল ধরনের শ্রমের সমান। যদিও, ঘটনা হলো সকল শ্রম একটা শ্রমের সমান (সকল শ্রম সমান) এটা এখানে দৃশ্যমান হচ্ছে না।

যেহেতু, মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে সকল ধরনের পণ্যের মধ্যকার সম্পর্ক দৃশ্যমান হয় না, সকল ধরনের শ্রমের মধ্যকার সম্পর্কও এখানে দৃশ্যমান হয় না। এটার অর্থ হলো : "মূল্য হিসেবে বিদ্যমান আছে এই অর্থে সকল শ্রম সমান" – এটা এখানে দৃশ্যমান হয় না। এটাই হলো মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা। এই জটিল বিষয়টা মূল্যের সাধারণ রূপ, যা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৩. সমাজে যখন মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ বিদ্যমান থাকে, দৈনন্দিন জীবনে বিনিময় কীভাবে সংঘটিত হয়, আমরা এখন সেসব বোঝার চেষ্টা করবো। মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ একটা পণ্যের নিজের থেকেই অন্য যেকোন পণ্যের সাথে বিনিময় ঘটার সম্ভাব্যতাকে প্রকাশ করে। আমরা ধরে নিলাম একজন তাঁতির কাছ কিছু কাপড় আছে। সে ভুট্টা চায়। সে তার কাপড় নিয়ে ভুট্টার মালিকের কাছে গেল। ভুট্টার মালিক কাপড়টা নিতে চাইলে এখানে বিনিময়টা সংঘটিত হবে। কাপড়ের মালিক তখন কিছু ভুট্টা নিয়ে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু, 'ভুট্টার মালিক' কাপড় নিতে না চাইলে এখানে কী ঘটবে? তখন তাঁতি কীভাবে ভুট্টা পাবে? তাঁতিকে কাপড়ের মালিককে বলতে হবে : "তুমি কি পণ্য চাও, আমি ওই পণ্যটা নিয়ে সেটা তোমাকে দিয়ে পরে তোমার ভুট্টা নেব"।

আমরা ধরে নিলাম, 'ভুট্টার মালিক' 'জুতা' চাইল। তাঁতিকে তার কাপড় নিয়ে জুতার সন্ধানে যেতে হবে, উদ্দেশ্য ওই কাপড় দিয়ে জুতা নেওয়া। তাঁতিকে জুতার

মালিককে এভাবে বলতে হবে : "আমার কাপড়টা নিয়ে আমাকে এক জোড়া জুতা দাও, আমাকে এই জুতা নিয়ে ভুট্টার মালিকের কাছে যেতে হবে, তাকে এই জুতা দিয়ে আমাকে ভুট্টা নিতে হবে"। কিন্তু জুতার মালিক কাপড় চায় না, আমরা এমনটা ধরে নিতে পারি। তখন কীভাবে তাঁতি জুতা পাবে? সে তো ভুট্টা পাবে না জুতা না পেলে। সেহেতু, তাঁতিকে এভাবে বলতে হবে : "আমাকে বলো তুমি কোন্ পণ্যটা চাও, তুমি যেটা চাও আমাকে সেটা প্রথমে পেতে হবে তখন তোমার কাছ থেকে জুতা নেব। আমাকে ওটা দিয়ে ভুট্টা নিতে হবে"।

আমরা ধরে নিলাম জুতার মালিক গুড় চায়। তাঁতি তার কাপড় ঘাড়ে নিয়ে গুড়ের মালিকের সন্ধানে চলল। তাকে গুড় পেতে হবে, এটা জুতার মালিককে দিতে হবে, জুতাটা পেতে হবে এবং তখন জুতা দিয়ে সে ভুট্টা পাবে। যদি এভাবে কোন জিনিস পাওয়ার পথ হয়, কখন তাঁতি ভুট্টা পাবে? তাকে (প্রথম ব্যক্তি) প্রথমে ওই ব্যক্তিকে পেতে হবে যার (দ্বিতীয় ব্যক্তি) কাপড়ের (প্রথম পণ্য) দরকার। পরে তাঁতিকে ওই ব্যক্তিকে (তৃতীয় ব্যক্তি) পেতে হবে যিনি আবার ওই পণ্যটা (দ্বিতীয় পণ্য) চান যে পণ্যটা সে কাপড় দিয়ে নিয়েছে। আবার তাঁতিকে ওই ব্যক্তিকে (চতুর্থ ব্যক্তি) ধরতে হবে যিনি এই পণ্যটা চান যা তাঁতি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে থেকে নিয়েছে। যদি তাঁতি এই দুরূহ কাজগুলো করতে পারে, তখন সে তার প্রয়োজনের জিনিসটা পাবে আবার নাও পেতে পারে।

যখন আমরা বলি, একটা পণ্য নিজেই অন্য যেকোন পণ্যের সাথে বিনিময়কৃত হতে পারে, আমরা কথাটা এই অর্থে বলি যে এখানে বিনিময়ের একটা সম্ভাবনা আছে কিন্তু বিনিময়টা অবশ্যই ঘটবে এটা বুঝায় না।

মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের পর্যায়ে সমাজে একটা পণ্য দিয়ে অন্য একটা পণ্য পাওয়ার একটা ন্যূনতম সম্ভাবনা থাকে। যদি এই সম্ভাবনা না থাকে, শত চেষ্টায়ও বিনিময় ঘটবে না। সমাজের এই পর্যায়ে কোন পণ্য মালিকের পক্ষে কোন কষ্ট ছাড়া অন্য কোন পণ্য পাওয়ার কোন পথ নেই, তবে জিনিসটা পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। যদিও এখানে আমরা মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের ৩টা সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছি, তবে প্রতিটা সীমাবদ্ধতার মর্মবস্তু একই। তিনটা মিলেই এই পর্যায়ের সীমাবদ্ধতা।

অধ্যায় ছয়

মূল্যের 'সাধারণ' রূপ
('General' form of Value)

কিন্তু আমি যখন বলি যে, চীনে শীঘ্রই বিপ্লবী উত্তাল জোয়ার আসবে, তখন আমি কোনমতেই এমন কিছু বলি না, যা কিছু কিছু লোকের ভাষায় 'আসার সম্ভাবনা রয়েছে', যা কাজের পক্ষে তাৎপর্যহীন, যা অলীক এবং যা লাভ করা যায় না। এ যেন সমুদ্রের সুদূরে একটি জাহাজের মতো, তীর থেকে যার মাস্তুলের মাথাটা ইতিমধ্যেই দেখা যায়, এ যেন পূর্ব দিগন্তের উদয়োন্মুখ প্রভাত-সূর্যের মতো, যার ঝলোমলো রশ্মি দেখা যায় উঁচু পাহাড়ের শিখর থেকে, এ যেন মাতৃগর্ভে অস্থিরভাবে সঞ্চরণরত জন্মোন্মুখ শিশুর মতো।

–মাও সে তুঙ, নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, *একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে*, পৃ. ১৫০।

সমাজ যখন মূল্যের প্রাথমিক রূপের পর্যায়ে ছিল, একটা পণ্য কেবলমাত্র অন্য একটা পণ্যের সাথেই বিনিময় করা হতো। মূল্যের রূপ বিকশিত হয়েছে এবং কিছুটা বিস্তৃত হওয়ায় সমাজে বিদ্যমান মূল্য রূপটা 'সম্প্রসারিত' রূপ পেল, ফলে এই ঘাটতিটা চলে গেল, ইতিমধ্যে কয়েক যুগ চলে গেছে। কিন্তু, আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, মূল্যের সম্প্রসারিত রূপেও পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থেকে যায়। সমাজটা এগুতে থাকে, মূল্য রূপ আরও বিকশিত হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যাতে করে সম্প্রসারিত রূপের এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব হয়, তখন মূল্য রূপ 'সাধারণ মূল্য রূপ' ধারন করে। আমরা এখন দেখবো 'মূল্যের সাধারণ রূপ'-এ সমাজে তখন পর্যন্ত বিদ্যমান বিনিময় ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন ঘটে।

যদি কোটকে কাপড়ের সাথে বিনিময় করা হয়, এর অর্থ হয়, কাপড়কেও কোটের সাথে বিনিময় করা হলো। যদি কাপড়কে কয়েকটা পণ্যের সাথে বিনিময় করা হয়, এর অর্থ হয়, ওই পণ্যগুলোকেও কাপড়ের সাথে বিনিময় করা হলো। একটা সমীকরণ একই সাথে বিপরীত সমিকরণও তুলে ধরে।

মূল্যের প্রাথমিক রূপে :

২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট

এখানে কাপড় হলো একটা পণ্য যে তার মূল্য প্রকাশ করতে পারছে, আর কোট রয়েছে কাপড়ের সমতুল অবস্থানে। বিপরীত সমীকরণে কী ঘটে?

১টা কোট = ২০ মিটার কাপড়

এখন কোট হলো এমন একটা পণ্য যে তার মূল্য প্রকাশ করছে, আর কাপড় হয়ে ওঠছে তার সমতুল।

মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে :

২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট
২০ মিটার কাপড় = ৮ জোড়া জুতা
২০ মিটার কাপড় = ১০টা কলম
২০ মিটার কাপড় = ২৫ গ্রাম শস্য
২০ মিটার কাপড় = ২ গ্রাম সোনা

এখানে কাপড় হচ্ছে একটা পণ্য যে তার মূল্য প্রকাশ করছে, বিপরীত দিকে থাকা ৫ ধরনের পণ্য যারা রয়েছে কাপড়ের সমতুল অবস্থানে। আমরা যদি ধরে নিই এই ৫ ধরনের পণ্য তখন পর্যন্ত সমাজে প্রাপ্তিযোগ্য সকল পণ্যকে প্রকাশ করে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় কাপড়কে সকল পণ্যের সাথে বিনিময় করা যাচ্ছে।

এর বিপরীত সমীকরণে কী ঘটবে? তখন সকল পণ্যকে কাপড়ের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হবে। বিপরীত সমীকরণ হবে :

১টা কোট = ২০ মিটার কাপড়
৮ জোড়া জুতা = ২০ মিটার কাপড়
১০টা কলম = ২০ মিটার কাপড়
২৫ গ্রাম শস্য = ২০ মিটার কাপড়
২ গ্রাম সোনা = ২০ মিটার কাপড়

এখন সকল পণ্য হচ্ছে সেসব পণ্য যারা তাদের নিজ নিজ মূল্য প্রকাশ করতে পারছে, আর কাপড় থাকছে ওসব পণ্যের সমতুল অবস্থানে।

আমরা বিনিময়ের এই চিত্রটাকে এভাবে দেখতে পারি :

১টা কোট =
৮ জোড়া জুতা =
১০টা কলম = } ২০ মিটার কাপড়
২৫ গ্রাম শস্য =
২ গ্রাম সোনা =

এখানে সকল পণ্যের বিপরীতে রয়েছে একটাই সমতুল, যেটা কাপড়। এর অর্থ হয় : সকল পণ্যের মূল্য রূপ একই। যেকোন পণ্যের মূল্য একই রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এখন পণ্যের জগতে সকল পণ্য এসে গেল আপেক্ষিক অবস্থানে, এবং একমাত্র একটাই পণ্য (শুধু কাপড়) থাকল সমতুল্য অবস্থানে।

এখন পণ্য জগতের যেকোন পণ্যকে যদি আমরা প্রশ্ন করি : "কোন্ সব পণ্যের সাথে তুমি বিনিময় হচ্ছো"? প্রত্যেকটা পণ্য এভাবে উত্তর দেবে : "আমি একমাত্র কাপড়ের সাথে বিনিময় হচ্ছি, অন্য কোন পণ্যের সাথে আমি বিনিময়কৃত হচ্ছি না, একমাত্র কাপড় রূপই হচ্ছে আমার মূল্য রূপ"। কাপড় ব্যতীত সকল পণ্যই একই উত্তর দেবে, অর্থাৎ মূল্য রূপ একই। 'সকল পণ্য একই মূল্য রূপ ধারন করছে' কথাটা এটাই প্রকাশ করে যে, এখন মূল্য রূপটা হলো 'সর্বজনীন মূল্য রূপ', অন্যান্য পণ্যের সম্পর্ক সূত্রে। এটাই হলো 'মূল্যের সাধারণ রূপ' (সাধারণ অর্থ হলো সকলের সাথে সম্পর্কিত)। কারণ অবস্থাটা এমন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, যেখানে সকল ধরনের পণ্যকে একই সমতুল পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে। ওই নির্দিষ্ট পণ্যের নির্দিষ্ট রূপটা, যে সকল পণ্যের সমতুল অবস্থানে রয়েছে, এটাই হয়ে ওঠছে মূল্যের সাধারণ রূপ। আমাদের উদাহরণে 'কাপড়'-কে আমরা মূল্যের সাধারণ রূপ হিসেবে নিয়েছি, কাপড় নামের এই পণ্যটা এখানে সাধারণ সমতুল হয়ে ওঠেছে, সে সকল পণ্যের সাথে নিজেকে বিনিময় করার গুণ অর্জন করেছে।

সমাজে 'সাধারণ সমতুল'-এর তখনই আবির্ভাব ঘটে, যে অবস্থায় সকল ধরনের পণ্যের সাথে একটাই মাত্র পণ্যের বিনিময় সম্ভব হয়। যখন আমরা এমন অবস্থাকে দেখতে পাব, যেখানে একটা পণ্যকে সকল পণ্যের সাথে বিনিময় করা যাচ্ছে, ওই নির্দিষ্ট 'পণ্যটা'র দিক থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাব 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ' এবং যখন আমরা বিভিন্ন পণ্যের দিক থেকে দেখবো আমরা দেখতে পাব 'মূল্যের সাধারণ রূপ'।

মূল্যের প্রাথমিক রূপে প্রত্যেকটা পণ্যের থাকে নিজস্ব মূল্য রূপ, এমনকি সম্প্রসারিত স্তরেও প্রত্যেকটা পণ্যের থাকে নিজস্ব মূল্য রূপ।

কিন্তু, সাধারণ স্তরে প্রত্যেকটা পণ্যের নিজস্ব মূল্য রূপ থাকে না, ওই নির্দিষ্ট পণ্যটা ব্যতীত যে পণ্যটা সাধারণ সমতুল অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন সকল পণ্যকে 'সাধারণ সমতুল'-এর সাথে বিনিময় করা যায়। ওই নির্দিষ্ট পণ্যটা ব্যতীত তাদেরকে অন্য যেকোন পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায় না।

ওই 'সাধারণ সমতুল' একটা বিশেষ নাম পেয়ে গেছে, যে নামটা সমগ্র পণ্য জগতে একটা পরিচিত নাম। এই নামটা হলো অর্থ! পণ্য জগতে 'অর্থ' নামে যার আবির্ভাব ঘটলো, সে আর কিছুই নয় 'সাধারণ সমতুল' ব্যতীত। 'সাধারণ সমতুল' কী সেটা জানতে হলে 'অর্থ' কী সেটা জানতে হবে। আমরা এখানে 'অর্থ' শব্দটা ব্যবহার না ক'রে 'সাধারণ সমতুল' শব্দটাই ব্যবহার করবো।

সাধারণ সমতুল রূপটা নিজেই হলো মূল্যের সাধারণ রূপ।

১. মূল্যের সাধারণ রূপের কয়েকটা দিক
(Points concerning the 'general form of value')

১. সমাজে এমন একটা অবস্থা রয়েছে, যেখানে যেকোন পণ্য অন্য যেকোন পণ্যের সাথে বিনিময় করা যায়, এই অবস্থাটা যদি এমন অবস্থা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়, যেখানে সকল পণ্য কেবলমাত্র একটা পণ্যের সাথে বিনিময় করতে হবে, তাহলে জিনিসের প্রয়োজন কীভাবে পূরণ হবে? আমরা ধরে নিলাম 'কাপড়' হলো 'সাধারণ সমতুল'। আমরা আরও ধরে নিলাম একজন ব্যক্তির কাছে ভুট্টা রয়েছে, তার প্রয়োজন জুতার। ভুট্টাকে যদি জুতার সাথে বিনিময় করা না যায়, কিন্তু কাপড়ের সাথে যায়, তখন কী ঘটবে? ভুট্টার মালিকের কাপড়ের প্রয়োজন নেই, এটা তো ঠিক? সে কাপড় নিয়ে কী করবে, যা তার প্রয়োজন নেই? এই ব্যবস্থায় কী সুবিধা রয়েছে, যেখানে সকল পণ্যকে কেবলমাত্র একটা মাত্র পণ্যের সাথে বিনিময় করতে হয়?

এমন সমাজ যেখানে সাধারণ সমতুলের আবির্ভাব ঘটেছে, সুবিধাটা এই যে এখানে ওই পণ্যটার মাধ্যমে সকল বিনিময় সহজে সংঘটিত হতে পারে। ভুট্টার মালিকের প্রয়োজন জুতার। 'কাপড়' এখানে 'সাধারণ সমতুল'। ভুট্টার মালিক সরাসরি জুতার কাছে না গিয়ে, সে প্রথমে যাবে 'সাধারণ সমতুল'-এর কাছে। সে ভুট্টা দিয়ে তার পরিবর্তে কিছু সাধারণ সমতুল নিবে। এর পরেই সে জুতার মালিকের কাছে যাবে। সে সাধারণ সমতুল দিয়ে জুতার মালিকের কাছ থেকে এর পরিবর্তে জুতা নিয়ে নিবে। এভাবে ভুট্টার মালিক জুতা পেয়ে যাবে।

কিন্তু, এখানে প্রশ্ন আসে জুতা মালিক কি কাপড় (সাধারণ সমতুল) নেবে? যদি সে বলে, "আমার কাপড়ের দরকার নেই", তখন কী ঘটবে? সে এমনটা বলতে পারে না – কারণ এটা কোন ধরনের পণ্য? এটা এমন একটা পণ্য, যেটা সাধারণ সমতুল হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। জুতা মালিককেও তার জুতা বিনিময় করে তার প্রয়োজনীয় পণ্যটা পেতে হবে। যে ধরনের পণ্যই তার প্রয়োজন হোক, তার কাছে সাধারণ সমতুল থাকতে হবে। যদি সে সাধারণ সমতুল গ্রহণ ক'রে তার কাছে রাখে, তাহলে তার জন্যে অন্য যেকোন পণ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না। সেহেতু, জুতার মালিক কাপড় নিতে কোন ইতস্তত করবে না, যে কাপড় হলো সাধারণ সমতুল। এই মুহূর্তে তার কোন পণ্যের প্রয়োজন নাও থাকতে পারে, কিন্তু কিছু পরে তার বিভিন্ন পণের প্রয়োজন হবে। সেহেতু, এই কারণে সে কোন আপত্তি করবে না তার নিজের পণ্যটা দিয়ে সাধারণ সমতুল নিতে। বরং সে মহানন্দে রাজি হবে।

যখনই জুতার মালিক সাধারণ সমতুল নিয়ে জুতাটা দিয়ে দিবে, যে ব্যক্তি সাধারণ সমতুল ক্রয় করেছিল জুতাটা পেয়ে সাথে নিয়ে চলে যাবে।

এখন জুতার মালিকের কাছে রয়েছে সাধারণ সমতুল। আমরা ধরে নিলাম তার গুড়ের প্রয়োজন। সে যার কাছে গুড় আছে তাকে সাধারণ সমতুল দিয়ে গুড় পেয়ে যাবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার যেকোন পণ্য প্রয়োজন সেটা পেয়ে যাবে। এর অর্থ হলো : ভুট্টার মালিক জুতা পেয়ে গেল এবং জুতার মালিক গুড় পেয়ে গেল।

যেকোন ব্যক্তি যে ধরনের পণ্য তৈরি করুক, সে তার তৈরি জিনিস যার প্রয়োজন তাকে দিয়ে সাধারণ সমতুল গ্রহণ করবে। এটা হলো প্রথম বিনিময়। যখন সে সাধারণ সমতুল দিয়ে তার যা প্রয়োজন সেই পণ্যটা নিবে, এটা হবে দ্বিতীয় বিনিময়। এই দুই বিনিময়ের সূত্রে একজন ব্যক্তি একটা পণ্য দিয়ে অন্য একটা পণ্য পেয়ে যাচ্ছে।

যে প্রক্রিয়ায় ভুট্টার মালিক জুতা পেয়ে যায়, তা হলো এমন :

ভুট্টা = সাধারণ সমতুল —এটা হলো প্রথম বিনিময়
সাধারণ সমতুল = জুতা —এটা হলো দ্বিতীয় বিনিময়

এই বিনিময়ের প্রকৃত ঘটনা হলো মূলত ভুট্টা দেওয়া এবং জুতা নেওয়া। তবুও এটার অর্থ এই হয় না যে ভুট্টা জুতা মালিকের কাছে চলে গেল। কিন্তু, আমরা যদি ভুট্টার মালিকের দিক থেকে দেখি, ভুট্টা চলে গেল এবং জুতা এসে গেল।

এর অর্থ হলো, ভুট্টা = জুতা

যাহোক, এখানে বিনিময়টা দুটা পণ্যের পরস্পরের মধ্যে সরাসরি বিনিময়ের পরিবর্তে, সাধারণ সমতুলের মাধ্যমে ঘটছে। যে প্রক্রিয়ায় জুতার মালিক গুড় পেয়ে যাচ্ছে :

জুতা = সাধারণ সমতুল —এটা হলো প্রথম বিনিময়
সাধারণ সমতুল = গুড় —এটা হলো দ্বিতীয় বিনিময়
মূল বিষয়টা দাঁড়ায়, জুতা = গুড়

২টা পণ্যের মধ্যে এই বিনিময়টা ঘটছে সাধারণ সমতুল থাকার কারণে। এর অর্থ হলো দুটা পণ্যের মধ্যে বিনিময় ঘটনায় সাধারণ সমতুল মাধ্যমের ভূমিকা পালন করছে।

এর অর্থ হলো ২টা পণ্যের মধ্যে সংঘটিত বিনিময়ের এই ঘটনায় সাধারণ সমতুল 'মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখছে। সাধারণ সমতুল একজন পণ্য মালিককে অন্য একটা পণ্য পেতে সক্ষম করছে।

সাধারণ সমতুলের আবির্ভাব পণ্য জগতের এমন এক বিশাল অগ্রগতি সাধন করছে যার ফলে একজন পণ্য মালিককে তার প্রয়োজন এমন অন্য একটা পণ্য পেতে, তার পণ্যটাকে ঘাড়ে নিয়ে উদ্বিঘ্নতার সাথে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরার প্রয়োজন আর থাকছে না। পণ্য মালিক প্রথমে সাধারণ সমতুলের কাছে যাচ্ছে পরে তার প্রয়োজন এমন পণ্যের কাছে যাচ্ছে। একমাত্র দুটা বিনিময়ের ফলে, সে নিশ্চিত যে পণ্য সে চাচ্ছে সেটা পেয়ে যাবে।

অসংখ্য পণ্য দিয়ে গড়ে ওঠেছে পণ্য জগতটা, এই হাজার হাজার পণ্যের মধ্যে যেকোন জায়গায় যেকোন পণ্য বিনিময়ের ঘটনা সংঘটিত হতে পারছে, প্রত্যেকটা বিনিময় সাধারণ সমতুলের মাধ্যমে ঘটছে। এর কারণ সাধারণ সমতুলের মধ্যস্থতার ভূমিকা, ফলে পণ্য বিনিময় দ্রুততার সাথে ঘটছে। সাধারণ সমতুলের আবির্ভাবের ফলে, পণ্য বিনিময়ে এত সুবিধা।

২. কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে 'সাধারণ সমতুল'-এর আবির্ভাব ঘটে? সমাজে 'শ্রম বিভাজন' বৃদ্ধি পাচ্ছে, নতুন নতুন শ্রমের আবির্ভাব ঘটছে, ফলে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশাল সংখ্যায় বিনিময়ের ঘটনাও ঘটে চলেছে। পণ্য জগতটা বিস্তৃত হচ্ছে, যখন পণ্য সংখ্যা ছিল কম সেখানে বিনিময়ের যে পদ্ধতি যথেষ্ট ছিল, সেই পদ্ধতি এখন আর যথেষ্ট থাকছে না।

ধরে নিলাম একটা নির্দিষ্ট পণ্য সকলের জন্য লাগে। কিছু পণ্য একজনের প্রয়োজন নাও হতে পারে যা অন্য কারও বেশি লাগে। অন্য কিছু পণ্য আছে প্রায় সকলের যেগুলো দরকার। আমরা ধরে নিলাম অনেকের গরুর প্রয়োজন রয়েছে এবং একজন এক পাল গরু পুষছে। গরু পুষতে কিছু শ্রম সম্পাদন করতে হয়, তাই গরুর কিছু মূল্য থাকবে।

সকলে তাদের পণ্য দিল এবং গরু নিল। তাদেরকে অনেক পণ্য দিতে হবে যার মূল্য গরুর সমান। একটা পণ্যের জন্য অনেকগুলো সমতুল্যতা গঠিত হবে যার প্রয়োজন রয়েছে অনেকের। এই বিশেষ পণ্য (এখানে গরু) ওই কয়েকটা সমতুলের জন্য সাধারণ সমতুল হয়ে ওঠবে। এভাবে একটা পণ্য অধিক সংখ্যক লোকের যার প্রয়োজন রয়েছে, ওই পণ্যটা 'সাধারণ সমতুল'-এর ভূমিকায় এসে যায়।

কোন একদিন হঠাৎ করে এই পদ্ধতি শুরু হয়ে যায় না। প্রথমে ৪টা বা ৫টা পণ্যের জন্য একটা সাধারণ সমতুল গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে আরও অধিক সংখ্যক পণ্যের জন্য সাধারণ সমতুল আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সময়ের সাথে এক পর্যায়ে পণ্য জগতের সকল পণ্যের জন্য চূড়ান্ত ভাবে একটাই সাধারণ সমতুল দাঁড়িয়ে যায়। তখন থেকে পণ্য জগতে সাধারণ সমতুল একটাই থেকে যায়, দ্বিতীয় কোন সাধারণ সমতুল আর থাকে না।

সমাজে সাধারণ সমতুলের আবির্ভাবের এই ঘটনা এটাই প্রকাশ করে যে সকল পণ্য তাদের মধ্য থেকে একটা পণ্যকে এভাবে ক্ষমতায়িত করছে যাতে করে ওই নির্দিষ্ট পণ্যটা 'সাধারণ সমতুল' হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। এর অর্থ হলো এই যে সকল পণ্য ওই পণ্যটাকে লক্ষ করে যেন বলছে : "তুমি একাই আমাদের সকলের জন্য সাধারণ সমতুল। আমরা কেউই সমতুল হতে যাব না। আমরা সকলেই একমাত্র তোমার সাথেই বিনিময়কৃত হবো অন্য কারও সাথে নয়"।

যদি সকলে মিলে একই কাজ করে, তাহলে কাজটা হবে একটা 'সম্মিলিত কাজ'। পণ্য জগতে সকল পণ্য সম্মিলিত ভাবে এই যৌথ কাজটা করে যায়, যাকে বলা যায় মাত্র একটা সমতুলের সাথে "বিনিময়"। একমাত্র এই যৌথ কাজের ফলে সাধারণ সমতুলের আবির্ভাব ঘটে। এভাবে, সময়ের সাথে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সাধারণ সমতুল গঠিত হয়ে যায়, বিনিময়ের জগতে এটা ঘটতে একটা দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এটার উদ্ভব ঘটে এ কারণ নয় যে, কয়েকজন 'অর্থনীতিবিদ' ভালভাবে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত দিল : "চল আমরা সকল পণ্যের জন্য একটা মাত্র সাধারণ সমতুল ঠিক করি"।

যেহেতু সাধারণ সমতুল সকল পণ্যের সাথে সম্পর্ক সূত্রে তাদের সমতুল্য, সমগ্র বিশ্বে যেখানেই তাদের অবস্থান থাকুক না কেন, আমরা একে এই নামেও ডাকবো "সর্বজনীন সমতুল"।

৩. "সাধারণ সমতুল দিয়ে যে কাজটা সম্পাদিত হয়, তাহলো পণ্যের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার ভূমিকা, এটা তো ঠিক? তখন প্রশ্ন আসে, কেন আমাদের একটা পাথর বা এমনই কোন জিনিস থাকবে না, যে বস্তুটা এই ভূমিকা পালন করবে? সমগ্র সমাজ যদি একে সাধারণ সমতুলের যথাযথ স্বীকৃতি দেয়, কেন এটা ওই ভূমিকা পালন করতে পারবে না"? যদি কেউ এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে, এর অর্থ হবে – 'মূল্য' সংক্রান্ত বিষয়ে এতক্ষণ যাকিছু সে বা আমরা পড়েছি, তা বুঝি নাই। সাধারণ সমতুলের ভূমিকা পালন করতে হলে, এমন কিছু থাকতে হবে যা শ্রম দিয়ে তৈরি হয়েছে, কোন পাথর বা এ ধরনের কিছু নয়। কারণ হলো : যদি সাধারণ সমতুল শ্রম দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, অন্যান্য পণ্যেগুলোর পক্ষে তার সাথে বিনিময় করা সম্ভব হবে না। আমরা ধরে নিলাম –

২ কেজি ভুট্টা = ১ কেজি শস্য

এর অর্থ হলো এই দুটা পণ্যের মূল্য সমান। আমরা ধরে নিতে পারি এই ভুট্টায় আছে ১০ মিনিট শ্রম এবং শস্যেও আছে ১০ মিনিট শ্রম।

এই পণ্য দুটা যদি পরস্পরের সাথে বিনিময় হতে চায়, সেটা সরাসরি ঘটবে না। তারা সাধারণ সমতুলের মাধ্যমে বিনিময় হতে পারবে। আমরা এখানে ধরে নিলাম কাপড় হচ্ছে সাধারণ সমতুল, আর প্রতি মিটার কাপড়ে রয়েছে ৫ মিনিট শ্রম।

ভুট্টা মালিককে প্রথমে ভুট্টা দিয়ে সাধারণ সমতুল নিতে হবে। যেহেতু সাধারণ সমতুলেরও মূল্য আছে, এখানে কিছু হিসাব-নিকাশ আসবে – ২ কেজি ভুট্টার পরিবর্তে কত পরিমাণ সাধারণ সমতুল দিতে হবে। ওই হিসাব মতো ২ কেজি ভুট্টার জন্য ২ মিটার কাপড় লাগে। তখন ভুট্টা মালিককে সাধারণ সমতুল দিয়ে শস্য নিতে হবে। যদি সে ২ কেজি ভুট্টা দেয় সে ১ কেজি শস্য পাবে। অথবা যদি সে ১ মিটার কাপড় দেয় সে আধা কিলো শস্য পাবে। এভাবে যখন শস্যও নেওয়া হবে, শস্যের পরিবর্তে সাধারণ সমতুল লাগবে, আর এটা হিসেব মতই ঘটে।

যদি সাধারণ সমতুল এমন কোন বস্তু না হয় যার শ্রম আছে (শ্রম দিয়ে তৈরি হয়েছে), অন্যান্য পণ্যগুলোর সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে সাধারণ সমতুল কত অনুপাতে বিনিময় করতে হবে? এটা হবে আরোপিত মূল্য, যে ধার্য মূল্যে সাধারণ সমতুল বিনিময়ের 'মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখবে, কিন্তু সরল অর্থে নামেই কেবল 'মাধ্যম' হিসেবে নয়।

ধরে নিলাম পণ্য জগতে কিছু পাথর বা এমন ধরনের কোন কিছু– যা মানুষের শ্রম দিয়ে তৈরি হয়নি – সাধারণ সমতুল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। আরও ধরে নিলাম ওই পাথরের টুকরাগুলোর সাথে বিনিময় হওয়ার জন্য বাজারে ৪ ধরনের পণ্য রয়েছে। আমরা ধরে নিতে পারি ওই পণ্যগুলো হলো ২ কেজি ভুট্টা, ১ গ্রাম সোনা, ১ লিটার দুধ এবং ৪ জোড়া জুতা। ভাল, এখানে প্রশ্ন আসবে – সাধারণ সমতুল কোন্ কোন্ অনুপাতে ওই সবগুলো পণ্যের সাথে বিনিময় হবে? যদি সমতুল মানুষের শ্রমে তৈরি হতো, তখন কোন পণ্যের সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ওই পণ্যের মূল্যের অনুপাতে সাধারণ সমতুলের সমানুপাতিক অংশটুকু বিনিময় করা যেত।

এখানে আমরা সাধারণ সমতুলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এমন কয়েকটা পণ্যের পরিমাণ এবং প্রতিটা পণ্যে ব্যয়িত শ্রম নিয়ে এক্ষেত্রে ঘটনা কী ঘটছে, সেটা পরীক্ষা করতে পারি :

২ কেজি ভুট্টায় রয়েছে	-- ১০ মিনিট শ্রম
১ গ্রাম সোনায় রয়েছে	-- ৩০ মিনিট শ্রম
১ লিটার দুধে রয়েছে	-- ১৫ মিনিট শ্রম
৪ জোড়া জুতায় রয়েছে	-- ২৫ মিনিট শ্রম

যদি সাধারণ সমতুলকে এই ৪টা পণ্যের সাথে বিনিময় করতে হয়, সকল পণ্যের সাথে একই পরিমাপে কি সেটা ঘটবে? যে পণ্যটার সাথে রয়েছে ১০ মিনিট শ্রম এবং যে পণ্যটার সাথে রয়েছে ৩০ মিনিট শ্রম, এই উভয়ের পরিবর্তে কি একই পরিমাণ সাধারণ সমতুল দিতে হবে?

ধরে নিলাম কাপড় হলো সাধারণ সমতুল, যার শ্রম-সময় হলো প্রতি মিটার কাপড়ে ৫ মিনিট; ইতিপূর্বে উল্লেখিত বিনিময়গুলোর আগেই কাপড়ের সাথে নিচে দেওয়া হিসেব মতো বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে :

২ কেজি ভুট্টা	=	২ মিটার কাপড়
(১০ মিনিট শ্রম)		(১০ মিনিট শ্রম)
১ গ্রাম সোনা	=	৬ মিটার কাপড়
(৩০ মিনিট শ্রম)		(৩০ মিনিট শ্রম)
১ লিটার দুধ	=	৩ মিটার কাপড়
(১৫ মিনিট শ্রম)		(১৫ মিনিট শ্রম)
৪ জোড়া জুতা	=	৫ মিটার কাপড়
(২৫ মিনিট শ্রম)		(২৫ মিনিট শ্রম)

এখানে যেহেতু সাধারণ সমতুল শ্রম দিয়ে তৈরি হয়েছে, এটার থাকবে মূল্য পরিমাপের বিভিন্ন হিসেব যা নির্ধারণ করবে একটা নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য সাধারণ সমতুলের কত অংশ বা পরিমাণ বিনিময় করতে হবে, যখনই অন্যান্য পণ্যগুলোর সাথে এর বিনিময় করতে হবে। যদি ঘটনা এমনই হয় যে সাধারণ সমতুল মানুষের শ্রমে তৈরি নয়, তখন কোন হিসেব-নিকেশের ভিত্তিতে অন্য পণ্যসমূহের সাথে সাধারণ সমতুলের বিনিময় সম্ভব নয়।

যদি আমরা কোন জিনিসের ওজন মাপতে চাই, তখন যার ওজন আছে এমন একটা জিনিসের মাধ্যমেই কেবলমাত্র ওই জিনিসটার ওজন পরিমাপ করা যায়। অন্য যেকোন বস্তুর ওজন মাপতে ওজনহীন বস্তু কোন কাজে আসে না। একই ভাবে, কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপতে দৈর্ঘ্যহীন জিনিস কোন কাজে আসে না। তদ্রূপ, কোন বস্তু যার 'মূল্য' নেই (শ্রম নেই), অন্য কোন জিনিসের মূল্য পরিমাপে এটা কোন কাজে আসে না। যেহেতু শ্রম অন্য একটা শ্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে (বিনিময়ের মাধ্যমে), সাধারণ সমতুল, যে নিজের মাধ্যমে অন্যান্য পণ্যের শ্রম প্রকাশ করে, তাকে অবশ্যই এমন বস্তু হতে হবে যা শ্রম দিয়ে তৈরি। যদি অন্যথা ঘটে, এটা দিয়ে মূল্যের পরিমাপ হবে না এবং সেহেতু এটার সাথে বিনিময় সম্ভব হবে না।

৪. পণ্যের জগতে, একমাত্র ওই পণ্য যে সাধারণ সমতুল হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, সে রয়েছে সমতুল্য অবস্থানে এবং অন্য সকল পণ্য রয়েছে আপেক্ষিক অবস্থানে, এটা তো ঠিক। যখনই সমাজে একবার সাধারণ সমতুল গঠিত হয়ে যায়, পণ্য জগতে বিভিন্ন ধরনের নতুন যেসব পণ্য আসতে থাকে তারা আপেক্ষিক অবস্থানে চলে যায়। এর অর্থ হলো এমনকি এসব নতুন আগত পণ্যকেও একমাত্র সাধারণ সমতুলের সাথে বিনিময়ে যেতে হবে।

৫. এই উদাহরণে ভুলটা কী সেটা আমরা দেখতে পারি :

$$\left.\begin{array}{l} ১টা\ কোট \\ ১\ গ্রাম\ সোনা \\ ২০\ মিটার\ কাপড় \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{l} \\ \\ ২০\ মিটার\ কাপড় \end{array}\right.$$

এখানে ২০ মিটার কাপড় আপেক্ষিক অবস্থান এবং সমতুল্য অবস্থান উভয় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যদি এটা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এটা যেন ২০ মিটার কাপড়কে একমাত্র ২০ মিটার কাপড়ের সাথে বিনিময় করা হচ্ছে। এটা ভুল। সেহেতু, একটা পণ্য যে সাধারণ সমতুল হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে সর্বদাই অবশিষ্ট সকল পণ্য থেকে দূরে থাকতে হবে এবং সব সময় সমতুল্য অবস্থানে থাকতে হবে।

৬. 'সাধারণ সমতুল' নিজেও একটা পণ্য, এটা কি ঠিক নয়? যদি এই পণ্যটাকে সর্বদাই সমতুল অবস্থানে থাকতে হয়, এবং নিজের মাধ্যমে সর্বদাই অন্যান্য পণ্যের মূল্য প্রকাশ করতে হয়, তাহলে কখন সে নিজের মূল্য প্রকাশ করে? কোন্ পণ্যের মাধ্যমে এটা জানা যায়? কোন্ পণ্য যে সাধারণ সমতুলের মূল্য রূপ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়?

সাধারণ সমতুলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে এমন সকল পণ্যইমূল্য প্রকাশ করে। তাদের সকলেই হলো সাধারণ সমতুলের মূল্য রূপ।

যেকোন পণ্যের মূল্য জানতে হলে, তাকে 'আপেক্ষিক অবস্থান'-এ যেতে হবে। কাপড়ের মূল্য জানতে, যে আবার সাধারণ সমতুলও বটে, তাকে আপেক্ষিক অবস্থানে যেতে হবে। তখন সকল পণ্য চলে যাবে সমতুল্য অবস্থানে। তখন আসবে 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'। এর অর্থ হলো : কাপড়ের মূল্য যা সাধারণ সমতুল হিসেবে উপস্থিত হবে কয়েকটা পণ্যের রূপ নিয়ে। ২০ মিটার কাপড়ের জন্য কয়টা কোট আমরা পাব? কতগুলো কলম? কতটুকু সোনা? এভাবে কাপড়ের মূল্য যেকোন সংখ্যক পণ্য (এখানে সকল পণ্য) রূপ নিয়ে প্রকাশিত হবে, যেটা কাপড়ের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে। ওই সকল পণ্য যারা সাধারণ সমতুলের বিপরীতে এসে দাঁড়ায়, তারাই হচ্ছে এমন সব পণ্য যারা সাধারণ সমতুলের মূল্য প্রকাশ করে। সকল পণ্যই হচ্ছে এটার মূল্য রূপ। এর অর্থ হলো যখন সাধারণ সমতুল এমন একটা পণ্য হিসেবে টিকে থাকে যে তার নিজের মূল্য প্রকাশ করতে পারে, এটার থাকবে অনেক সমতুল (অনেক মূল্য রূপ), কিন্তু একটা মাত্র (একটা মূল্য রূপ) নয়। এর অর্থ হয় যখন পণ্য জগতের সকল পণ্য মূল্যের সাধারণ রূপ ধারন করে, কিন্তু যে

পণ্য দাঁড়িয়ে আছে সাধারণ সমতুল হিসেবে তারই একমাত্র থাকে মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ। এই পর্যায়ে এটা মূল্যের সাধারণ রূপ ধারন করতে পারে না।

৭. কোন ব্যক্তি, যার 'সাধারণ সমতুল'-এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, ওই ব্যক্তি একটা পণ্য দিয়ে অন্য একটা পণ্য নিল, এটা হবে অদল-বদল পদ্ধতির (বার্টার পদ্ধতি) একটা বিনিময়। মূল্যের প্রাথমিক রূপের স্তরে সকল বিনিময় সংঘটিত হতো বার্টার পদ্ধতিতে। মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের স্তরেও বিনিময় বার্টার পদ্ধতিতে ঘটে থাকে। মূল্যের সাধারণ রূপে, বার্টার পদ্ধতি চলে যায় এবং সাধারণ সমতুল বাজারে এসে যায় আর প্রবেশ করে বিনিময় হতে যাচ্ছে এমন পণ্যের মধ্যে। এমনকি সাধারণ সমতুলের আবির্ভাবের পরেও সমাজের কোন কোন জায়গায় বার্টার পদ্ধতিতে বিনিময় ঘটবে। বার্টার পদ্ধতির বিলুপ্তি একমাত্র ধীরে ধীরেই ঘটে।

৮. আমরা দেখেছি বিনিময় সংঘটিত হয় একমাত্র দুটা পণ্যের মধ্যে সম্পর্ক থাকলে, এটা হলো মূলের প্রাথমিক রূপের একটা বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য এমনকি মূল্যের সাধারণ রূপেও অক্ষুন্ন থাকে। যদি শস্য মালিক ভুট্টা চায়, প্রথমে শস্য এবং সাধারণ সমতুলের মধ্যে একটা বিনিময় ঘটে, এটা ২টা পণ্যের মধ্যকার একটা বিনিময়ের ঘটনা। দ্বিতীয় বারে সাধারণ সমতুল এবং ভুট্টার মধ্যে বিনিময় ঘটে, এটাও ২টা পণ্যের মধ্যকার একটা বিনিময়ের ঘটনা। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যখনই সাধারণ সমতুলের সাথে কোন পণ্যের বিনিময় ঘটে, এটা হবে কেবলমাত্র ২টা পণ্যের মধ্যকার একটা বিনিময়ের ঘটনা।

এটা ছাড়াও মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের বৈশিষ্ট্যগুলো মূল্যের সাধারণ রূপে বজায় থাকে। কারণ সাধারণ সমতুল একটা পণ্য, পণ্য হিসেবে পণ্যের মূল্য রূপে মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ সাধারণ সমতুলে রয়ে যায়। সম্প্রসারিত স্তর পণ্যের এমন একটা রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, যেখানে ওই পণ্যটা সাধারণ সমতুল হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। এর অর্থ হলো, সম্প্রসারিত স্তরের বৈশিষ্ট্য সাধারণ স্তরেও থেকে যায়। সেহেতু আমরা বলতে পারি – প্রাথমিক স্তরের এবং সম্প্রসারিত স্তরের উভয় বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ স্তরে এসে সম্পূর্ণ লোপ পায় না। অর্থাৎ, মূল্যের সাধারণ রূপ সমাজে অন্য কোথা থেকে নতুন ভাবে উদ্ভূত হয় না। প্রাথমিক স্তর এবং সম্প্রসারিত স্তরের ঘাটতিগুলো (বিনিময় ক্ষেত্রের ঘাটতিগুলো) অতিক্রম করে এবং এই উভয় স্তরের ইতিবাচক দিকগুলোকে ধারন করেই সাধারণ স্তরের আবির্ভাব ঘটে।

২. 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'-এর অপর্যাপ্ততা 'মূল্যের সাধারণ রূপ'-এ কীভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়? (How did the inadequacies of the 'expanded form of value' disappear in the 'general form of valule'?)

১. ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে 'মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ'-এ 'মূল্যের প্রকাশ' অসম্পূর্ণ থাকে। এখন আমরা দেখবো মূল্যের সাধারণ রূপে মূল্যের প্রকাশ কীভাবে পূরিপূর্ণ রূপ পায়।

মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে একটা পণ্যের পক্ষে তার নিজের মূল্য সম্পর্কে এভাবে বলাটা সম্ভব হয় না : "এখানে দেখ, এটাই হলো আমার মূল্যের রূপ। আমার মূল্য এই রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপে হতে পারে না"। সুতরাং, এই স্তরে মূল্যের প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

কিন্তু, মূল্যের সাধারণ রূপের স্তরে যদি একটা পণ্য তার মূল্য প্রকাশ করতে চায়, ওই পণ্যটা সাধারণ সমতুল হিসেবে যে পণ্যটা বাজারে রয়েছে তার মাধ্যমে নিজের মূল্য রূপ প্রকাশ করতে পারবে। ওই পণ্যটা এভাবে একটা স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে : "একমাত্র এটাই হলো আমার মূল্য রূপ। এটা ব্যতীত অন্য কোন রূপে আমার মূল্য রূপ উপস্থিত হয় না"।

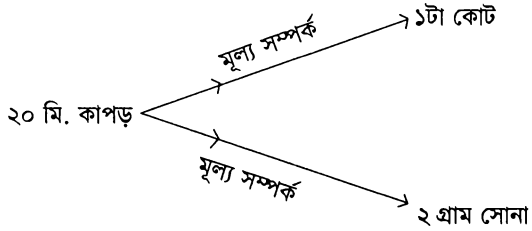
এর অর্থ হয় এই যে, মূল্যের সাধারণ রূপের স্তরে একটা পণ্যের মাত্র একটাই মূল্য রূপ থাকে, অন্য কোন দ্বিতীয় মূল্য রূপ কখনও থাকে না। পণ্যের রাজ্যে যেকোন সংখ্যক নতুন পণ্য প্রবেশ করলেও, ওসব পণ্যের মূল্য রূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। সেহেতু বলা যায়, মূল্যের সাধারণ রূপের স্তরে একটা পণ্যের মূল্য রূপ সুসম্পূর্ণ।

২. মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের ক্ষেত্রে একটা পণ্যের কয়েকটা পণ্যের সাথে মূল্য-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তবে এটা লক্ষ করার বিষয়, ওসব পণ্যের নিজেদের মধ্যেকার মূল্য-সম্পর্ক দৃশ্যমান হয় না; মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের স্তরে চিত্রটা হলো এমন। আমরা এখন মূল্যের সাধারণ রূপে ঘটনাধারা কী দাঁড়ায় সেটা দেখবো :

মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে :
২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট
= ১ গ্রাম সোনা

নিচের চিত্রে আমরা একই ঘটনা দেখতে পাই

২



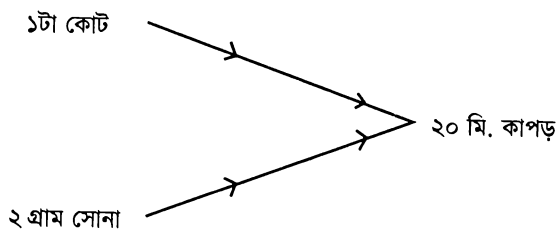
এই চিত্রে কাপড় এবং কোটের মধ্যকার সম্পর্কটা দৃশ্যমান। এমনকি কাপড় এবং সোনার মধ্যকার সম্পর্কও দৃশ্যমান। কিন্তু, এখানে কোট এবং সোনার মধ্যকার মূল্য সম্পর্কটা দৃশ্যমান নয়।

যখন আমরা এই ঘটনাকে মূল্যের সাধারণ রূপে রূপান্তরিত করি, চিত্রটা দাঁড়াবে এমন :

১টা কোট =
২ গ্রাম সোনা = } ২০ মিটার কাপড়

আমরা এখন কাপড়ের নিজের বা তার দিক থেকে নয়, সমতুলের দিক থেকে মূল্য-সম্পর্কগুলো দেখতে পারছি। এখানে ২টা পণ্যকে আপেক্ষিক অবস্থানে এবং কাপড়কে সমতুল্য অবস্থানে দেখানো হয়েছে ।

৩



এখানে কোট -- কাপড়ের সাথে বিনিময় হচ্ছে
সোনা -- কাপড়ের সাথে বিনিময় হচ্ছে

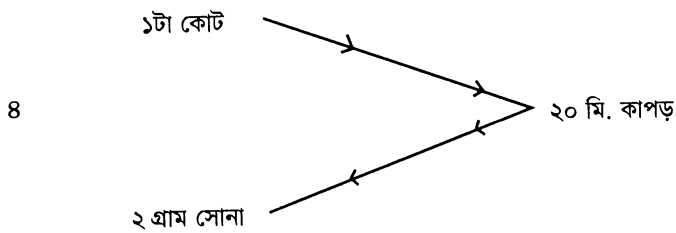
এখানে উভয় পণ্যকে একই পণ্যের সাথে বিনিময় করা হচ্ছে। 'একই সমতুলের সাথে বিনিময়'-এর এই ঘটনা আর একটা প্রমাণকে তুলে ধরে, সোনা এবং কোট এই উভয় পণ্যের একটা "সাধারণ বৈশিষ্ট্য" আছে। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটা হলো 'মূল্য'।

ঘটনা হলো : কোট এবং সোনা উভয়ের রয়েছে 'মূল্য' এবং যেহেতু তাদের রয়েছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের মধ্যে 'বিনিময় সম্পর্ক' উপস্থিত রয়েছে, এটা প্রমাণিত হলো। যে সম্পর্কটা মূল্যের সম্প্রসারিত রূপে দৃশ্যমান হয়নি, এখন মূল্যের সাধারণ রূপে তা দৃশ্যমান হলো (কোট এবং সোনার মধ্যকার বিনিময় সম্পর্ক পূর্বে দৃশ্যমান হয়নি)।

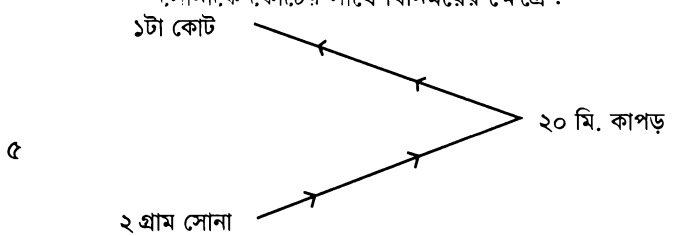
সাধারণ স্তরে কোট এবং সোনার মধ্যকার বিনিময় সম্পর্ক এটাই প্রকাশ করে যে কোটের সাথে সোনার অথবা সোনার সাথে কোটের সরাসরি বিনিময় হয় না। তাদের মধ্যে বিনিময়টা সাধারণ সমতুলের মাধ্যমে ঘটে।

আমরা এখন ধরে নিলাম কোটকে সোনার সাথে বিনিময় করা হচ্ছে। কোন মালিককে প্রথমে কোটটা দিয়ে কাপড় নিতে হবে, যে কাপড় এখানে সাধারণ সমতুল। পরে তাকে কাপড় দিয়ে সোনা নিতে হবে। যদি ঘটনা এভাবে ঘটে, এটার মানে হবে কোটকে যেন সোনার সাথে বিনিময় করা হয়েছে। এমনকি সোনাকে কোটের সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

কোটকে সোনার সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে :



সোনাকে কোটের সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে :



এই ২টা চিত্রে (১) কোট এবং কাপড়ের এবং (২) সোনা এবং কাপড়ের মধ্যকার সম্পর্ক দৃশ্যমান, (৩) কোট এবং সোনার মধ্যকার সম্পর্কও দৃশ্যমান। কিন্তু মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের ক্ষেত্রে ৩য় সম্পর্কটা উপস্থিত থাকে না।

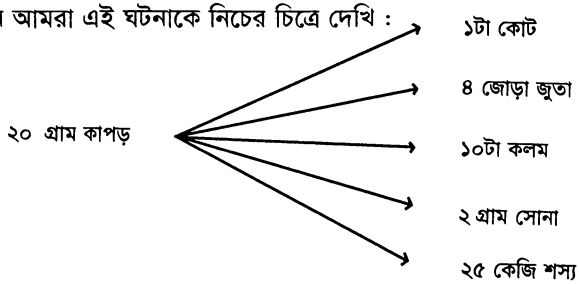
মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ এবং মূল্যের সাধারণ রূপের মধ্যের পার্থক্য আরও স্পষ্ট হবে, যদি ৩টা পণ্যের পরিবর্তে আমরা কয়েটা পণ্যকে উদাহরণে নিয়ে পরীক্ষা করি।

মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ :

২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট
= ৮ জোড়া জুতা
= ১০টা কলম
= ২ গ্রাম সোনা
= ২৫ গ্রাম শস্য

যখন আমরা এই ঘটনাকে নিচের চিত্রে দেখি :

৬



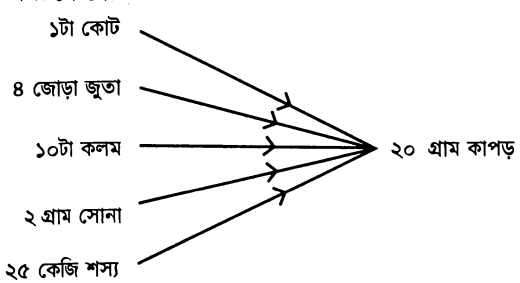
এখানে কাপড়ের সামনে ৫টা সমতুল রয়েছে। এটা এখানে পরিষ্কার যে কাপড়ের সাথে ওই ৫টা পণ্যের বিনিময় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ওই ৫টা পণ্যের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কি এখানে স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে? জুতা কি কলমের সাথে বিনিময় হচ্ছে? কলম কি কোটের সাথে বিনিময় হচ্ছে? এই সম্পর্কগুলোর কোনটাই আমরা এখানে দেখছি না। আমরা এখন দেখবো, যে সম্পর্কগুলো এখানে দৃশ্যমান নয়, মূল্যের সাধারণ রূপে সেগুলো কীভাবে দৃশ্যমান হয়।

মূল্যের সাধারণ রূপ :

১টা কোট =
৮ জোড়া জুতা =
১০টা কলম =
২ গ্রাম সোনা =
২৫ কেজি শস্য =
} ২০ মিটার কাপড়

যখন আমরা একই ঘটনা চিত্রে দেখি :

৭



এখানে সকল পণ্যের জন্য রয়েছে একই সমতুল। এই কারণেই এটা 'সাধারণ সমতুল'। এই সমতুলের মাধ্যমে সকল পণ্য একে অপরের সাথে বিনিময় হতে পারে। উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, একজন ব্যক্তি একটা পণ্য থেকে অন্য যেকোন পণ্যে যেতে পারছে। এর অর্থ হয়, একজন যেকোন পণ্য দিতে পারে এবং অন্য যেকোন পণ্য নিতে পারে। যদিও, সেটা একমাত্র সাধারণ সমতুলের মাধ্যমে করতে হয়। একজনকে প্রথমে কাপড়ের সাথে কোটের বিনিময় করতে হবে এবং পরে কাপড়ের সাথে কলমের। অথবা, একজন জুতায় অথবা সোনায় অথবা অন্য যেকোন পণ্যে যেতে পারে । যে সম্পর্কটা সোনা দিয়ে শুরু হয়েছিল তা অগ্রসর হতে পারে জুতায় অথবা অন্য যেকোন পণ্যে। এভাবে পণ্যের জগতে সাধারণ সমতুলের মাধ্যমে যেকোন পণ্য এবং অন্য যেকোন পণ্যের মধ্যে একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন আমরা যদি কোন পণ্যকে জিজ্ঞাসা করি : "তোমার মূল্যের রূপ কী?", ওই পণ্যটা এভাবেই বলবে : "আমার কোন বিশেষ মূল্য রূপ নাই। সকল পণ্যের যে ধরনের মূল্য রূপ আছে আমার মূল্য রূপও তেমন"।

যদি আমরা একই দেশের প্রতি নাগরিককে জিজ্ঞাসা করি, "তোমার দেশ কোনটা?", প্রত্যেক নাগরিকের উত্তর হবে একই : "এখানে আমার জন্য পৃথক কোন দেশ নাই। আমাদের সকলের জন্য যে দেশ, আমারও দেশ একই"। এমন উত্তর বলায়, এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে নারী বা পুরুষ যে-কোন নাগরিকের সাথে অন্য সকল নাগরিকের 'একই দেশ' হিসেবে একটা সম্পর্ক এখানে রয়েছে।

একই ভাবে, যদি একটা পণ্য বলে: "আমার মূল্য রূপ পৃথক নয়। সকল পণ্যের যে মূল্য রূপ আছ, আমারও মূল্য রূপ একই" – তখন ঘটনা হয় একটা মূল্য সম্পর্ক সকল পণ্যের মধ্যে রয়েছে সেটা এখন দৃশ্যমান।

'সকল পণ্য সমান' কথাটা বলার অর্থ হয় যেসব শ্রম দিয়ে এগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো সমান। কিন্তু, সকল শ্রম একই ধরনের নয়। সেগুলো বিভিন্ন প্রকৃতির। যদি আমরা বলি 'বিভিন্ন শ্রম সমান', কোন্ দিক থেকে সেগুলো সমান? সেগুলো শ্রমই তাই সমান। বুনন কাজ একটা শ্রম, দর্জি কাজ একটা শ্রম আর লেখার কাজও একটা শ্রম। শ্রম যে নাম নিয়েই থাকুক সে তো শ্রম। এই দিক থেকে সেগুলো সমান।

যেহেতু যেকোন শ্রম কোন-না-কোন 'ব্যবহার-মূল্য' দিবে, ব্যবহার-মূল্য দেওয়ার এই বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় সকল শ্রম সমান। যেহেতু শ্রম মূল্য হয়ে ওঠতে পারে, তাই 'মূল্য হয়ে ওঠার' এই দৃষ্টিকোণ থেকেও সকল শ্রম সমান।

যাহোক, আমরা সবখানে দেখলাম ঘটনা এই যে "সকল শ্রম সমান" এটা পরিলক্ষিত হয় একমাত্র তখনই যখন শ্রমকে মূল্যের দিক থেকে দেখি কিন্তু ব্যবহার-মূল্যর দিক থেকে নয়।

ঘটনা হলো এই যে "সকল শ্রম সমান" স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় না যখন আমরা বলি "একটা নির্দিষ্ট শ্রম অন্যান্য শ্রমের সমান" (মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের স্তরে নয়), কিন্তু যখন আমরা বলি "সকল শ্রম একে অপরের সমান" তখন দৃশ্যমান হয় (মূল্যের সাধারণ রূপের ক্ষেত্রে)।

পণ্যের সমতা বা সাম্যতা এবং সে-কারণে শ্রমের সাম্যতা দৃশ্যমান হয় ওই অবস্থায় যখন সমাজে সাধারণ সমতুলের আবির্ভাবের ফলে সকল পণ্যের মধ্যে বিনিময় সম্পর্ক এবং মূল্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বার্টার পদ্ধতিতে পণ্যের সাম্যতা প্রমাণিত হয় না যেখানে বিনিময় সংঘটিত হয় বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক ভাবে, আর যেহেতু এই স্তরে সাধারণ সমতুলের আবির্ভাব ঘটে না তাই শ্রমের সাম্যতাও প্রতিষ্ঠিত হয় না।

যখন আমরা বলি, সাধারণ সমতুল গঠিত হয়ে যাওয়ার পরে শ্রমের সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, এর অর্থ এমনটা হয় না যে সমাজে সাধারণ সমতুল গঠিত হলেই পর শ্রমের সাম্যতার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

এমনকি সাধারণ সমতুল গঠিত হওয়ার পরেও কয়েক শত নয় কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে মানব জাতির পক্ষে এটা বুঝতে 'শ্রম' কী। মানুষের পক্ষে শ্রমের প্রকৃত তাৎপর্য আয়ত্ত করতে এবং 'শ্রমের সাম্যতা' বুঝতে, সমাজে বিভিন্ন শর্তের আবির্ভাব ঘটতে হবে, এমন অবস্থায় বাজারে একটা বিশাল সংখ্যক জিনিস বিনিময়ের জন্য আসতে হবে, 'পণ্য' হিসেবে ওই বিশাল সংখ্যক জিনিসের বিনিময় সাধারণ সমতুলের সাথে ঘটতে হবে। যদি এমনটা না ঘটে, 'শ্রম'ই বলি বা 'শ্রমের সাম্যতা'ই বলি কোনটাই বোঝা সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে আসতে মানব জাতিকে একটা বিশাল সময় পার করতে হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা পরীক্ষা করছি কীভাবে বার্টার পদ্ধতি থেকে সাধারণ সমতুলের আবির্ভাব এবং বিকাশ ঘটলো ।

আমরা এতক্ষণ যা জানলাম তার মর্মকথা হলো : একদা সমাজে মোটের উপর কোন বিনিময়ের ঘটনার উপস্থিতি ছিল না, সেই অবস্থায় মানব জাতিকে কয়েক হাজার বছর পার করতে হয়েছে, এক সময় 'বিনিময়' শুরু হলো। ধীরে ধীরে পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল, সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে একটা বিনিময় পদ্ধতির বিকাশ ঘটলো, যার ফলে একটা পণ্য একের অধিক পণ্যের সাথে বিনিময় করা

সম্ভব হলো। পরবর্তী কোন এক সময় সাধারণ সমতুলের আবির্ভাব ঘটলো, সকল পণ্যকে একমাত্র একটা পণ্যের সাথে বিনিময়ের পথ ধরেই এই সাধারণ সমতুল গঠিত হলো এবং এর সাথে সংগতিপূর্ণ সামাজিক অবস্থা তৈরি হলো। আমরা এসব ঘটনার বিকাশধারা দেখেছি এবং এসব জানতে পেরেছি মূল্যের প্রাথমিক, সম্প্রসারিত এবং সাধারণ রূপের আলোচনার মধ্য দিয়ে।

'মূল্যের সাধারণ রূপ' হলো এমন মূল্য রূপ যার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এবং যার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। এখানে আমরা বিকাশ বলতে সেই প্রকৃতির বিকাশকে বুঝাচ্ছি, বিনিময় ব্যবস্থাকে যে অবস্থা শক্তিশালী ও গতিশীল করে।

অধ্যায় সাত

মূল্য রূপের 'আপেক্ষিক' এবং 'সমতুল্য' দিকের ক্রমবিকাশ

(Development of the Relative and Equivalent Aspects of the 'Form of Value')

আজকের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায়, রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার স্থায়ী সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্র, যারা সর্বোচ্চ মাত্রায় কেন্দ্রীভূত, সংহত, বিশাল এবং নির্মম আবার বিধ্বংসীও বটে। এসব কিছু বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে 'প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার', 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন' এবং 'সকলের জন্য গণতন্ত্র' কথাগুলো বলার মত বিরাট অসততা ও ভণ্ডামী আর কিছুই থাকতে পারে না। বুর্জোয়ারা তথাকথিত পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার উপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিরন্তন ও সর্বজনীন ব্যবস্থার প্রকাশস্বরূপ হিসেবে 'ঐশ্বরিকতা' আরোপ করতে চায়, যা মোটের ওপর তাদের সমরতান্ত্রিকতা, সামরিক ঔদ্ধত্ব, লুটেরা এবং গণহত্যাকারী চরিত্রকে গোপন করতে পারে না। লেনিন তার 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে যে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলছেন তা হল—'শাসক শ্রেণীর কোন সভ্য পার্লামেন্টের মাধ্যমে জনগণকে দমন ও দলন করবে, কয়েক বছর অন্তর তা একবার করে স্থির করা—এই হল বুর্জোয়া পার্লামেন্ট প্রথার প্রকৃত মর্মবস্তু, আর সেটা শুধু পার্লামেন্টারি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রতেই নয়, সর্বাধিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও।' তিনি আরও স্পষ্ট করতে বলছেন, 'আমেরিকা থেকে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স থেকে ব্রিটেন, নরওয়ে ইত্যাদি যে কোন পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশের কথাই ধরুন—এসব দেশে রাষ্ট্রের আসল কাজ-কারবার চলে পর্দার অন্তরালে এবং তা চালায় বিভিন্ন বিভাগ, সরকারি দপ্তর ও সেনাপতিমণ্ডলী। 'সাধারণ লোকদের' বোকা বানাবার বিশেষ উদ্দেশ্যে গলাবাজি করার জন্য পার্লামেন্টকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

–কম. পুষ্প কমল দাহাল প্রচন্ড, *রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র প্রসঙ্গে*, ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'জনযুদ্ধ'-এর ৯ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সিপিএন (এম) পার্টি পত্রিকা *WORKER-9* থেকে সংকলিত।

সমাজে মূল্যের যাত্রা শুরুর প্রাক স্তরে কোন বস্তুর, এখন আমরা যেভাবে বুঝি, কোন মূল্য ছিল না এবং মূল্য রূপের বিকাশ ধীরে ধীরেই ঘটেছে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে সমাজে মূল্য রূপের আবির্ভাব হঠাৎ ঘটেনি এবং আজকের এই পরিপূর্ণ রূপটা হঠাৎ পায়নি। শুরুতে মূল্য রূপ অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাথমিক একটা গঠন নিয়ে অবস্থান করছিল, সেখান থেকে এগিয়ে বিবর্তনের পথে কয়েকটা স্তর পেরিয়ে আজকের সর্বব্যাপ্ত সাধারণ রূপ পেয়েছে।

একটা বিনিময়ের ঘটনায় সব সময় ২টা পণ্য থাকে। ওই ২টা পণ্য দুই ধরনের অবস্থানে থাকে এবং ২ ধরনের ভূমিকা পালন করে। সেহেতু, যখন আমরা বলি মূল্য রূপের বিকাশ ঘটছে, এর অর্থ হয় মূল্য রূপের আপেক্ষিক এবং সমতুল্য দিকগুলোর বা বৈশিষ্ট্যরও বিকাশ ঘটছে।

আমরা এখন মূল্য রূপের আপেক্ষিক এবং সমতুল্য বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব।

১. মূল্যের প্রাথমিক রূপের স্তরে :

২০ মিটার কাপড়	= ১টা কোট
↑	↑
আপেক্ষিক দিক	সমতুল্য দিক

এখানে একটা পণ্যের কেবলমাত্র অন্য একটা পণ্যের সাথে বিনিময় ঘটছে। আপেক্ষিক অবস্থানে থাকা পণ্যের রয়েছে একটাই মাত্র সমতুল। এর অর্থ হয়, যে পণ্যটা আপেক্ষিক অবস্থানে রয়েছে সে তার মূল্য মাত্র একটা রূপেই প্রকাশ করছে। পণ্যটার দ্বিতীয় কোন মূল্য রূপ নাই।

যে পণ্যটা সমতুল্য অবস্থানে রয়েছে সে অন্য পণ্যটার মূল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে মাত্র একটা পণ্য-রূপেই দাঁড়িয়ে আছে।

২. মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের স্তরে :

২০ মিটার কাপড়	= ১টা কোট
	= ৮ জোড়া জুতা
	= ২ গ্রাম সোনা
	= ১০টা কলম
↑	↑
আপেক্ষিক দিক	সমতুল্য দিক

এখানে একটা পণ্যকে বিভিন্ন পণ্যের সাথে বিনিময় করা হচ্ছে। যে পণ্যটা রয়েছে আপেক্ষিক অবস্থানে, তার রয়েছে কয়েকটা সমতুল। এই পণ্যটা তার মূল্য কয়েকটা রূপে প্রকাশ করতে পারছে। এটা হচ্ছে আপেক্ষিক দিকের একটা বিকাশ।

সমতুল্য অবস্থানে থাকা পণ্যটা কেবলমাত্র একটা পণ্যের সমতুলের ভূমিকা রাখছে না, এখানে উল্লেখিত যেকোন পণ্যের সমতুলের ভূমিকা রাখতে পারছে। এটা হচ্ছে আপেক্ষিক দিকের একটা বিকাশ, যেটা এখানে আরও নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

৩. মূল্যের সাধারণ রূপের স্তরে :

১টা কোট =
৮ জোড়া জুতা =
২ গ্রাম সোনা = } ২০ মিটার কাপড়
২৫ কেজি শস্য =
১০টা কলম =

↑ আপেক্ষিক দিক ↑ সমতুল্য দিক

এখানে সকল পণ্যকে একই পণ্যের সাথে বিনিময় করা হয়। এখানে আপেক্ষিক অবস্থানে থাকা প্রত্যেকটা পণ্যের নিজস্ব কোন মূল্য রূপ নেই। সকল পণ্য তাদের মূল্য রূপ 'সমবেত ভাবে' একই মূল্য রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। এখানেও মূল্য রূপের বিকাশ ঘটছে, আর তাহলো আপেক্ষিক অবস্থানে থাকা সকল পণ্যের মূল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সমবেত ব্যবহার।

সমতুল অবস্থানে থাকা পণ্যটি একাই সকল পণ্যের সমতুল হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এর ফলে প্রাথমিক স্তর এবং সম্প্রসারিত স্তরের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণ সম্ভব হচ্ছে। এটা শুধুমাত্র একটা পণ্যের জন্য সমতুল নয়, যেমন প্রাথমিক স্তরে থাকে। অথবা এটা কেবলমাত্র একটা পণ্যের জন্য অনেকগুলো সমতুলের মধ্যে একটাই সমতুল হিসেবে ভূমিকা রাখছে না, যেমনটা সম্প্রসারিত স্তরে ঘটে। এখানে পণ্যটা বিভিন্ন পণ্যের জন্য একমাত্র সমতুল হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এটা হচ্ছে সমগ্র পণ্য জগতের জন্য একমাত্র সমতুল হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোন পণ্যের একটা গুণগত অর্জন। এটা হচ্ছে সমতুলের একটা বিকাশ।

প্রাথমিক স্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত থেকে পণ্যের আপেক্ষিক এবং সমতুল্য অবস্থানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিকাশ সমাজকে সম্প্রসারিত স্তরে এগিয়ে নেয়। পুনরায় সম্প্রসারিত স্তরে এই একই প্রকৃতির দ্বন্দ্ব নতুন রূপে উদ্ভূত হয়, সমাজ সাধারণ স্তরের দিকে এগিয়ে যায়।

আপেক্ষিক এবং সমতুল্য বৈশিষ্ট্যর মধ্যকার পার্থক্যের বিকাশ

পণ্যের মূল্য সমীকরণে উপস্থিত থাকে আপেক্ষিক এবং সমতুল্য এই দুই বৈশিষ্ট্য, এই দুই বৈশিষ্ট্য সর্বদাই একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে থাকে। যেহেতু এই দুই বৈশিষ্ট্য একই প্রকৃতির নয়, এদের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। পণ্য রূপ যত বিকশিত হতে থাকে এই পার্থক্য ততই পরিষ্কার ভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মূল্য রূপ এক স্তর থেকে আরেক স্তরে যত বিকশিত হতে থাকে, আপেক্ষিক এবং সমতুল্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যকার এই পার্থক্য তত তীব্র হতে থাকে।

মূল্যের প্রাথমিক স্তরে আপেক্ষিক এবং সমতুল্য অবস্থানে থাকা পণ্যর নিজ নিজ অবস্থান পরিবর্তন করলে কী ঘটে, আমরা এখন সেটা দেখবো।

২০ মিটার কাপড় = ১টা কোট – এটা হচ্ছে মূল্যের প্রাথমিক রূপ

পণ্যের এই অবস্থান পরিবর্তন করলে বিপরীত সমীকরণ আসবে, তখন কী ঘটে?

১টা কোট = ২০ মিটার কাপড় – এটাও মূল্যের প্রাথমিক রূপ

এখানে পণ্য দুটার অবস্থান এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নেওয়া হয়েছে, ফলে তাদের অবস্থানের চরিত্র এবং 'পার্থক্য' আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। তথাপি, মূল্যের প্রাথমিক রূপে এই বিপরীত সমীকরণ, পরিবর্তন করার আগের সমীকরণের মতো একই থেকে যাচ্ছে। এই সমীকরণে এই দুই সাংঘর্ষিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যকার পার্থক্য এমন নয় যে এটা সমীকরণের চরিত্র পাল্টে দিচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়ায় যে মূল্যের প্রাথমিক রূপে আপেক্ষিক এবং সমতুল্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যকার পার্থক্য যথেষ্ট স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু মূল্য রূপ প্রাথমিক স্তর থেকে সম্প্রসারিত স্তরে উত্তরিত হলে কীভাবে আপেক্ষিক এবং সমতুল্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যকার পার্থক্য বৃদ্ধি পায়, আমরা এখন সেটা দেখবো।

মূল্যের সম্প্রসারিত রূপের স্তরে :

২০ মিটার কাপড় $\left\{\begin{array}{l} = \text{১টা কোট} \\ = \text{৮ জোড়া জুতা} \\ = \text{২ গ্রাম সোনা} \end{array}\right.$

↑ আপেক্ষিক দিক ↑ সমতুল্য দিক

যদি আমরা এই সমীকরণকে পাল্টে দিই, তাহলে বিপরীত সমীকরণ আসবে :

$$\left.\begin{array}{l} \text{১টা কোট} = \\ \text{৮ জোড়া জুতা} = \\ \text{২ গ্রাম সোনা} = \end{array}\right\} \text{২০ মিটার কাপড়}$$

এটা হলো 'সাধারণ রূপ'।

'সম্প্রসারিত রূপ' পাল্টে দেওয়ার ফলে 'সাধারণ রূপ' আসল। এর অর্থ হয় এই যে সম্প্রসারিত রূপে আপেক্ষিক এবং সমতুল্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যকার পার্থক্য এত বড় হয় যে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো একে অপরের সাথে সামগ্রিক ভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। পণ্যের পূর্বেকার স্ব স্ব অবস্থান পাল্টে দিয়ে বৈশিষ্ট্যগুলোকেও পাল্টে দিলে, পার্থক্য এত বেশি সৃষ্টি হয় যে এর ফলে মূল্যের রূপেরই পরবর্তী স্তরে উত্তরণ ঘটে।

সাধারণ রূপ হচ্ছে সম্প্রসারিত রূপের একমাত্র বিপরীত রূপ। এভাবে সময়ের সাথে সাথে 'মূল্যের প্রাথমিক রূপ' রূপান্তরিত হয় 'মূল্যের সাধারণ রূপ'-এ, আর মূল্যের রূপে বিদ্যমান 'ঘাটতিগুলো' হারিয়ে যেতে থাকে এবং মূল্য রূপ 'পরিপূর্ণ রূপ' পেয়ে যায়।

সমাজে প্রাথমিক স্তর একটা সুদীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে, বিনিময় ব্যবস্থা বিস্তৃত, দ্রুত এবং গভীর হতে থাকে, এভাবে এক সময় সমাজটা সম্প্রসারিত স্তরে রূপান্তরিত হয়। শুরুতে সমাজে মাত্র কয়েক ধরনের পণ্য ছিল, তখন এক ধরনের পণ্যের সাথে অন্য আরেক ধরনের একটা পণ্যেরই বিনিময় ঘটতো, সেই সময়কালে সেটাই যথেষ্ট ছিল। সময় এগিয়ে চলে, বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উৎপাদন বাড়তে থাকে, ফলে আগের তুলনায় বিনিময়ের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন বেড়ে যায়, একটা পণ্যের বিনিময়ে কয়েক ধরনের পণ্যের প্রয়োজনও বেড়ে যায়, এভাবে এক সময় সম্প্রসারিত রূপের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু, এই স্তরেও কিছু ত্রুটি এবং ঘাটতি থেকে যায়, ফলে পণ্য জগতে নিরবচ্ছিন্ন বিনিময় ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে থাকে। এসব সমস্যা অতিক্রম করতে সমাজে এক সময় মূল্যের সাধারণ রূপের আবির্ভাব ঘটে, যা সাথে নিয়ে আসে 'সাধারণ সমতুল'-কে। এই সাধারণ সমতুল সর্বজনীন সমতুলই বটে, যার ফলে মূল্য রূপ ত্রুটিমুক্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

অধ্যায় আট

‘অর্থ’ রূপ
(‘Money’ Form)

বিংশ শতাব্দির বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের অভিজ্ঞতা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরবর্তীতে পার্টির সর্বহারা ও বিপ্লবী চরিত্র ধরে রাখা ও বিকশিত করা সামগ্রিকভাবে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসে দেখা যায় যে, সেই সব বিজয়ী পার্টিগুলো পার্টির ভেতরে ও বাইরে ডানপন্থী, বামপন্থী ও মধ্যপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত মতাদর্শগত সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং শ্রেণীযুদ্ধে নিপীড়িত-নির্যাতিত এবং অবহেলিত জনগণের স্বার্থ ও প্রয়োজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে দুনিয়া কাঁপানো বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দিয়ে লড়াই চালিয়ে পৃথিবীতে অভূতপূর্ব উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই একই পার্টি কেন রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরে আমলাতান্ত্রিক, সংশোধনবাদী এবং প্রতিবিপ্লবী পার্টিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এবং একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে? এটা আজ নিশ্চিতভাবে বলা যায়, চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব এই প্রশ্নের মৌলিক তাত্ত্বিক জবাব খোঁজার প্রকৃত কাজটিই করেছে। কিন্তু, প্রতিবিপ্লব প্রতিহত করতে এই মৌলিক তত্ত্বগুলোকে প্রণালীবদ্ধ কাঠামোয় সূত্রায়ন করে বিকশিত করা দরকার ছিল এবং এগুলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়ায় একটা সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাধীনে এনে একটি সাংগঠনিক তত্ত্ব এবং কর্মপদ্ধতি বিকশিত করা জরুরি ছিল। এটা করতে পারলে পরবর্তীতে সংঘটিত প্রতিবিপ্লবকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করা সম্ভব হত, যা বর্তমান সময়েও অভ্রান্ত, সেহেতু আজও তা সমানভাবে গ্রহণীয়। প্রকৃত সমস্যাটা মূলত দলের মধ্যে দুই লাইনের সংগ্রাম চালানো এবং সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনে নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবী রূপান্তরের তত্ত্বের বিকাশ এবং তার সঠিক প্রয়োগের সমস্যা।

–নেপালের সিপিএন (মাওবাদী) পার্টির দলিলের *‘ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং একুশ শতকে গণতন্ত্রের বিকাশ প্রসঙ্গে’*-এর অংশ, *THE WORKER*-৯ (২০০৪-এর ফেব্রুয়ারি) থেকে সংকলিত।)

পণ্য জগতে কোন পণ্য যখন ‘সাধারণ সমতুল’-এর ভূমিকা পালন করে, ওই পণ্যটা হয়ে দাঁড়ায় ‘অর্থ পণ্য’ অথবা ‘অর্থ’।

কাপড় যখন সাধারণ সমতুল, কাপড় নিজেই হয়ে দাঁড়ায় – – অর্থ
রূপা যখন ” রূপা ” – – অর্থ
সোনা যখন ” সোনা ” – – অর্থ

অর্থ হয়ে ওঠা একটা পণ্যের সাধারণ বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়। এটা হলো একটা সামাজিক বৈশিষ্ট্য। এর মানে হয়, ওই পণ্যটা অর্থ হিসেবে দাঁড়িয়ে সকল পণ্যের সাথে মূল্য-সম্পর্ক সূত্রে জড়িত হয়ে একটা ‘সামাজিক ভূমিকা’ পালন করে যায়।

আজকের দিনে এটা হলো সোনা এবং অনেক ক্ষেত্রে রূপাও, পণ্যের জগতে যা সাধারণ সমতুল হিসেবে ভূমিকা রাখছে। যখন পণ্য জগতে সাধারণ সমতুল

গঠিত হয়ে গেল, সেই মুহূর্ত থেকেই সোনা সাধারণ সমতুলের ভূমিকায় এসে গেছে, বিষয়টা মোটেই এমন নয়। সোনা সাধারণ সমতুলের ভূমিকায় আসার আগেই একটা বড় সংখ্যক পণ্য সাধারণ সমতুলের ভূমিকা পালন করে গেছে। তবে সেই কাল পরিধিতে ওসব পণ্য সীমিত সংখ্যক পণ্যের জন্য সাধারণ সমতুলের ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। একটা নির্দিষ্ট কাল পরিধিতে শস্য, গবাদি পশু, পিতল, তামা এবং এমন অনেক ধরনের পণ্য সাধারণ সমতুলের ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি একটা সময়ে দাসদেরকেও অর্থ পণ্যের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। কয়েকটা নির্দিষ্ট পণ্যের সাময়িক ভাবে 'সমবেত ভূমিকা' পালনের কারণে কোন কোন সময় একটা পণ্য বা অন্য আরেকটা পণ্যকে 'অর্থ' হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। আবার একটা সময়ের ব্যবধানে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে।

অর্থের ভূমিকায় থাকা ওই পণ্যের পরিবর্তন ঘটেছে যখন বিভিন্ন ধরনের পণ্যের সংখ্যা এবং তাদের বিনিময়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

অনেক সময় মূল্যের বিবেচনায় অধিক মূল্যের পণ্যের সাথে যেমন, তেমনি কম মূল্যের পণ্যের সাথে অর্থকে বিনিময়ের ঘটনায় যেতে হয়েছে। সেহেতু, যে পণ্যকে অর্থের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে, তাকে নিজ থেকে ক্ষুদ্র খণ্ডাংশে বিভক্ত হতে হয়েছে, আবার কখনও গোটা হিসেবে ভূমিকা রাখতে ওসব খন্ডাংশকে একত্রিত হতে হয়েছে। অর্থ পণ্যকে গঠনগত দিক থেকে কম পরিমাণের হয়ে অধিক মূল্য প্রকাশে সক্ষম হতে হয়েছে। এর অর্থ হয় এই যে এমনকি অধিক মূল্য প্রকাশের সক্ষমতা নিয়ে একে কম ওজনের হতে হয়েছে। একে কম জায়গা দখল করে থাকার মতো গাঠনিক রূপ পেতে হয়েছে। একটা দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষিত রাখা হলেও যাতে এটা অক্ষয় থাকে এমন একটা বস্তুগত গঠন একে পেতে হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে অর্থ হিসেবে ভূমিকা পালন করে টিকে থাকার প্রয়োজনে ধাতব পদার্থ যেমন – পিতল, তামা, এবং সোনা অধিক উপযুক্ত হিসেব মূল্যায়িত হয়েছে, শস্য এবং গবাদি পশুর তুলনায়। এমনকি এসব ধাতুর মধ্যে পিতল এবং তামার চেয়ে সোনা এবং রূপা বেশি উপযুক্ত অবস্থানে এসে গেছে।

তামা ব্রোঞ্জের চেয়ে অধিক মূল্যবান, কারণ তামা উৎপাদনে তুলনায় শ্রম বেশি লাগছে। এই বিবেচনায় রূপা আবার তামার চেয়ে বেশি মূল্যবান এবং সোনা রূপার চেয়ে বেশি মূল্যবান। যখন অর্থের সাথে একটা পণ্যের বিনিময় ঘটে, তামার তৈরি অর্থের পরিমাণ পিতলের তৈরি অর্থের পরিমাণের চেয়ে কম লাগে; রূপার তৈরি অর্থের পরিমাণ তামার তৈরি অর্থের চেয়ে আরও কম হবে এবং সোনার তৈরি অর্থের পরিমাণ রূপার তৈরি অর্থের চেয়ে আরও বেশি কম হবে। একটা নির্দিষ্ট কালপর্যায়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ওই ধাতুটা অর্থ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে কি-না এটা নির্ভর করে, কী কী ধরনের পণ্য তৎকালীন সমাজে উৎপাদিত হচ্ছে এবং তাদের

মূল্যের মান কোন্ পর্যায়ে রয়েছে। সময় এগিয়ে চলে, বিনিময়ের কাজকে গতিশীল এবং সাবলীল করতে 'অর্থের ভূমিকায়' থাকা কম মূল্যমানের ধাতু অধিক মূল্যমানের ধাতু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়।

অন্যান্য ধাতুর তুলনায় টাকার ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে রূপা এবং সোনার রয়েছে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য; সোনার রয়েছে বেশি বৈশিষ্ট্য। এসব কারণে বিনিময় ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সঙ্গতি রেখে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সোনা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে; যদিও বিনিময়ের ইতিহাসে কিছু পণ্য অর্থের ভূমিকায় কোন কোন সময় এসেছে। সোনা যখন নিতান্তই একটা পণ্য হিসেবে থাকে তখন সে অর্থ নয়। এটা অর্থের ভূমিকায় যায় শুধুমাত্র যখন সাধারণ সমতুলের অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে।

যাযাবর জনগোষ্ঠীই প্রথম অর্থ রূপের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এসব জনগোষ্ঠীর কোন স্থায়ী বসবাসের এলাকা থাকে না, জীবন এদের একখান থেকে আর একখানে বহতা নদীর মতো চলতে থাকে। এসব জনগোষ্ঠীর জীবনের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের প্রকৃতিই হচ্ছে সহজে স্থানান্তরযোগ্য, যেমন গবাদিপশু। যখনই তাদের বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা দেয়, তারা অর্থ হিসেবে গবাদিপশু বা এই ধরনের অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করে। অর্থ এভাবেই জীবন শুরু করেছে এবং সব শেষে সোনাই এই স্থানে চলে এসেছে।

এই পর্যন্ত দেওয়া উদাহরণে আমরা কাপড়কে সমতুল হিসেবে রেখেছি, এখন থেকে আমরা এর পরিবর্তে সোনাকে উল্লেখ করবো।

এখন থেকে সোনা -- সাধারণ সমতুল
সোনা -- অর্থ

সোনা ব্যতীত অন্য সকল পণ্য হচ্ছে সাধারণ পণ্য, অর্থাৎ এমন পণ্য যেগুলো 'অর্থ' নয়। যদি সাধারণ সমতুলের অবস্থানে একটা পণ্যের পরিবর্তে অন্য একটা পণ্য প্রতিস্থাপিত হয়, এমন পরিবর্তনের জন্য সাধারণ সমতুলের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। সমতুল হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে পণ্যটা, তার রূপ গঠন করে মূল্যের সাধারণ রূপ; এটা নিজেই তখন অর্থ রূপ হয়ে যায়।

আমরা একে 'সাধারণ সমতুলের রূপ', 'মূল্যের সাধারণ রূপ' অথবা 'অর্থ রূপ' নাম দিতে পারি, তবে এই তিনটা নামের অর্থ একই। যখনই আমরা অর্থের কথা বলি, আমাদের 'সাধারণ সমতুল'-এর কথা স্মরণ করতে হবে।

১. 'অর্থ' সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় (Points concerning 'money')

১. এখন সোনা যেহেতু সমতুলের অবস্থানে এসে গেছে, কাপড় যা এতদিন ওই অবস্থানে ছিল, এখন আপেক্ষিক অবস্থানে চলে গেল। এখন কাপড়কেও তার

মূল্য সোনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হচ্ছে। সোনা এখন আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তে সমতুলের অবস্থানে দাঁড়ালো। যখন বিভিন্ন পণ্যের সাথে এর বিনিময় ঘটে, অধিক মূল্যের পণ্যের জন্য এটা বড় একটা টুকরা হিসেবে চলে এবং কম মূল্যের পণ্যের জন্য ছোট টুকরা হিসেবে চলে।

২. পণ্য জগতে অর্থের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বার্টার পদ্ধতিতে বিনিময় সংঘটিত হতো। বার্টার পদ্ধতি বিদায় নিল যখন সকল পণ্যের জন্য সাধারণ সমতুল প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। কিন্তু, বার্টার পদ্ধতি সোনার ক্ষেত্রে চালু থাকলো, যে সোনা হচ্ছে সাধারণ সমতুল। যেহেতু সোনার মূল্য রূপ হলো একমাত্র মূল্যের সম্প্রসারিত রূপ, সোনার মূল্য তাই একমাত্র বার্টার পদ্ধতির বিনিময়ের মাধ্যমেই জানা সম্ভব।

৩. আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে যদি আমরা একটা চেয়ার দিয়ে একটা কম্বল নিই, তখন কম্বলটা হয়ে দাঁড়ায় চেয়ারের মূল্য এবং কম্বলের রূপটা হয়ে দাঁড়ায় চেয়ারের মূল্য। কিন্তু, যদি আমরা চেয়ারটা দিয়ে কিছু অর্থ (একটা সোনার টুকরা) নিই, তখন সেই অর্থ হয়ে দাঁড়ায় চেয়ারের মূল্য। এখানে ওই অর্থ রূপটা দাঁড়িয়ে যায় চেয়ারের মূল্য রূপ হিসেবে। কিন্তু, যে মূল্য অর্থের মাধ্যমে এখানে প্রকাশিত হলো তার একটা বিশেষ নাম আছ, আর সেই নামটা হলো 'দাম' (price)। যখন কোন পণ্য অর্থের সাথে বিনিময় করা হয়, ওই পণ্যটার পরিবর্তে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, সেটাই হলো ওই পণ্যের 'দাম'। যদি কাপড়কে সোনার সাথে বিনিময় করা হয়, কাপড়ের পরিবর্তে সোনার যে টুকরাটা পাই তাই হলো কাপড়ের দাম।

ধরে নিলাম, প্রতি ২০ মিটার কাপড়ে ১ ঘন্টার শ্রম আছে এবং ২ গ্রাম সোনায়ও ১ ঘন্টার শ্রম আছে। যখন আমরা ২০ মিটার কাপড়কে সোনার সাথে বিনিময় করবো, কাপড়ের পরিবর্তে আমরা ২ গ্রাম সোনা পেয়ে যাব। এভাবে ২০ মিটার কাপড়ের দাম হয়ে দাঁড়ায় ২ গ্রাম সোনা।

৪. ধরা যাক, ২০ মিটার কাপড়ের সাথে সোনা বিনিময় করে আমরা ২ গ্রাম সোনা পেলাম। এখন আমরা এই ২ গ্রাম সোনাকে সমান ২ টুকরা করে দুটা মুদ্রা বানালাম এবং প্রতিটা মুদ্রার নাম দিলাম এক 'টাকা'। এভাবে দুটা মুদ্রা হয়ে গেল দুই টাকা। এখন কাপড়ের দাম হলো ২ টাকা (সোনা-টাকা– gold-taka)। এই দুই টাকা ২ গ্রাম সোনা থেকে তৈরি হলো। এর অর্থ হলো, ২ টাকায় থাকা মোট শ্রম সময় এবং কাপড়ে থাকা মোট শ্রম সময় পরিমাণে একই। এই কারণে কাপড়ের পরিবর্তে ২ গ্রাম সোনা এসে যায়। আমরা সব মুদ্রা (এখানে ২টা) পেয়ে গেলাম যেগুলো ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছে।

ওই ২ গ্রাম সোনা দিয়ে ২টা মুদ্রার পরিবর্তে যদি ১টা মুদ্রা তৈরি হতো, এটা হতো ২ টাকার একটা মুদ্রা। তখনও কাপড়ের দাম হতো ২ টাকা।

টাকা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থের নাম, প্রত্যেকটা দেশের অর্থের নিজস্ব নাম আছে।

কয়েকটা পণ্যের দাম টাকায় এমন হতে পারে :

২০ মিটার কাপড়ের দাম	= টাঃ ২০০.০০
১২ কেজি শস্যের দাম	= টাঃ ৩৫০.০০
৯টা কলমের দাম	= টাঃ ৪৫.০০
১টা রুটির দাম	= টাঃ ৫০.০০

৫. ধরে নিলাম, সোনা এখনও সাধারণ সমতুল হিসেবে আবির্ভূত হয়নি এবং সকল বিনিময় বার্টার পদ্ধতিতে হচ্ছে। তখন কাপড়কে সোনার সাথে বিনিময় করলে আমরা ২ গ্রাম সোনা পাব। ওই সোনা এখানে পণ্যের দাম হবে না, কারণ সোনা তো 'অর্থ' নয়।

ধরা যাক, বার্টার পদ্ধতিতে একটা কম্বল এবং একটা চেয়ারের মধ্যে বিনিময় ঘটেছে। আমরা জানি যে একটা জিনিসের মূল্য দ্বিতীয় জিনিটার রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এখানে 'মূল্য'-কে কি আমরা 'দাম' বলতে পারি?

কম্বল কি চেয়ারের 'দাম' গঠন করে?
চেয়ার কি কম্বলের 'দাম' গঠন করে?

এখানে আমরা 'দাম' এই নামটা ব্যবহার করতে পারছি না। কারণ, যখন পণ্যকে একমাত্র অর্থের সাথে বিনিময় করা হয় এবং বিনিময়ের পর 'এই পরিমাণ টাকা' হিসেবে একমাত্র অর্থ পাই, তখন এটা হবে 'দাম'। যখন একটা জিনিসের পরিবর্তে আর একটা জিনিস পাই, ওই জিনিসটার নাম হয় 'মূল্য' তবে 'দাম' নয় ।

একমাত্র অর্থের মাধ্যমে মূল্য প্রকাশিত হলে	– সেটা হবে 'দাম'
মূল্যের প্রকাশ অর্থের মাধ্যমে হলে	– সেটা হবে 'দাম'

৬. এখন পর্যন্ত আমরা 'ক্রয়' এবং 'বিক্রয়' শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করি নাই; কেবলমাত্র 'বিনিময়' শব্দটা ব্যবহার করেছি। আমরা যখন অর্থের সাথে জিনিসের বিনিময় শুরু করলাম, কেবলমাত্র তখন থেকে 'ক্রয়' এবং 'বিক্রয়' শব্দ ব্যবহার শুরু হলো। যেহেতু আমরা এখন শুধু 'অর্থ' দেখি, এখানে ওই শব্দগুলো ব্যবহারের প্রয়োজন আর থাকছে না।

ধরে নিলাম, একটা চেয়ার এবং ৫০০.০০ টাকার মধ্যে একটা বিনিময়ের ঘটনা ঘটলো। যদি এই ঘটনাকে চেয়ারের দিক থেকে দেখি, এটা হবে একটা চেয়ার 'বিক্রি'; যদি অর্থের দিক থেকে ঘটনাকে দেখি, এটা হবে একটা 'ক্রয়'।

এর মানে হয় 'ক্রয়' এবং 'বিক্রয়' শব্দ দুটো অর্থের সাথে নয় জিনিসের সাথে সম্পর্কিত। যখন কোন ব্যক্তি একটা চেয়ার দিয়ে টাকা নেয়, এটার অর্থ এমন হয় কি যে আমরা চেয়ার বিক্রয় করলাম এবং অর্থ কিনলাম? এর একমাত্র অর্থ হয় 'চেয়ার বিক্রয়'। এর কোন দ্বিতীয় অর্থ থাকে না।

তদ্রূপ, যখন কোন ব্যক্তি টাকা দিয়ে একটা চেয়ার নিল, এটার অর্থ কি এমন হয় যে টাকা বিক্রি করলাম এবং চেয়ার কিনলাম? এর একমাত্র অর্থ হয় 'চেয়ার ক্রয়'। এর কোন দ্বিতীয় অর্থ থাকে না।

সেহেতু 'ক্রয়' এবং 'বিক্রয়' শব্দ দুটোর মানে হলো 'জিনিস ক্রয়' এবং 'জিনিস বিক্রয়', কিন্তু 'অর্থ ক্রয়' বা 'অর্থ বিক্রয়' নয়।

৭. জিনিস এবং টাকার মধ্যেকার বিনিময়ের এই বিশেষ ঘটনা হলো হয় ক্রয় না হয় বিক্রয়। সেহেতু বলা যায়, 'ক্রয়' এবং 'বিক্রয়' শব্দ দুটোর ব্যবহার শুরু হলো জিনিসের বিনিময় অর্থের মাধ্যমে শুরুর কালপর্যায় থেকে। বার্টার পদ্ধতির সময়ে এই শব্দ দুটো ছিল না।

ধরে নিলাম, বার্টার পদ্ধতিতে একটা চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হলো। যদি আমরা এই বিনিময়কে চেয়ারের দিক থেকে দেখি, এটা হবে চেয়ার দেওয়া এবং কম্বল নেওয়া। কিন্তু চেয়ার বিক্রয় এবং কম্বল ক্রয় নয়। আমরা ঘটনাচিত্র একই ধারার দেখব, যদি আমরা কম্বলের দিক থেকে দেখি।

৮. বর্তমানের জন্য যখনই আমরা 'টাকা' কথাটা বলি, এর দ্বারা আমরা অর্থ করি একমাত্র সোনা-টাকার, কিন্তু কাগজের কারেন্সি নয়। সমাজে বর্তমান সময়ে সরকার অর্থ তৈরির এবং এর অবমুক্তির কাজটা সম্পাদন করে থাকে। এই কার্যক্রমটা এমন ধরনের : একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা রাখা হয় একটা একক হিসেবে, একে সমান অংশে হিসেব মতো অসংখ্য ভাগে ভাগ করা হয় এবং ওই খণ্ডিত ক্ষুদ্র এককের একটা নাম দেওয়া হয়, এসব কাজ 'সরকারি' ভাবে সম্পাদন করা হয়।

৯. ওজনের এককের নাম আউন্স, পাউন্ড, গ্রাম ইত্যাদি। তামা, রূপা এবং সোনার মতো ধাতুকে ওজনের জন্য একটা নাম দেওয়া হয়েছিল, এটা হয়েছিল এমন কি যখন এগুলো অর্থ-পণ্য হয়ে ওঠেনি। যখন ইংল্যান্ডে রূপা অর্থ-পণ্য হয়ে ওঠল, সরকার এক পাউন্ড ওজনের রূপা দিয়ে একটা মুদ্রা বানালো এবং এর নাম দিল 'পাউন্ড'। সুতরাং, প্রথম ইংরেজি-ভাষী দেশ হিসেবে ইংল্যান্ডে অর্থের নাম দেওয়া হলো পাউন্ড।

যখন আমরা বলি ১টা কোটের দাম ২ পাউন্ড, এর মানে হয় ২ পাউন্ড ওজনের রূপা। যখন সোনা অর্থ-পণ্য হিসেবে রূপার স্থান দখল করলো, স্বর্ণ মুদ্রাকেও পাউন্ড নামে ডাকা হলো। কিন্তু তখন এই স্বর্ণ মুদ্রার ওজন কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু সোনার দাম রূপার চেয়ে বেশি, তাই সরকার স্বর্ণ মুদ্রার পাউন্ডের ওজন আগের রূপার পাউন্ডের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ কমিয়ে দিল, তবে নাম পাউন্ড রেখে। রূপা অর্থ-পণ্য

থাকার সময়ে যে মুদ্রা ১ পাউন্ড হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছিল, সোনা যখন অর্থ-পণ্য হিসেবে বাজারে আসলো, ১ পাউন্ড ১৫ পাউন্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

আমরা কেবলমাত্র নাম থেকে কোন জিনিসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি না। আমরা কোনও ব্যক্তির নাম বিনয় থেকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারি না। একই ভাবে টাকা, পাউন্ড এবং ডলার এমন সব নাম থেকে আমরা অর্থের মূল্য এবং ওজনসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারি না। আমাদের এসব বিষয় সুনির্দিষ্ট ভাবে বিস্তারিত জানতে হবে।

১০. 'দাম' হলো কোন পণ্যের মূল্যকে অর্থের পরিমাপে প্রকাশ করা, এই 'অর্থ'র সাধারণ পণ্যের মতো কোন দাম থাকে না, অর্থের থাকে কেবলমাত্র মূল্য। যখন কেউ প্রশ্ন করে ১০০.০০ টাকার দাম কত হয় : "১০০.০০ টাকার দাম ১০০.০০ টাকা মাত্র।" ২ টাকার দামও মাত্র ২ টাকা অথবা ২০০.০০ টাকার দামও মাত্র ২০০.০০ টাকা। অর্থের দাম দেখাটা অর্থহীন, যেহেতু টাকার দাম একমাত্র টাকার মাধ্যমে পরিদৃষ্ট হয়। আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি : '১০০.০০ টাকার মূল্য কত?' ওই মূল্য বিভিন্ন পণ্যের মাধ্যমে হাজির হয়। ১০০.০০ টাকায় যে পরিমাণ শস্য আমরা পাই সেটাই তার মূল্য অথবা যে পরিমাণ কাপড় আমরা পাই সেটাই তার মূল্য। এভাবে ১০০.০০ টাকার মূল্য বিভিন্ন পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

'টাকা' হচ্ছে সোনা যা রয়েছে মুদ্রা রূপে। অর্থ-পণ্য (money-commudity) হচ্ছে সোনার দলা বা পিণ্ড। ধরে নিলাম, ১০০.০০ টাকার মুদ্রায় ১ গ্রাম সোনা আছে। যদি আমরা ১ গ্রাম সোনার একটা দলা নিয়ে ওটা দেখে বলি 'এটার মূল্য কত', আমরা বলতে পারি : "১ গ্রাম সোনার দাম =১০০.০০ টাকা"। কিন্তু, যেহেতু ১০০.০০ টাকার মুদ্রায় ১ গ্রাম সোনা আছে, ১ গ্রাম সোনার দাম হবে ১ গ্রাম সোনা। সেহেতু, সোনার দলার (money-commudity) মূল্য দেখাটাও হবে অর্থহীন। সেহেতু, সোনা অথবা সোনার তৈরি টাকার মুদ্রার কোন দাম থাকে না, কিন্তু তাদের থাকে একমাত্র মূল্য।

যদি আমরা ১ গ্রাম সোনা দিয়ে ১০ মিটার কাপড় পাই, ১ গ্রাম সোনার মূল্য (১০০.০০ টাকার মূল্য) = ১০ মিটার কাপড়। যদি আমরা সোনার মূল্য শস্য দিয়ে দেখতে চাই, ওটা হবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য। যদি আমরা চিনির মাধ্যমে দেখতে চাই, ওটা হবে কিছু পরিমাণ চিনি। নিচের দামের তালিকাটা আমরা দেখতে পারি :

২০ মিটার কাপড় = ২০০.০০ টাকা
১২ কেজি শস্য = ১০০.০০ টাকা
৯টা কলম = ৩০০.০০ টাকা
১ জোড়া জুতা = ৫০.০০ টাকা

..... = ...

..... = ...

যদি আমরা তালিকাটাকে পাল্টে দিই, তখন আমরা অর্থের মূল্য কত সেটা দেখতে পারবো।

২০০.০০ টাকার জন্য = ২০ মিটার কাপড়

১০০.০০ টাকার জন্য = ১২ কেজি শস্য

৩০০.০০ টাকার জন্য = ৯টা কলম

৫০.০০ টাকার জন্য = ১ জোড়া জুতা

এই তালিকা থেকে ১০০.০০ টাকার মূল্য এমন হবে :

১০০.০০ টাকা = ১০ মিটার কাপড়

১০০.০০ টাকা = ১২ কেজি শস্য

১০০.০০ টাকা = ৩টা কলম

১০০.০০ টাকা = ২ জোড়া জুতা

এভাবে অর্থের মূল্য অন্যান্য পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু, আমরা জানি কোন পণ্যের মূল্য অর্থের মাধ্যমে এভাবে প্রকাশিত হয় না। সেহেতু, আমরা একে দেখতে পাই শুধুমাত্র অন্যান্য পণ্যের মাধ্যমে।

১১. যদি সোনার উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন ঘটে এবং সেজন্য ১ গ্রাম সোনা তৈরির প্রয়োজনীয় শ্রম সময়ের পরিবর্তন ঘটে, তখন সোনার মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে। তখন সোনার মুদ্রার সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন পণ্যের পরিবর্তে যে সংখ্যক সোনার মুদ্রা একজন পাচ্ছিল তারও পরিবর্তন ঘটে। যদি সোনার মূল্য দ্বিগুণ হয়, আগে যেখানে ১ গ্রাম স্বর্ণমুদ্রা লাগছিল এখন লাগবে অর্ধ গ্রাম স্বর্ণমুদ্রা। আর যদি সোনার মূল্য কমে অর্ধেক হয়, আগে যেখানে ১ গ্রাম স্বর্ণমুদ্রা লাগছিল এখন লাগবে ২ গ্রাম স্বর্ণমুদ্রা। এর অর্থ হলো এই যে যদি সোনার মূল্যের পরিবর্তন ঘটে, সকল পণ্যের দামেরও পরিবর্তন ঘটে। যদি মূল্য-তালিকার সকল পণ্যের দাম অর্ধেকে নেমে আসে, সোনার মূল্য দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আর তালিকার পণ্যের দাম যদি দ্বিগুণ হয়, তখন সোনার মূল্য অর্ধেকে নেমে আসে। যদি পণ্যের দামের পরিবর্তন ভিন্ন কারণে ঘটে, তবে ওই কারণে এদের মূল্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু এসব পরিবর্তন সোনার কারণে ঘটেনি। এর কারণ হলো : যদি সোনার মূল্যের পরিবর্তন ঘটে, এর প্রভাবে সকল পণ্যের দামের পরিবর্তন সমভাবে প্রকাশিত হবে। দাম প্রায় একই হারে বাড়বে কিংবা কমবে। দামের পরিবর্তন বিভিন্ন ভাবে ঘটতে পারে, সোনার দিক থেকে ঘটতে হবে বিষয়টা এমন নয়।

সোনার মূল্যের পরিবর্তনের কারণে যদি পণ্যের দামের পরিবর্তন ঘটে, দামের এই প্রকৃতির পরিবর্তনকে মোটের উপর কোন পরিবর্তন হিসেবে গণ্য হয় না। এর

কারণ হলো পরিবর্তনটা সকল পণ্যে একই ভাবে ঘটছে। যদি মূল্যের পরিবর্তন সকল পণ্যে সমতালে ঘটে তখন পরিবর্তনটা কোন পরিবর্তন না-ঘটার অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের মূলত সোনার মূল্যের পরিবর্তনের কারণে পণ্যের মূল্যের কোন্ প্রকৃতির পরিবর্তন কীভাবে ঘটে, তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্যকভাবে বুঝতে হবে। ধরে নিলাম, সোনার নতুন নতুন খনি আবিষ্কারের ফলে সোনার উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে, এক ইউনিট সোনার মূল্য কমে অর্ধেকে নেমে এসেছে। এই কারণে আমরা দেখতে পাব পণ্যের দাম এমন বেড়েছে যে আগের ১ স্বর্ণমুদ্রার জায়গায় এখন ২ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে। এই মূল্য-বৃদ্ধির কারণ কী? 'সোনার দাম কমাটাই কি' – উত্তরটা কি সঠিক? 'অথবা সোনার উৎপাদন বৃদ্ধি কি' – উত্তরটা কি সঠিক? 'ডায়মন্ডের দাম কেন বেশি?' – এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ হিসেবে আমরা বলেছি, 'ডায়মন্ড উৎপাদনের সাথে জড়িত রয়েছে বেশি শ্রম'। তবে ডায়মন্ড কম পাওয়া যায় সেজন্য নয়'। আমরা শ্রমকে একমাত্র কারণ হিসেবে দেখিয়েছি। তদ্রূপ, এখানে সোনার ক্ষেত্রেও আমাদের উত্তর হবে একই যুক্তিধারায়, অর্থাৎ শ্রমের প্রেক্ষাপটে। 'পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন?' – এর সঠিক উত্তর হবে : এক ইউনিট সোনা উৎপাদন খরচ পূর্বের তুলনায় আনুপাতিক হারে কমে গেছে। উত্তর এটা হবে না : "সোনার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে"। কোন যুক্তির ভিত্তিতে ঘটনাধারা এভাবে ঘটছে, তা জানতে হলে আমাদের জানতে হবে 'অর্থ একমাত্র তার মূল্যের মাধ্যমে অর্থ হিসেবে কাজ করে'। বিষয়টা এই দৃষ্টিকোণ থেকে জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২. 'মূল্য'-কে 'মূল্য রূপ' হিসেবে দেখার ক্ষেত্রে, আমাদেরকে যেতে হয় 'অর্থ রূপ'-এ। অর্থ তার নিজস্ব রূপ পায় না মুদ্রা রূপ না পাওয়া পর্যন্ত।

"মূল্যের নিজস্ব রূপ" কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য হলো এটা এমন একটা রূপ যা কোন 'ব্যবহার-মূল্যে'র সাথে সম্পর্কিত নয়; মুদ্রা-রূপ হচ্ছে এমনই এক রূপ।

মুদ্রা-রূপ হচ্ছে এমন একটা বিশেষ রূপ, যাকে বোঝা যাবে যদি আমরা কোন পণ্যের অন্যান্য সাধারণ পণ্যের সাথে বিনিময় এবং মুদ্রার সাথে বিনিময়ের মধ্যকার পার্থক্যকে বুঝি বা দেখতে পাই।

ধরে নিলাম, একটা চেয়ারকে একটা কম্বলের সাথে বিনিময় করা হলো। তখন কম্বলটা হয়ে দাঁড়াবে চেয়ারের মূল্য। ওই 'কম্বলটা'র থাকবে ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময় মূল্য। ব্যবহার মূল্য হচ্ছে ওই কম্বলের উপযোগিতা এবং বিনিময় মূল্য হচ্ছে ওই চেয়ারটা। সেজন্য আমরা বলি, চেয়ারের মূল্য অস্তিত্বশীল হয় কম্বলের মূল্য বরাবর। যে ব্যক্তি চেয়ারটা দিয়ে কম্বলটা নিচ্ছে, সে কম্বলের ব্যবহার-মূল্য অথবা মূল্য (বিনিময় মূল্য) যে-কোনটা ব্যবহার করতে পারে।

একই ভাবে যদি চেয়ারকে পিতলের পাত্রের সাথে বিনিময় করা হয়, তাহলে ওই পিতলের পাত্র হয়ে ওঠবে চেয়ারের মূল্য। যদি একটা শার্টের সাথে চেয়ারের বিনিময় ঘটে,ওই শার্টটা হবে চেয়ারের মূল্য। ওই শার্টের একটা ব্যবহার-মূল্য থাকবে।

একই ভাবে যদি চেয়ারকে যেকোন সাধারণ পণ্যের সাথে বিনিময় করা হয়, চেয়ারের মূল্য সংযুক্ত থাকবে ওই জিনিসটার ব্যবহার-মূল্যের সাথে।

ধরে নিলাম, চেয়ারকে বিনিময় করা হচ্ছে কোন সাধারণ পণ্যের সাথে নয় 'অর্থ-মুদ্রা'র সাথে। এখানে ওই অর্থ মুদ্রার কী ব্যবহার-মূল্য থাকছে? এর কোন ব্যবহার-মূল্য থাকে না। আমরা ওই 'মুদ্রা' দিয়ে কী কাজ করবো? এটা কীভাবে কাজে আসবে? আমরা মুদ্রা দিয়ে যে-কোন পণ্য পেয়ে যাব। আমরা যদি এই মুদ্রা আবার ব্যবহার করি তাহলে একই ঘটনা ঘটবে। যেকোন সংখ্যক বার আমরা মুদ্রাকে ব্যবহার করতে পারি, এটা কেবলমাত্র পণ্যের সাথে বিনিময়ের কাজেই লাগবে।

এটা সম্ভব নয় মুদ্রার ব্যবহার-মূল্যকে এমন ভাবে কাজে লাগানো, যেভাবে আমরা চেয়ারে বসে এটার ব্যবহার মূল্যকে এবং কম্বল দিয়ে শরীর ঢেকে এর ব্যবহার-মূল্যকে কাজে লাগাই। যদি মুদ্রার কোন ব্যবহার-মূল্য থেকে থাকে, সেটা আর কিছুই নয় একমাত্র 'মূল্যের কাজটা করে দেওয়া'। এর অর্থ হলো মুদ্রার 'ব্যবহার-মূল্য' অথবা 'মূল্য' উভয়ের মানে একই, আর সেটা হলো **'মূল্য হয়ে ওঠা'**।

'মূল্য হয়ে ওঠার এই বৈশিষ্ট্য' কেবলমাত্র মুদ্রারই থাকে না, প্রত্যেকটা পণ্যেরও থাকে। কিন্তু, সাধারণ পণ্যের এই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 'মূল্য'র সাথে 'ব্যবহার-মূল্য' এই বৈশিষ্ট্যটাও থাকে, মুদ্রার এটা থাকে না। আমরা যদি কোন মুদ্রাকে গলানোর পর পাওয়া সোনা দিয়ে একটা গহনা তৈরি করি, কেবলমাত্র তখন এটার ব্যবহার-মূল্য থাকবে, কিন্তু মুদ্রার যে মূল্য রূপ সেটা আর থাকে না।

একটা মুদ্রা নিজেও একটা জিনিস। কিন্তু এই জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে এ থেকে মূল্য রূপ পাওয়ার জন্য, তাই এ থেকে আমরা অন্য যে-কোন পণ্যের মতো ব্যবহার-মূল্য পাবো না। মুদ্রার কাজই হলো অন্য পণ্যের সাথে বিনিময়ে যাওয়া, তাই যে পণ্যের সাথে এটা বিনিময় করা হয়, এটা সেই পণ্যের 'মূল্য রূপ' হিসেবে থেকে যায়। এর অর্থ হলো মুদ্রা সব সময় মূল্য রূপ নিয়ে বিদ্যমান থাকে। এটা যদি মূল্য রূপ নিয়ে না দাঁড়াতে পারে, তখন এটা হয়ে যাবে একটা সোনার পাতলা গোল জিনিস যার উপর খোদিত আছে রাজার মাথা, সংখ্যা, প্রতীক ইত্যাদি। যদি এটা মূল্য রূপ না হয়, এটা হবে কাজে লাগতে পারে এমন একটা সোনার দলা অথবা একটা গহনা।

একটা সাধারণ পণ্য (মুদ্রা নয়) যেমন কম্বল ব্যবহার-মূল্য নিয়ে অবশ্যই টিকে থাকে, এমনকি অন্য কোন পণ্যের মূল্য রূপ নিয়ে যদি এটা দাঁড়িয়ে না-ও থাকে। কারণ এটা তৈরির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যাতে করে এটা ব্যবহার-মূল্য দিতে পারে। কিন্তু মুদ্রা তৈরির ব্যাপারটা এমন নয়। এটা তৈরি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এটা যেন মূল্য রূপ নিয়ে দাঁড়াতে পারে। এই রূপটার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না একমাত্র মূল্য রূপ হিসেবে দাঁড়ানো ব্যতীত। এর অর্থ হলো মুদ্রা রূপটা হলো এমন রূপ যার কোন ব্যবহার-মূল্য নেই, অন্য সাধারণ পণ্যের যেমন থাকে। সেজন্য এর রয়েছে নিজস্ব মূল্য রূপ। এমন কোন রূপ নাই যার ব্যবহার-মূল্য থাকবে সাথে থাকবে নিজস্ব মূল্য রূপ।

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে একটা জিনিস যেমন কম্বল মূল্য হিসেবে দাঁড়াতে পারে না যখন সে ব্যবহার-মূল্য নিয়ে অবস্থান করে এবং বিপরীতটাও একই। এর অর্থ হলো এমনকি প্রাকৃতিক ব্যবহার-মূল্য ধারন করে রয়েছে এমন একটা পণ্য, ব্যবহার-মূল্য ছাড়া বিদ্যমান থাকতে পারে, যখন এটা মূল্য হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। সেহেতু, একটা মুদ্রার মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে এসে গেছে 'এমন রূপ যার দরকার হয় না কোন ব্যবহার-মূল্য', আর এটা এসেছে যখন মূল্য হয়ে উঠে মূল্য হিসেবে দাঁড়াতে হলে ব্যবহার-মূল্য বাদ দিয়েই সেটা করতে হয়।

এমনকি যদিও এটা সোনা যা হলো 'অর্থ-পণ্য (money-commudity)', সোনা যে রূপই (গহনা বা সোনার রড় বা বিস্কুট) গ্রহণ করুক, এর নিজস্ব মূল্য রূপ থাকে না। অন্যান্য উদ্দেশ্যে রূপ তৈরির পরিবর্তে, মূল্য নির্দেশ করতে তৈরি হয় যে একমাত্র রূপ, তাই হলো মুদ্রা রূপ, সেটাই হলো মূল্যের নিজস্ব রূপ।

যখন মূল্য গড়ে ওঠে বা জন্ম নেয়, ঠিক তখনই মূল্যের কোন নিজস্ব রূপ থাকে না। এমনকি 'অর্থ' হিসেবে গড়ে উঠার প্রারম্ভিক কালপর্যায়ে মূল্যের নিজস্ব রূপ থাকে না। আমরা ধরে নিলাম, শস্য 'কিছু সময়ের জন্য অর্থ' হিসেবে গণ্য হলো। তখন শস্যের রূপ হয়ে ওঠল 'অর্থ-রূপ', এটাই কি ঘটলো না? কিন্তু ওই অর্থ রূপটা মূল্যের নিজস্ব রূপ নয়। একই ভাবে, যদি অন্য কিছু পণ্য অর্থ হয়ে ওঠে, ওই পণ্যের রূপও নিজস্ব মূল্য রূপ হতো। অর্থের মুদ্রা রূপে আবির্ভাবের পর, মুদ্রা রূপ একাই হয়ে ওঠলো মূল্যের জন্য নিজস্ব রূপ, মুদ্রা যে ধাতুতে তৈরি হোক-না-কেন।

যখন আমরা বলি মূল্য 'নিজস্ব রূপ' অর্জন করেছে, এটার অর্থ কি সেই মূল্য বুঝায়, যা প্রাকৃতিক ছিল না, কিন্তু এখন প্রাকৃতিক হিসেবে উপস্থিত হলো? না, মূল্য কখনও প্রাকৃতিক নয়। এটা কখনও জিনিসের শরীরে প্রকাশিত বা উপস্থিত হয় না। যদি একে প্রকাশিত হতে হয়, সেটা ঘটে অন্য জিনিসের মাধ্যমে, যে জিনিসটা রয়েছে প্রথম জিনিসটার বাইরে। এমনকি এখনও মূল্য একই ভূমিকা পালন করে চলেছে। 'মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া' কথাটার মানে হয় : এমনকি এখনও মূল্য

প্রকাশিত হয়ে চলেছে অন্য জিনিসের মাধ্যমে তার রূপের মাধ্যমে, যার নাম হলো 'মুদ্রা'। যদিও মুদ্রা এমন একটা জিনিস যার আবির্ভাব ঘটেছে একমাত্র মূল্য প্রকাশ করতে এবং যদিও মূল্য প্রকাশিত হয়ে চলেছে মুদ্রা রূপে, এমনকি তখনও মুদ্রা প্রাকৃতিক জিনিস হতে পারে না। যদি মূল্য প্রাকৃতিক জিনিস হতো, কোন জিনিসের মূল্য ওই জিনিসের শরীরে মুদ্রার সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এমনটা ঘটে না কারণ মূল্য প্রাকৃতিক নয়।

মুদ্রার আবির্ভাবের আগে মূল্য এমন সব জিনিসের মাধ্যমে প্রকাশিত হতো যেসব জিনিসের কিছু ব্যবহার-মূল্য আছে। এই মূল্য মুদ্রার আবির্ভাবের পরে "স্বাধীনভাবে" দাঁড়িয়ে গেল। কি থেকে "স্বাধীনভাবে"? ব্যবহার-মূল্য থেকে স্বাধীনভাবে। এমন রূপ যা ব্যবহার-মূল্য থেকে পৃথক হয়ে গেছে, ওই রূপটা নিজেই হচ্ছে মুদ্রা রূপ।

এখন থেকে যখনই আমরা 'অর্থ' নিয়ে বলবো, এর মানে হবে আমরা ওই 'অর্থ' নিয়ে কথা বলছি, যা রয়েছে একমাত্র 'মুদ্রা' রূপে।

১৩. আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে কোন পণ্যের মূল্য-রূপ সব সময় পণ্যটার শারীরিক গঠন থেকে পৃথক। এই একই ঘটনা ঘটে এমনকি যখন মুদ্রা-রূপ সকল পণ্যের মূল্য রূপ হয়ে ওঠে। আমরা ধরে নিলাম, পণ্য রাজ্যে ১০০ ধরনের পণ্য আছে এবং এসব পণ্যকে মুদ্রার সাথে বিনিময় করা হয়। এই মুদ্রা-রূপ একটা পণ্যের সকল ধরনের রূপ থেকে পৃথক, যে পণ্যের সাথে মুদ্রার বিনিময় করা হচ্ছে। যদি একটা চেয়ারের দাম হয় ৫০০.০০ টাকা, এটার রূপ এবং এর মূল্য রূপ হয় পৃথক। অন্য যেকোন পণ্যের ক্ষেত্রে একই ঘটনা। যেহেতু এটা হলো 'দাম' যা একটা পণ্যের মূল্য নির্দেশ করে, এই দাম-রূপ (অর্থ-রূপ) পণ্যের শারীরিক গঠন থেকে পৃথক।

১৪. একটা পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য এবং মূল্য এই দুই বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক। কোথায়ও যখন একটা অস্তিত্বশীল আরেকটা তখন অনুপস্থিত। এটা হচ্ছে সেই দ্বন্দ্ব যা পণ্যের মধ্যে থাকে। এই দ্বন্দ্ব বার্টার পদ্ধতির সময়ের চেয়ে টাকার মাধ্যমে বিনিময়ের সময় আরও বিকাশিত হয়।

ধরা যাক, বার্টার পদ্ধতিতে কিছু বিনিময়ের ঘটনা ঘটছে, যা নিম্নরূপ :

১টা পাত্র = ১ জোড়া জুতা
১টা ধনুক = ১টা ষাঁড়ের চামড়া
২ কেজি শস্য = ৫ কেজি লাল ছোলা

এখানে যেসব জিনিস রয়েছে এক দিকে সেগুলো হলো ব্যবহার-মূল্য এবং যেগুলো রয়েছে বিপরীত দিকে সেগুলো হলো মূল্য। এর মানে হয় : প্রতি বিনিময় জোড়ে ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্য পৃথক থাকে। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেকটা পণ্য যা দাঁড়িয়ে আছে মূল্য হিসেবে, সম্পর্কিত থাকে ব্যবহার-মূল্যের সাথে, আর এটা 'মূল্য' হয়ে ওঠতে উপস্থিত হয় না। যখন একটা পাত্র বিনিময় করা হয় এক জোড়া জুতার সাথে, বিনিময়ের ঘটনাটা উপস্থিত হয় যেন-বা অন্য একটা পণ্যের জন্য একটা পণ্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু দ্বিতীয় জিনিসটা প্রথম জিনিসের জন্য মূল্য হয়ে উপস্থিত হয় না।

আমরা এখন ওসব পণ্যের সাথে অর্থের বিনিময়ের ঘটনা দেখবো :

১টা পাত্র = ৫০.০০ টাকা
ধনুক = ১০০.০০ টাকা
চেয়ার = ৫০০.০০ টাকা
২ কেজি শস্য = ৩০০.০০ টাকা

যখন এই হয় ঘটনা, এটা মনে হয় পাত্রের পরিবর্তে যেন ৫০.০০ টাকা এসেছে পাত্রের মূল্য হিসেবে এবং ধনুকের পরিবর্তে যে টাকা এসেছে তাই হলো ধনুকের মূল্য। একই ভাবে অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে, মূল্য বিশেষভাবে উপস্থিত হয়। এটার মানে হলো, একটা পণ্যে যে ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্য পৃথক ভাবে রয়েছে, তারা উভয়ে বার্টার পদ্ধতির বিনিময়ের ঘটনার চেয়ে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ঘটনায় আরও বিকশিত রূপে উপস্থিত হয়। এটা অনুধাবন করা সম্ভব যে প্রতি বিনিময়ের ঘটনায় একটা পণ্যের মধ্যে পরস্পরের সাথে দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্যের যেসব উপাদান রয়েছে, একমাত্র টাকা-রূপের আবির্ভাবের পরেই এদের উদ্ভব ঘটেছে। পণ্য বিনিময়ের ইতিহাসে পণ্যের অন্তর্নিহিত এই দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। জিনিসের এই দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র অনুধাবন করলেই এর সমাধান হবে না। এটা সমাধান হবে কেবলমাত্র তখনই যখন জিনিস আর পণ্যে রূপান্তরিত হবে না, অর্থাৎ বিনিময়ের ঘটনা ঘটবে না। এর অর্থ হয় সেখানে একমাত্র ব্যবহার-মূল্য থাকবে কিন্তু কোন 'মূল্য' থাকবে না, একমাত্র এভাবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

১৫. অর্থ হচ্ছে এমন মূল্য যার সাথে ব্যবহার-মূল্যের কোন সংযুক্তি থাকে না। আমরা সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এই প্রকৃতির মূল্যকে ব্যবহার-মূল্যে পরিবর্তন করতে পারি। এটার মানে হয়, আমরা সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অর্থ দিয়ে যেকোন পণ্য কিনতে পারি। একটা পণ্য অর্থ দিয়ে বিনিময়ের জন্য প্রস্তুত থাকে।

যেহেতু অর্থ নিজেই এই পরিবর্তনটা করতে পারে, যদিও নিজে কোন মূল্য ধারন না করে, এটা নিতান্তই এই অর্থ করে যে এটার সকল ধরনের ব্যবহার মূল্য আছে।

১৬. বার্টার পদ্ধতিতে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বিভিন্ন জিনিসের বিনিময় করে শুধুমাত্র নিজেদের অভাব পূরণ করতে। এক্ষেত্রে চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে যদি একটা বিনিময়ের ঘটনা ঘটে, বিনিময়ের এই ঘটনা এটাই প্রকাশ করে যে চেয়ারের মালিকের একটা কম্বল দরকার এবং কম্বল-মালিকের একটা চেয়ার দরকার, সেহেতু এখানে বিনিময়ের ঘটনাটা ঘটে। চেয়ার এবং কম্বলের রয়েছে পৃথক ব্যবহার-মূল্য এবং প্রত্যেকের রয়েছে মূল্য। এই জিনিস দুটার মধ্যে বিনিময়ের ঘটনা এভাবে ঘটতে পারে : একদিকে 'ব্যবহার-মূল্য'র সম্পর্ক' হিসেবে যেখানে একটা ব্যবহার-মূল্য দিয়ে আরেকটা ব্যবহার-মূল্য নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে 'মূল্যে'র হিসেবে যেখানে কিছু মূল্য দিয়ে কিছু মূল্য নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যখন একটা জিনিস কিছু টাকার সাথে বিনিময় করা হয়, এক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'কোন্ বৈশিষ্ট্য' জড়িত থাকে? যদি একটা চেয়ার এবং ৫০০.০০ টাকার মধ্যে একটা বিনিময়ের ঘটনা ঘটে, এখানেও বিদ্যমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'কোন্ বৈশিষ্ট্য জড়িত রয়েছে? একটা চেয়ারের রয়েছে ব্যবহার-মূল্য এবং কিছু মূল্য। অথচ ৫০০.০০ টাকার কোন ব্যবহার-মূল্য নেই, তবে কিছু মূল্য আছে। যখন চেয়ার এবং অর্থের মধ্যে একটা বিনিময় সম্পর্ক গঠিত হয়, এর অর্থ দাঁড়ায় এই ধরনের সম্পর্ক একমাত্র টাকার 'মূল্য বৈশিষ্ট'র এবং চেয়ারের 'মূল্য বৈশিষ্ট্য'র মধ্যে গঠিত হয়। এর অর্থ হয়, জিনিস এবং অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক একমাত্র 'মূল্য-সম্পর্ক' হিসেবে উপস্থিত হয়। কিন্তু বার্টার পদ্ধতিতে ২টা জিনিসের মধ্যকার সম্পর্ক শুধুমাত্র 'মূল্য'র সম্পর্ক হিসেবে নয়, 'ব্যবহার-মূল্য' সম্পর্ক হিসেবেও উপস্থিত থাকে। অর্থাৎ, অর্থের আবির্ভাবের পর টাকার সাথে অন্য জিনিসের সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্বশীল থাকছে একমাত্র 'মূল্য-সম্পর্ক' হিসেবে।

১৭. যদি চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে বিনিময়ের ঘটনা ঘটে, এর অর্থ হয় 'চেয়ারে নিয়োজিত শ্রম এবং কম্বলে নিয়োজিত শ্রমের মধ্যে একটা বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। বাস্তবে, এটা একমাত্র শ্রমের মধ্যকার বিনিময়ের ঘটনা নয়, চেয়ারে রয়েছে যে প্রাকৃতিক বস্তু এবং কম্বলে রয়েছে যে প্রাকৃতিক বস্তু তাদের মধ্যকার বিনিময়ের ঘটনাও বটে। কিন্তু যখন আমরা 'মূল্য' দেখি তখন কেবলমাত্র শ্রমের বৈশিষ্ট্য দেখতে হবে, প্রাকৃতিক বস্তুর বৈশিষ্ট্য দেখার দরকার নেই। যখন চেয়ার এবং টাকা-মুদ্রার মধ্যে বিনিময় ঘটে, এমনকি তখনও এর অর্থ দাঁড়ায় একটা শ্রম এবং আরেকটা শ্রমের মধ্যে বিনিময় ঘটছে। অর্থের উদ্ভবের আগে এবং পরে যে পর্যায়েই

হোক না কেন, বিনিময়ের অর্থ হলো দুই ধরনের মোট শ্রমের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হওয়া।

১৮. 'অর্থ' মানে 'মূল্য' এবং 'মূল্য' মানে 'শ্রম'। সুতরাং, 'অর্থ' মানে 'শ্রম'। যদি একজন ছোট্ট বালিকার কাছে একটা 'পয়সা' থাকে, এর মানে তার কাছে কিছু 'শ্রম' আছে। যদি সে এই পয়সাটা দিয়ে দেয়, সে এমন একটা জিনিস পাবে যার মূল্য খুবই কম। '১ টাকা' মানে আরও একটু বেশি শ্রম। সেজন্য আমরা এর পরিবর্তে এমন একটা জিনিস পাব যার মূল্য একটু বেশি। যদি এটা ১০ টাকা হয়, সেটা হবে আরও একটু বেশি শ্রম। যদি এটা ১০০ টাকা হয়, আরও একটু বেশি শ্রম। এভাবে বলতে পারি, কম অর্থ হলো কম শ্রম, বেশি অর্থ হলো বেশি শ্রম। যদি কম অর্থ আনতে পারে কম শ্রমে তৈরি জিনিস, তাহলে বেশি অর্থ আনবে অধিক শ্রমে তৈরি জিনিস।

যদি কোন ব্যক্তির কাছে কিছু অর্থ থাকে, এর মানে দাঁড়ায় তার কাছে কিছু শ্রম আছে এবং এটা 'অর্থ-রূপ'-এ আছে। এর মানে দাঁড়ায় ওই ব্যক্তি তত জিনিস পাবে যা ওই অর্থ আনতে পারবে।

১৯. ধরে নিলাম, ১ টাকা মূল্যের একটা কলম এবং ১ টাকার একটা মুদ্রা পাশাপাশি আছে। এই দুটা জিনিসের মূল্য সমান। তবু এদের মধ্যে টাকার আছে এক 'রহস্যময় ক্ষমতা' যা কলমের নেই। তবুও, মনে হয় যেন-বা অর্থের রয়েছে এক 'রহস্যময় ক্ষমতা' যা অন্য কোন পণ্যের নেই। অন্য পণ্যের সাথে তুলনা করলে টাকার এই 'রহস্যময় ক্ষমতা' বোঝা যায়। পণ্য জগতের যে-কোন পণ্য কেনার এই বিশেষত্ব হচ্ছে অর্থের এই 'রহস্যময় ক্ষমতা'। 'সাধারণ সমতুল' হয়ে ওঠার এই গুণ সৃষ্টি করেছে তার 'রহস্যময় ক্ষমতা'। এই অর্থে টাকা হচ্ছে এমন এক জিনিস যার এই 'রহস্যময় ক্ষমতা' রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে টাকার কোন 'রহস্যময় ক্ষমতা' নেই। অর্থ মানে একমাত্র 'শ্রম'। অর্থ মানে সকল ধরনের শ্রম পরিমাপের পাত্র বা মাধ্যম বৈকি।

২০. আমরা আগেই জেনেছি যে যখন ২টা পণ্যের মধ্যে একটা বিনিময় সংঘটিত হয়, সেখানে 'গুণগত সমতুল্যতা' এবং 'পরিমাণগত সমানুপাত' উপস্থিত থাকে। এমনকি অর্থ এবং নানা পণ্যের মধ্যেও যখন বিনিময় সংঘটিত হয়, সেখানেও উপস্থিত থাকে 'গুণগত সমতুল্যতা' এবং 'পরিমাণগত সমানুপাত'। যদি একটা চেয়ার এবং ৫০০.০০ টাকার মধ্যে বিনিময়টা ঘটে, তখন তাদের 'গুণগত সমতুল্যতা' হয় এই যে, চেয়ার এবং অর্থ (সোনা) উভয়ে তৈরি হয়েছে যে শ্রম দিয়ে তারা হয়ে ওঠে 'মূল্য'। তাদের 'পরিমাণগত সমানুপাত' হলো : চেয়ারের রয়েছে

একটা নির্দিষ্ট আকার এবং অর্থ হলো ৫ টাকা। এভাবে, অর্থের সাথে যেকোন পণ্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে গুণগত এবং পরিমাণগত এই দুই সম্পর্ক উপস্থিত থাকে।

২১. 'সম্পদ' অর্থ কী? 'সম্পদ' এবং 'অর্থ' এই উভয়ের মানে কি একই? সম্পদ মানে সমগ্রভাবে সমস্ত উৎপাদন। প্রত্যেকটা জিনিস যা তৈরি করা হয় তা সম্পদ, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস সম্পদ নয়। কথাটা অন্যভাবে বলা যায়, অর্থ অবশ্যই সম্পদ, কিন্তু সকল সম্পদ অর্থ নয়।

ধরে নিলাম, সমগ্র সমাজে ১০ ব্যাগ শস্য, ২টা চেয়ার, ৩টা কম্বল এবং ১০ টাকার সোনার মুদ্রা আছে। এই সকল জিনিস (ওই ১০ টাকার সোনার মুদ্রাসহ) যখন একত্রিত করা হবে, তা গঠন করবে ওই সমাজের সম্পদ। এখানে ১০ টাকার মুদ্রাই একমাত্র অর্থ হিসেবে রয়েছে।

ধরা যাক, এসব জিনিসের মূল্য নিচের তালিকা মতোই, বিষয়টা আমরা এখন দেখতে পারি :

১ ব্যাগ শস্য	= টাঃ ১০.০০	১০ ব্যাগ শস্য	= টাঃ ১০০.০০
১টা চেয়ার	= টাঃ ৫.০০	২টা চেয়ার	= টাঃ ১০.০০
১টা কম্বল	= টাঃ ৫.০০	৩টা কম্বল	= টাঃ ১৫.০০
১টা স্বর্ণ মুদ্রা	= টাঃ ১.০০	১০টা স্বর্ণ মুদ্রা	= টাঃ ১০.০০
			মোট = ১৩৫

এই তালিকা মোতাবেক তাহলে 'সম্পদ' হলো কী? ১০ ব্যাগ শস্য, ২টা চেয়ার, ৩টা কম্বল এবং ১০টা স্বর্ণ মুদ্রা একত্রে করলে সেটাই হলো 'সম্পদ'। এটা হবে ওই সমাজের মোট জিনিস বা উৎপাদন; যার মূল্য হয় টাঃ ১৩৫.০০; এর মধ্যে একমাত্র ১০টা মুদ্রাই গঠন করেছে 'অর্থ'।

২২. ধরে নিলাম, তালিকায় উল্লেখিত ওই ২টা চেয়ার একজন তৈরি করেছে এবং কাছে রেখে দিয়েছে। প্রতিটা চেয়ারের মূল্য টাঃ ৫.০০। আমরা এখানে দেখাতে পারবো ওই ব্যক্তির অধিকারে থাকা এই সম্পদ তিন ভাবে থাকতে পারে : (১) ২টা চেয়ার, (২) চেয়ারের মূল্য টাঃ ১০.০০, অথবা (৩) ১টা চেয়ার + টাঃ ৫.০০ হিসেবে; ২টা চেয়ার + টাঃ ১০.০০ হিসেবে নয়। এর অর্থ হয় ২টা চেয়ার এবং এদের অর্থ আকারে মূল্যের হিসেব একত্রিত করে ধরা ঠিক হবে না।

২৩. ধরা যাক, একজন মহিলার কাছে ২ টাকার মুদ্রা আছে। তিনি এ দিয়ে কিছু খাবার কিনলেন এবং খেয়ে নিলেন। এভাবে তিনি ২ টাকা খরচ করে ফেললেন, এমনটাই প্রতিভাত হয়। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে তিনি যা খরচ করলেন তা কি ২ টাকা না-কি কিছু খাবার। তার কাছ থেকে এই ২ টাকার মুদ্রা চলে যাওয়ার ঘটনা

সুনির্দিষ্ট ভাবে এটাই প্রকাশ করে যে ওই ২ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু ওই মুদ্রাগুলো তো অন্য জনের কাছে জমা হয়েছে। একমাত্র কিছু খাবারই এখানে নিঃশেষ হয়েছে কারণ সেগুলো খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ হয়, এই খাবারটা তৈরি করতে যে শ্রম (২ টাকা মূল্যের শ্রম) লেগেছে সেটাই পরিভোগের মধ্য দিয়ে ব্যয়িত হয়েছে। ওই পরিমাণ খাবার আবার তৈরি করা যাবে যদি ওই শ্রমটুকু আবার ওই কাজে সম্পাদিত হয়। এর মানে হলো যখনই অর্থ ব্যয়িত হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়, যা প্রকৃত পক্ষে ব্যয়িত হয় সেটা হলো কিছু ব্যবহার-মূল্য, অর্থাৎ কিছু শ্রমই একমাত্র।

২৪. কোন ব্যক্তি ১০ টাকা দিয়ে একটা শার্ট কিনল, এভাবে টাকাটা তার কাছ থেকে চলে গেল। কিন্তু শার্টটা তো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই মুহূর্তেই তাৎক্ষণিক ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল না। এটা অন্তত কয়েক বছর ব্যবহারের পরেই মাত্র ছিঁড়ে যাবে। এর অর্থ হলো, ওই জিনিসটা ওই সময়কাল ধরে পরিভোগে রয়েছে, বলা যায়। একটা চেয়ারের ক্ষেত্রে, এই পরিভোগের সময়টা ১০/১৫ বছর তো হবেই। বাড়ির ক্ষেত্রে সময়টা প্রায় ১০০ বছর হবে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, কিছু জিনিস পরিভোগের মাধ্যমে নিঃশেষ হয় দ্রুত, কিছু জিনিস ধীরে ধীরে এবং অন্য কয়েকটা আরও ধীরে। সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, সমাজে সমগ্র উৎপাদন নিঃশেষ হয় দ্রুত অথবা কিছু সময় নিয়ে। কোন জিনিসই চিরকালের জন্য অটুট বা অক্ষুন্ন থাকছে না পরিভোগের ভেতর দিয়ে ব্যয়িত না হয়ে।

২৫. আমরা দেখেছি যে অর্থের মানদন্ডে একটা জিনিসের মূল্যই হলো তার 'দাম'। এর মানে হলো মূল্য এবং দাম কথা দুটো একই। কিন্তু, দৈনন্দিন জীবনে আমরা কোন কোন পরিস্থিতিতে একটা পণ্যের ২/৩ ধরনের দাম দেখতে পাই। উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাক, বিনয় কিছু কাপড় কিনে একটা শার্ট বানানোর জন্য কাপড়ের দোকানে গেল, একটা কাপড় পছন্দ করে জিজ্ঞেস করল, "এক গজের দাম কত?"

"৫ টাকা", দোকানদার বললেন।

'বিনয়' তার প্রয়োজন মতো কাপড় নিয়ে চলে গেল।

'বিকাশ' এসে একই কাপড় পছন্দ করে জিজ্ঞেস করল, "গজ প্রতি দাম কত?"

"৫ টাকা", দোকানি বললেন।

"একটু কমানো যায় কি?" বিকাশ জানতে চাইলো।

"কোন দরাদরি চলবে না", দোকানি বললেন।

"আচ্ছা, ঠিক আছে", বলে বিকাশ চলে যেতে চাইলো।

দোকানদার তখন বিকাশকে থামিয়ে বললেন, "গজ প্রতি সামান্য কমানো যায়, যদি নিতে চান নেন"। বিকাশ তাতেও রাজি হলো না। শেষ পর্যন্ত ৪.৫০ টাকায় রফা হলো এবং বিকাশ দামটা চুকিয়ে দিয়ে তার প্রয়োজন মতো কাপড় নিয়ে চলে আসলো। একই কাপড়ের সামান্য সময়ের ব্যবধানে দুই ধরনের দাম হলো – ৫ টাকা আর ৪.৫০ টাকা। কিন্তু, এখানে প্রশ্ন আসে কাপড়ের প্রকৃত দাম কত? দাম নিজেই তো মূল্য, কীভাবে একই কাপড় দুই ধরনের মূল্য পায়?

আমরা ধরে নিলাম, ওই দোকানদার সমস্ত দিনে ২০ গজ কাপড় বেচলেন। আমরা আরও ধরে নিলাম দোকানদার প্রতি গজ সামান্য কমে কিনে এনেছেন, বিক্রির ক্ষেত্রে তিনি যারা দরাদরি করেন না তাদেরকে একটু বেশি দামে এবং যারা বিকাশের মতো দরাদরি করে তাদের কাছে সামান্য কম দামে কাপড় বিক্রি করেন। আমরা ধরে নিলাম, ২০ গজ কাপড় বিক্রি করে তিনি ১০০.০০ টাকা পেলেন। আমরা এখানে 'গড় দাম'-এর কথাটা বোঝাতে চাচ্ছি, এক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বলি গড়ে প্রতি গজ কাপড়ের দাম ৫.০০ টাকা। এই একই পণ্যের দামে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে, এটা নানা পরিস্থিতির কারণ ঘটে, ক্রেতার দিক থেকে এবং বিক্রেতার দিক থেকে উভয় কারণে। শুধুমাত্র এই কারণে, এটা বুঝায় না যে একটা পণ্যের কয়েকটা দাম থাকবে। এখানে দেওয়া কাপড়ের উদাহরণে, ১ গজ কাপড়ের মূল্য কেবলমাত্র একটাই থাকতে পারে আর সেটা হলো ৫.০০ টাকা, কিন্তু যখন এই মূল্যটা দামে প্রকাশ পাচ্ছে (যখন দাম হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে), কোন সময় এটার দাম ৫.০০ টাকার সামান্য বেশি হতে পারে। অন্য কোন সময় ৫.০০ টাকার সামান্য কম হতে পারে। এর অর্থ হলো, একই মূল্য বিভিন্ন দাম রূপে উপস্থিত থাকতে পারে। যদি একটা পণ্যের বিভিন্ন দাম থাকে, এ থেকে এটা বুঝায় না যে পণ্যটার রয়েছে বিভিন্ন মূল্য। এর একমাত্র অর্থ হলো এই যে একই মূল্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দাম রূপে হাজির হতে পারে।

এখানে আমরা একই মূল্যের বিভিন্ন দামে প্রকাশিত হওয়ার এই বিষয়টা বাদ রাখতে পারি। বিষয়টাকে সহজ করার জন্য আমরা সামনে এগিয়ে যাই এই বিচার-বিবেচনা নিয়ে যে মূল্য এবং দাম সর্বদাই একই থাকে। আমরা যতই সামনে এগিয়ে যাব মূল্য এবং দামের মধ্যকার সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন অনেক বিষয় আরও বিশদ ও গভীর ভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে। ঠিক এখনই অত বিশদে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। যতক্ষণ এই প্রয়োজন সামনে না আসছে, 'মূল্য এবং দাম হলো সমান' এই ধারণায় আমরা দৃঢ় থাকবো। যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি মূল্য এবং দাম সমান, আমরা এখন 'দাম' শব্দটার ব্যবহার পরিহার করবো এবং একমাত্র 'মূল্য' শব্দটা ব্যবহার করবো।

এখন পর্যন্ত আমরা পণ্য বিনিময়ের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জেনেছি। সমাজে এক সময় মোটের উপর কোন বিনিময়ের ঘটনাই ঘটতো না, একসময় বিনিময় শুরু হলো এবং বার্টার পদ্ধতিতে এটা চালু থাকলো সুদীর্ঘকাল ধরে। পরবর্তী কোন এক সময় 'সোনা এবং 'রূপা' সাধারণ সমতুল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো। অর্থরূপ নিজেই একসময় পণ্য রূপ হয়ে ওঠলো।

২. 'মূল্য'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধান
(Investigations into 'value')

মূল্য এবং এর নানা রূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে 'অর্থশাস্ত্র'র কোন বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়।

অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে কার্ল মার্কস হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি 'মূল্য' এবং 'অর্থ' বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সঠিক ধারণা আবিষ্কার করেন। মার্কসের আগে কোন অর্থনীতিবিদ 'মূল্য' সম্পর্কে যথাযথ ধারণা আয়ত্ত করতে পারেননি। এদের প্রত্যেকে মূল্যকে একটা 'প্রাকৃতিক' বিষয় হিসেবে চিন্তা করেছেন। তারা ধারণা করতেন মূল্য হচ্ছে কোন বস্তুর রঙ, স্বাদ, ওজন এবং উচ্চতার মতো একটা গুণ, যা একটা বস্তু ধারন করে। তারা ভেবে নিয়েছিলেন কোন বস্তু মূল্য ছাড়া অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না, যেমন ভৌত গুণাবলি ছাড়া কোন বস্তু থাকতে পারে না। এই ধরনের চিন্তা মাথায় আসার কারণ হলো তারা 'শ্রম'-কে সঠিক অর্থে বোঝেননি, যে শ্রম একাই মূল্য গঠন করে।

'মূল্য' সম্পর্কে অনুসন্ধান খ্রিস্টপূর্ব (৩৮৪–৩২২) এর প্রথম দিকে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টোটলের সময় থেকে শুরু হয়। প্রকৃতি এবং সমাজ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান কাজও তিনি প্রথম শুরু করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পণ্যের মূল্য সম্পর্কে প্রথম গবেষণা চালান। অর্থ একমাত্র 'পণ্যের মূল্য' থেকে আসে এই ধারণা এরিস্টোটলই প্রথম তুলে ধরেন। তিনি বলেছেন, এভাবে বলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই :

২টা কোট = ১টা ঘর এবং
২টা কোট = কিছু অর্থ।

এই ধারণাটা সম্পূর্ণ সঠিক। প্রথম উদাহরণে ২টা কোটের মূল্য হলো ১টা ঘর, দ্বিতীয় উদাহরণে ২টা কোটের মূল্য হলো অর্থ। এর মানে হলো এরিস্টোটল প্রথম সঠিকভাবে এই ঘটনা বুঝেছিলেন যে 'অর্থ হলো মূল্যের রূপ'। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে যখন দুটা পণ্যের মধ্যে বিনিময় ঘটে, সেখানে এই পণ্যগুলোর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, যা হলো মূল্য, আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে বিনিময়

সম্ভব হয়। এই অগ্রসর দার্শনিকের পক্ষে তখন বোঝা সম্ভব হয়নি 'মূল্য' কী? যত বিচক্ষণ এবং প্রজ্ঞাবান তিনি হোন না কেন, এটা না বোঝার ক্ষেত্রে তার অক্ষমতার কারণ হলো ওই সময়ে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থা।

তখনকার গ্রিক সমাজে দাস ব্যবস্থা চালু ছিল। এরিস্টোটল এই 'দাস সমাজ', যা গোত্রভিত্তিক অসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, এমন একটা সমাজে বসবাস করতেন। এমন সমাজে বসবাস করে কারও পক্ষে সম্ভব নয় 'মানুষের শ্রম' সম্পর্কিত ধারণা মাথায় নিয়ে আসা। যতদিন না 'মানুষের সাম্য' এই বোধ মানব সমাজে উদিত হয়েছে, এটা কোন মানুষের পক্ষে মাথায় আনা সম্ভব হয়নি।

ঘটনা হলো এই যে "সকল মানুষ সমান" এই ধারণা মানব জাতির কল্পনা তখনই ধরতে পেরেছে, যখন 'মানুষের তৈরি সকল পণ্য সমান' এই ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। একমাত্র তখনই যখন সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে, যেখানে মানব জাতির তৈরি পণ্যের একটা বিশাল অংশ বিনিময়ের মধ্যে এসে গেছে, ফলে সেখানে এই সম্ভাবনা তৈরি হতে পেরেছে যে এসব পণ্য সমান, পণ্যগুলো তৈরির পেছনে ব্যয়িত শ্রমও সমান এবং এই শ্রম দানকারী মানুষও সমান – এই ধারণা মানুষ আয়ত্ত করতে পেরেছে। এসব সংঘটিত হতে কয়েক হাজার বছর চলে গেছে, এরিস্টোটল থেকে যার শুরু। এরিস্টোটল এই অনুসন্ধান কাজ শুরু করেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন এটা বুঝতে যে 'মূল্য মানে শ্রম', আর এই অনুসন্ধান দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজ থেকেই থেমে গেল। তখনকার মানুষ মূল্য সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা মাথায় আনতে পারেনি, এমন পরিস্থিতিতে এই অনুসন্ধানের কাজে এরিস্টোটলই প্রথম পদক্ষেপ দিলেন : '২টা পণ্যের মধ্যে বিনিময়ের ঘটনায় একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে, একমাত্র এই বৈশিষ্ট্যের কারণে বিনিময় সম্ভব হয়, আর এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো মূল্য।' এই হলো অর্থশাস্ত্রে এরিস্টোটলের মহান অবদান।

এরিস্টোটলের পর দুই হাজার বছর চলে গেছে, 'মূল্য মানে শ্রম' এই ধারণাটা মাথায় আনা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি, একমাত্র মার্কস কর্তৃক এটা আবিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত। মার্কস একটা ফুটনোটে লিখেছেন যে একজন অজ্ঞাতনামা অর্থনীতিবিদ ১৭৩৯ খিস্টাব্দের দিকে প্রথম এই চিন্তাটা আবিষ্কার করেন। ওই গ্রন্থের নাম হলো : *Some Thoughts on the Interest of Money in General and particularly in the Public Funds & C.* এই বইয়ে লেখকের নাম এবং প্রকাশনার কোন তারিখ ছিল না। বইয়ে লিপিবদ্ধ নানা তথ্য থেকে মার্কস মতামত দেন যে বইটা সম্ভবত ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে লেখা হয়েছে।

এই অজ্ঞাতনামা অর্থনীতিবিদ যেটা আবিষ্কার করেন তাহলো :

"জীবনে প্রয়োজন এমন সব জিনিসের একটার সাথে আরেকটার বিনিময় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, এসব জিনিসের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় এসব জিনিস তৈরিতে আবশ্যকীয় শ্রম দিয়ে"।[১] যদি এরিস্টোটলের আবিষ্কার হয়ে থাকে এই ঘটনা যে কোন বিনিময়ের সাথে যুক্ত পণ্যগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, আর ওই অজ্ঞাতনামা লেখকের আবিষ্কার হলো এই ঘটনা যে 'ওই সাধারণ বৈশিষ্ট্য শ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নয়'। এই লেখকের পরবর্তী সকল অর্থনীতিবিদ এই সত্যটা জেনেছিলেন যে 'মূল্য অর্থ একমাত্র শ্রম'। যদিও 'মূল্য অর্থ একমাত্র শ্রম' এটা জানার মানে শ্রমের সকল বৈশিষ্ট্য জানা হয়ে গেল বিষয়টা মোটেই অনুরূপ নয়। যে-কোন শ্রম অস্তিত্বশীল হতে পারে একমাত্র মূর্ত শ্রম হিসেবে। কিন্তু সকল শ্রম একই মূল্য নিয়ে অস্তিত্বশীল হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১ ঘন্টার বুনন শ্রম এবং ১ ঘন্টার চিকিৎসা শ্রম একই মূল্য ধারন করে না। তাদের মূল্যের পার্থক্য একমাত্র তখনই জানা সম্ভব যখন তাদেরকে 'বিমূর্ত শ্রম'-এ রূপান্তরিত করা হয়। এটা ছাড়াও শ্রমের মধ্যে আরও পার্থক্য রয়েছে, যেমন – 'জীবন্ত শ্রম' এবং 'মৃত্য শ্রম'। এসব ভিন্ন ভিন্ন শ্রম বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে। এই সংক্রান্ত কোন বিষয় আমরা এখন পর্যন্ত আলোচনা করিনি। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবো। এখানে আমাদের এটা স্মরণ রাখতে হবে যে 'মূল্য অর্থ একমাত্র শ্রম' এই তথ্যটা জানা আর শ্রমের সকল দিক বা বৈশিষ্ট্য জানা হয়ে গেল, এই দুটো বিষয় এক নয়।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে 'মূল্য অর্থ শ্রম' এই তথ্যটা জানাই যথেষ্ট নয়। আমাদের এটাও জানতে হবে যে 'শ্রম মানে মূল্য নয়'। যদি আমরা দ্বিতীয় বিষয়টা না জানি তাহলে যেটা ঘটতে পারে তাহলো : "শ্রম অবধারিতভাবে মূল্য হিসেবে অস্তিত্বশীল হয়" এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে যাবে। যেসব অর্থনীতিবিদ "মূল্য অর্থ শ্রম" এই পর্যন্ত জেনেই বসে থাকবেন তারা একটা ভুল ধারণায় পৌঁছে যাবেন, আর সেটা হলো "মূল্য অর্থ শ্রম। শ্রম ছাড়া কোন জিনিস থাকতে পারে না। অর্থাৎ, মূল্য ছাড়া কোন জিনিস কোথায়ও থাকতে পারে না"। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে এই ধারণাটা ভুল।

কোন জিনিস, যদিও 'শ্রম' দিয়ে তৈরি, সেটা 'মূল্য' ছাড়াও থাকতে পারে। এমন একটা সময় ছিল, যখন বিনিময় শুরু হয়নি, তখন জিনিসের উৎপাদন এবং

---

[১] কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, মস্কো সংস্করণ, ১৯৭৪; পাতা – ৪৭।

পরিভোগ মূল্যের উল্লেখ ছাড়াই সম্পাদিত হতো। বহুকাল আগে সেই সময়ে সকল জিনিস শ্রম দিয়ে তৈরি হলেও, 'মূল্য' ছাড়াই অস্তিত্ববান ছিল।

কেবলমাত্র ওই সময়কালে নয়, এমনকি বিনিময় শুরু হলেও সমস্ত জিনিসের একটা বিরাট অংশ মূল্যের উল্লেখ ছাড়াই ভোগ করা হতো। আর এমন অবস্থা বর্তমান কালে যে ধরনের বিনিময় শুরু হয়েছে তার পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল।

এমনকি আজকের দিনেও, প্রত্যেকটা জিনিস বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পরিভোগে যায় না, বিশেষ করে ঘরে তৈরি জিনিস আজও মূল্যের কথাটা বিবেচনায় না নিয়ে ভোগ করা হয়। তাই বলা যায়, যেসব জিনিস বিনিময়ের মধ্যে যায় না, যদিও তারা শ্রম দিয়ে তৈরি, মূল্য ছাড়াই অস্তিত্বশীল থাকে।

এর অর্থ হলো, কোন জিনিস তৈরি করতে শ্রম আবশ্যক, কিন্তু কোন শ্রমের জন্য মূল্যে রূপান্তরিত হওয়াটা আবশ্যক নয়। এটা ঘটে একমাত্র বিনিময়ের কারণে। যদি আমরা এই সত্যটার মর্মার্থ না বুঝি, তাহলে 'শ্রমের মূল্যে রূপান্তর' হওয়ার বিষয়টা আমাদের কাছে বাধ্যতামূলক ঘটনা হিসেবে উপস্থিত হবে, ফলে কোন জিনিসের মূল্য ধারন করার ঘটনা অবধারিত এবং প্রাকৃতিক হিসেবে প্রতিভাত হবে। যদি কোন অর্থনীতিবিদ এই রূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন, এর অর্থ হয় মূল্য সম্পর্কিত ধারণা তার কাছে এখনও ভুল এবং অর্ধ-উদঘাটিত অবস্থায় রয়েছে।

মূল্য সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরুর আগে, অর্থের মাধ্যমে জিনিসের ক্রয় এবং বিক্রয়ের ঘটনা কয়েক শত নয় কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসছিল। মূল্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন যেসব ব্যক্তি, তাদের যদি আমরা অর্থনীতিবিদ হিসেবে ধরে নিই, তাহলে বলা যায় তখনও বিনিময় এবং অর্থের হিসাব-নিকাশ করার ঘটনার উপস্থিতি সমাজে চালু ছিল, যখন ওই সব অর্থনীতিবিদদের কোন উপস্থিতি সমাজে ছিল না।

তখনকার অর্থনীতিবিদরা মূল্যের উপস্থিতি সমাজে দেখেছে ঠিকই, কিন্তু তারা একে ভেবে নিয়েছে এই বলে যে "মূল্যের উপস্থিতি বা অস্তিত্বশীল থাকাটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনা"।

ওই সব অর্থনীতিবিদ যারা মূল্যকে প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে ভেবে নিয়েছিলেন, তাদেরকে অন্ততঃ একটা প্রশ্ন অবশ্যই ধাক্কা দিয়েছে, তাহলো : "জিনিস তার সকল প্রাকৃতিক গুণাবলি তার শরীরে ধারন করে থাকে, তাহলে মূল্য কেন জিনিসের শরীরে উপস্থিত থাকে না যদি সে প্রাকৃতিক গুণাবলি হয়ে থাকে?" কেন 'জিনিসের মূল্য' অর্থ রূপ ধারন করে জিনিসের বাইরে অবস্থান করে? এমন প্রশ্ন ওই সব অর্থনীতিবিদদের অবশ্যই ধাক্কা দিয়েছে। আরেকটা প্রশ্নও তাদেরকে ধাক্কা দিয়েছে :

"আগে জিনিস মূল্য ছাড়াই টিকে ছিল। এমনকি আজও এমনটা ঘটে যে কিছু জিনিস মূল্য ধারন করে আর অনেক জিনিস মূল্য ধারন করে না। কেন এমন ঘটছে (?) যে কিছু জায়গায় মূল্য উপস্থিত থাকছে আবার কিছু জায়গায় মূল্য উপস্থিত থাকছে না"। এমন প্রশ্ন চিন্তায় না আসাটা এটাই তুলে ধরে যে, সমগ্র অর্থশাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা ওই অর্থনীতিবিদ ধরতে পারেননি। কেবলমাত্র তখনকার দিনে নয়, এমনকি আজও অনেক অর্থনীতিবিদ এই প্রশ্ন চিন্তায় আনতে পারেন না। 'এমনকি আজও' এই কথাটা দিয়ে আমরা এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, মার্কসের পরেও, যিনি 'মূল্য' এবং 'অর্থ' সম্পর্কিত প্রায় সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। আজও অনেক অর্থনীতিবিদ আছেন, যারা মূল্য জিনিসের একটা প্রাকৃতিক গুণাবলি এমন ভুল ধারণা মাথায় নিয়ে বসে আছেন।

এর মানে হলো, এসব অর্থনীতিবিদ যারা মূল্য একটা প্রাকৃতিক গুণাবলি এটা বিশ্বাস করেন, তাদের কাছে যুক্তিসিদ্ধ কোন প্রশ্ন এবং বিশ্লেষণ নেই। এসব অর্থনীতিবিদদের কাছে 'পণ্য মানেই কিছু মূল্য আছে' এভাবে সকল জিনিস উপস্থিত হয়। যদি আমরা একটা চেয়ারকে প্রশ্ন করি, "তুমি কী? তোমার কাজ কী?" চেয়ার উত্তরে বলবে, "আমি একটা চেয়ার এবং আমি মানুষের বসার কাজে লাগি"। কিন্তু, যখন আমরা একজন অর্থনীতিবিদকে চেয়ারটা দেখিয়ে প্রশ্ন করি, "এটা কী? এর কাজ কী?" উত্তরে তিনি বলবেন, "এটা ৫০০০.০০ টাকা মূল্যের একটা চেয়ার। এটা মানুষের বসার কাজে লাগতে পারে, কিন্তু এটা অন্য বিষয়"। এর অর্থ হয়, এই অর্থনীতিবিদ প্রথমে চেয়ারটাকে 'কিছু মূল্য আছে এমন একটা পণ্য' হিসেবে দেখছেন, এবং এর ব্যবহার-মূল্যকে অন্য বিষয় হিসেবে নিচ্ছেন। এখানে চেয়ারটা ওই অর্থনীতিবিদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে।

মার্কসই প্রথম অর্থনীতিবিদ যিনি 'মূল্য' এবং 'অর্থ'-কে পরিষ্কারভাবে বোঝেন। মার্কস বুঝেছিলেন যে শ্রম নিজের থেকে মূল্য হয়ে ওঠে না এবং মূল্য হচ্ছে শ্রমের রূপান্তর, যা জিনিস উৎপাদন করে এবং বিনিময়ের মধ্য দিয়ে 'বিমূর্ত শ্রম' হয়ে ওঠে। মূল্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জানাটা একমাত্র তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন আমরা শ্রম এবং অর্থকে প্রকৃত অর্থে জানবো। মার্কস *ক্যাপিটাল* গ্রন্থে (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) এই কাজটাই করেছেন। মার্কস *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের *'The Two Fold character of the Labour Embodied in commudities'* এই পরিচ্ছেদে লিখেছেন : "আমিই প্রথম পণ্যের মধ্যে থাকা শ্রমের এই দ্বৈত্য চরিত্র গভীরভাবে পরীক্ষা করেছি"।[২]

---

২. কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, মস্কো সংস্করণ ১৯৭৪, পা-৪৯।

এঙ্গেলকে লেখা এক পত্রে (তারিখ - ২৪.০৮.১৮৬৭) মার্কস লিখেছেন, "আমার বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : (১) পণ্যের দ্বৈত্য চরিত্র, ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময় মূল্য যাই হোক-না-কেন তাদের মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। পণ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় জানাটা এটার উপর নির্ভর করে ..."।[৩] যখন সকল অর্থনীতিবিদ 'মূল্য'-কে একটা প্রাকৃতিক গুণ হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং এটা জিনিসের সাথে অনন্তকাল টিকে থাকে বলে ধরে নিয়েছিলেন, মার্কস তখন মূল্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা ব্যাপক গবেষণার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেন, যা অর্থশাস্ত্রে এক বিশাল অবদান রেখেছে। মূল্য সম্পর্কে যে গবেষণা এরিস্টোটল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ বিসি থেকে শুরু করেন, আর এই গবেষণার মধ্য দিয়ে নাম জানা এবং না-জানা অসংখ্য অর্থনীতিবিদের সুগভীর অনুসন্ধানী ভূমিকায় অর্থশাস্ত্র কয়েক শত বছর ধরে সমৃদ্ধ হয়েছে, অবশেষে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এসে মার্কসের মধ্য দিয়ে যা পূর্ণাঙ্গ একটা তত্ত্ব আকারে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। মূল্য সংক্রান্ত গবেষণা শুরুর পর ২২০০ বছর চলে গেছে, তার পরেই এই অনুসন্ধান সঠিক ধারণায় আসতে পেরেছে।

মার্কস *ক্যাপিটাল* গ্রন্থের পূর্বভাষে লিখেছেন, "মানব মনকে ২০০০ বছর অতিক্রম করতে হয়েছে মূল্যের তলায় পৌঁছাতে"।[৪]

যখন আমরা বলি 'মূল্যের অনুসন্ধান' মার্কসের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে সকল অর্থনীতিবিদ মার্কস যা আলোচনা করেছেন তা পড়ে নিয়েছেন, তখন থেকে মার্কস আবিষ্কৃত সত্যটাকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন এবং মূল্য সম্পর্কে সকল ভুল ধারণা পরিত্যাগ করেছেন। এখনও অসংখ্য অর্থনীতিবিদ আছেন যারা মূল্যের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং একে প্রাকৃতিক গুণাবলি হিসেবে দেখেন।

আমরা এই গ্রন্থের আলোচনায় যতই এগিয়ে যাব, আমরা দেখতে পাব মূল্য সম্পর্কে সঠিক ধারণার উপর দাঁড়িয়ে মার্কস অর্থশাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়গুলোকে আনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

---

৩ মার্কস এবং এঙ্গেলস, *নির্বাচিত পত্রাবলি*, মস্কো সংস্করণ ১৯৭৫, পা-১৮০।

৪ কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, মস্কো সংস্করণ ১৯৭৪, পা-৪৯

অধ্যায় নয়

পণ্যের পৌত্তলিকতা
(Fetishism of Commodities)

ফলে মাটির মূর্তিপূজাও একেশ্বরবাদের নিরাকার পূজার স্বীকৃতি দাবি করতে পারে এবং একেশ্বরবাদীর নিরাকার পূজাও সাকার মূর্তি পূজার সমপর্যায়ের তথা নামান্তর বলে গণ্য হতে পারে। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌত্তলিক ধর্মও একেশ্বরবাদী ধর্ম হবে। যে-কারণে চিন্ময় প্রতিমা পূজাও একরকম পৌত্তলিকতা এবং এই পূজারী পৌত্তলিক বটে।

–অঞ্জন মাহফুজ, *অন্তর তীর্থে : মরমী বিশ্বের মৌনভাব*, প্রকাশক চর্চা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ১৬।

'অর্থের জন্য বিভিন্ন পণ্যের বিক্রয় এবং অর্থ দিয়ে বিভিন্ন পণ্য ক্রয়' – এই লেনদেনের ঘটনাকে যখন আমরা ভাসাভাসা ভাবে দেখি, তখন এসব ঘটনা অত্যন্ত সহজ এবং সরল হিসেবে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। কিন্তু, যখন আমরা পণ্যসমূহের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে পরীক্ষা করতে শুরু করি, তখন এসব ঘটনা হয়ে ওঠে এক 'গভীর রহস্য' এবং 'মূর্তিমান পুতুল'।

যখন আমরা কোন জিনিসকে তার ব্যবহার-মূল্য দিয়ে বিচার করি, এটা কোন রহস্য হয়ে ওঠে না, যা মানুষ বুঝতে পারবে না। যে-কোন জিনিস আমরা লক্ষ করি না কেন, এটা পরিষ্কার অর্থে প্রতিভাত হয় যে, মানুষ প্রকৃতি থেকে পাওয়া বিভিন্ন বস্তুকে জিনিস হিসেবে ব্যবহার করছে, নিজেদের বহুকালের অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত এসব বস্তুসমূহকে মানুষ জিনিসে রূপান্তরিত করে নিয়েছে, নিজেদের অভাব পূরণের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে মানুষ এভাবে কাজ করে চলেছে। যদি আমরা একটা চেয়ারকে লক্ষ করি, এটা পরিষ্কার যে কোন মানুষ কাঠ দিয়ে এটা তৈরি করেছে নিজেদের বসার কাজে ব্যবহার করতে। এখানে এটাকে গভীরভাবে পরীক্ষা করার এবং বোঝার মতো কিছুই নেই। কিন্তু, যখন এই জিনিসটা 'পণ্য' হয়ে যায় এবং 'মূল্য পরিমাপ' করার মতো বিষয় এসে যায়, তারপর থেকেই পণ্যের সকল 'রহস্য'র শুরু।

যখন কোন জিনিসকে জিনিস হিসেবে দেখি তখন সকল ঘটনা অতি সাধারণ, পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং বোধগম্য হিসেবে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, কিন্তু যখনই কোন জিনিসকে আমরা পণ্য হিসেবে দেখি তখন সবকিছু পতিত হয় অপ্রাকৃতিক, দুর্বোধ্য, বোধাতীত এক বিভ্রান্তির মধ্যে। যদি কোন জিনিস কেবলমাত্র একটা জিনিস হিসেবে থেকে যায়, ক্রয় এবং বিক্রয় এমন ঘটনার মধ্যে প্রবেশ না করে;

মানুষের জন্য গোপন, রহস্যময় এবং বোধাতীত কোন বিষয় সেখানে আর থাকে না। যখন জিনিসটা পণ্য হয়ে যায়, তখন সকল ঘটনা অতি অদ্ভুত এবং রহস্যময় হিসেবে হাজির হয়। যখনই আমরা 'পণ্যসমূহ' কথাটা বলি, তখন থেকে পণ্যকে ঘিরে হাজির হয়ে যায় – ক্রয় এবং বিক্রয়, মূল্যের পরিমাপ, অর্থের হিসাব-নিকাশ, দাম এবং আরও অসংখ্য বিষয়; যার দেখা আমরা এখনও পাইনি, যেমন : মুনাফা, লাভ, ভাড়া, বেতন, সরবরাহ এবং চাহিদা, মুনাফার সাধারণ হার, মুনাফার বিশেষ হার, পণ্যের সঞ্চলন, পণ্য সঞ্চলনের পরিমাণ ইত্যাদি। এসব বিষয়ের মধ্যে পতিত হয়ে জিনিসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য আড়ালে চলে যায়, সবকিছু হয়ে ওঠে বোধের অতীত।

'পণ্যের পৌত্তলিকতা' হচ্ছে এমন এক ধারণা, যা উপস্থিত হয় এমন পরিস্থিতিতে, যেখানে ঘটনাসমূহ থাকে সম্পূর্ণ বোধগম্য যখন জিনিস থেকে যায় জিনিস হিসেবে, আর জিনিস যখন পণ্য হয়ে ওঠে তখন হয়ে যায় বোধের অতীত। যখন একটা জিনিস পণ্যে মূর্তিমান হয়ে যায়, তখন যে 'রহস্য' এবং 'বিভ্রান্তি' এই মূর্তিমান রূপ থেকে সৃষ্টি হয়, তাই মানব সমাজের সকল ক্ষেত্রকে ধীরে ধীরে শাসন করতে থাকে।

পণ্যের এই গোপন রহস্যময়তা আবিষ্কার করতে মানুষের কয়েক হাজার বছর লেগে গেছে, যে পণ্য মানুষ নিজেই তৈরি করে চলেছে। ইত্যবসরে পণ্য পৌত্তলিকতা অসংখ্য অর্থনীতিবিদকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুল পথটা যে ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলো : 'মূল্য একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ' এই ধারণা।

একমাত্র মার্কসের অর্থশাস্ত্রের গবেষণায় আত্মনিয়োগের পরেই তার গবেষণা থেকে এক্ষেত্রে একটা যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল : মূল্য কোন জিনিসের প্রাকৃতিক গুণাবলি নয়, এটা ভৌত গুণাবলিও নয়, 'উৎপাদন সম্পর্ক'র মধ্যে সৃষ্ট নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতির কারণে মূল্য সংগঠিত হয় এবং অনাগত ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট প্রকৃতির এমন উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টি হবে যখন এটা উঠে যাবে। এই সত্যটা আবিষ্কারের ফলে, অর্থশাস্ত্রে এতদিন ধরে যেসব ভুল ধারণা চালু ছিল তা উল্টে গেল এবং 'পণ্যের পৌত্তলিকতা' রহস্য নিজেকেই উন্মোচিত করে দিল। অর্থশাস্ত্রে যেসব সমস্যা এতদিন সমাধানের অতীত এবং দুর্বোধ্য অবস্থায় ছিল, তাদের সমাধান এখন পাওয়া গেল।

পণ্য কীভাবে পৌত্তলিকতা সৃজন করে চলেছে, আমরা এই সংক্রান্ত কিছু বিষয় এখানে আলোচনা করবো।

১. বিনিময়ের ঘটনা সমাজে উপস্থিত থাকুক আর না-থাকুক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক একমাত্র 'শ্রম-সম্পর্ক' ব্যতীত আর কিছুই নয়। যখন সমাজে

'বিনিময় ব্যবস্থার উপস্থিতি ছিল না' তখন বিষয়টা মানুষ যেভাবে বুঝতো, 'বিনিময় ব্যবস্থার উপস্থিতি বিদ্যমান থাকায়' মানুষ বিষয়টা সেভাবে বোঝে না। যখন আমরা বলি "যখন কোন বিনিময় ছিল না", এটা এই অর্থ করে না যে 'প্রাচীন কালে যখন বিনিময় শুরু হয়নি'। কয়েক হাজার বছর আগের সেই কালপর্বে মানুষ 'শ্রম' সম্পর্কে কোন ধারণাই পোষণ করতো না। এই ধারণার শুরু হলো এবং শ্রমের দিকটা মানুষের মাথায় আসলো কেবলমাত্র বিনিময় পদ্ধতি সমাজে আসার পরেই। যখন আমরা বলি "মানুষ শ্রম কী সেটা বুঝেছে", এটা এই অর্থ করে না যে সমগ্র মানব জাতি এটা বুঝতে পেরেছে। একমাত্র কতিপয় চিন্তাবিদ যারা অর্থনীতিবিদ্যা চর্চার সাথে যুক্ত, তারা এটা বুঝেছেন, তবে সেটাও অর্ধেক বোঝার মতো ব্যাপার। সেহেতু যদি সকল মানুষ, কেবলমাত্র কতিপয় অর্থনীতিবিদ নয়, শ্রম এবং শ্রম সম্পর্কটা বুঝতো, সেই বোঝাটা অর্ধেক বোঝা না হয়ে যদি সঠিক বোঝা হতো – বিনিময় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এমন অবস্থায় ওসব ঘটা সম্ভব হতো না, বিনিময় ব্যবস্থা উপস্থিত না-থাকা অবস্থায় যা সম্ভব হয়েছে।

ধরে নিলাম, সমাজের সকল মানুষ (নারী এবং পুরুষ) কার্যকর শ্রম সম্পাদন করছেন, বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের যাকিছু প্রয়োজন সেসব সকলে সমবেত ভাবে তৈরি করছেন, এবং ওসব উৎপাদন বিনিময় ছাড়াই নিজেদের ভোগে ব্যবহার করছেন। যদি ঘটনা এভাবে ঘটে, এমন একটা সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে যার ফলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কী তা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে। তখন সকলে এভাবে চিন্তা করবে : "আমি একটা নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করছি। অন্যরা আর এক ধরনের বিভিন্ন কাজ করছে। এভাবে এসব কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি হচ্ছে। সকলে আমরা ওসব তৈরি জিনিস ব্যবহার করছি। আমরা সকল মানুষ, এভাবে একে অপরের শ্রম কাজে লাগাচ্ছি"। মানুষের বোধে থাকা এই প্রকৃতির ধারণা এটাই প্রকাশ করে যে, মানুষের মধ্যে বিদ্যমান 'প্রকৃত সম্পর্ক' (শ্রম-সম্পর্ক) কী সেটা মানুষ এখন বুঝতে পারছে।

আমরা যদি ধরে নিই, মানুষের তৈরি সকল ধরনের জিনিসের মধ্যে বিনিময়ের ঘটনা ঘটে চলেছে, তখন মানুষের সম্পর্ক কী চেহারা নিয়ে মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হবে? আমরা এখন সেটাই দেখবো।

২. ধরে নিলাম, একটা চেয়ারের সাথে একটা কম্বলের বিনিময়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিনিময় একটা "শ্রম সম্পর্ক"-ও বটে। উদাহরণকে সরল করার স্বার্থে আমরা ধরে নিলাম, চেয়ারে নিয়োজিত সকল শ্রম হলো কাঠমিস্ত্রির শ্রম এবং চেয়ারের মালিক (chair-person) সমস্ত শ্রমটা সংগঠিত করেছে। কম্বলের ক্ষেত্রে ধরে নিলাম, কম্বল তৈরির সকল শ্রম হলো বুনন শ্রম এবং কম্বলের মালিক (blanket-person) এই সমস্ত শ্রম সংগঠিত করেছে। অর্থাৎ, এই বিনিময়টা হলো

কাঠমিস্ত্রির শ্রম এবং বুনন শ্রমের মধ্যকার একটা সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয়। চেয়ারের মালিক এটা বুঝেছে যে "অন্য ব্যক্তি যখন কাঠমিস্ত্রির শ্রম ব্যবহার করছে তখন আমি ওই ব্যক্তির বুনন শ্রম ব্যবহার করছি"। কম্বলের মালিকও তার বিষয়টা একই ভাবে অনুধাবন করবে। কিন্তু, বাস্তবে এটা এভাবে ঘটে না। অর্থাৎ, উভয়ে এভাবে বিষয়টাকে অনুধাবনে নিতে পারে না – "এই হলো আমাদের শ্রমের মধ্যকার সম্পর্ক"। তারা এই সম্পর্ককে এমন একটা সম্পর্ক হিসেবে বোঝে, যা পণ্যের মাধ্যমে গাঠনিক রূপ পেয়েছে। কারণ তারা দেখে পণ্য বিনিময়ের ফলে তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে।

চেয়ার-ব্যক্তির চিন্তাটা হবে এমন : "আমি চেয়ারটা তৈরি করেছি, সেহেতু চেয়ারটা আমার। আমি এই চেয়ারের মালিক। প্রত্যেকটা জিনিসের মূল্য থাকবে এটা একটা প্রাকৃতিক বিষয়। আমার চেয়ারেরও একটা মূল্য আছে। মূল্য যা তা ওই চেয়ারের একারই। এটা যেন কোন একজনের এমন চিন্তা : ওজন যেটা তা তো ওই চেয়ারের, রঙটাও ওই চেয়ারের। সুতরাং, যেহেতু চেয়ারটা আমার, এর সকল গুণাবলিও আমার! এভাবে চেয়ারের মূল্য যেমন আমার, কম্বলের মূল্যও কম্বল-মালিকের। যেহেতু চেয়ারের মূল্য এবং কম্বলের মূল্য সমান, আমি চেয়ারটা দিয়েছি এবং কম্বলটা নিয়েছি। এই একই কারণে কম্বল-ব্যক্তি কম্বলটা দিয়েছে এবং চেয়ারটা নিয়েছে। আমার কাছে একটা পণ্য ছিল যার মালিক আমি, তার কাছে অন্য একটা পণ্য ছিল যার মালিক সে। একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার পণ্য এবং আমার পণ্যের মধ্যে। আমার এবং কম্বল-ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক, একটা পণ্য-মালিকের সাথে অন্য একটা পণ্য-মালিকের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়" – চেয়ার-ব্যক্তির বুঝটা হবে এমন। কম্বল-ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মর্মার্থগত দিক থেকে একই প্রকৃতির এমনই একটা ধারণা তৈরি হবে।

চেয়ার-ব্যক্তি চেয়ারের মূল্যটা বিবেচনায় রেখে ধরে নিবে যে "এই মূল্যটা একমাত্র চেয়ারেরই"। কিন্তু, এই মূল্য চেয়ারে কীভাবে আসলো? চেয়ার কি নিজকে নিজেই তৈরি করেছে? না, চেয়ার-ব্যক্তির শ্রমের মূল্যই হলো চেয়ারের মূল্য। এর অর্থ হয় চেয়ারের মূল্য একমাত্র ওই ব্যক্তিরই যে চেয়ারটা তৈরি করেছে। কিন্তু, চেয়ার-ব্যক্তি নিজেই সেটা জানে না। চেয়ার-ব্যক্তি এটা ভাবে না যে, "আমার শ্রমই একমাত্র চেয়ারের মূল্য। যার অর্থ হয়, ওই মূল্যটা আমার"। অধিকন্তু, সে ভেবে নেয় যে ওই মূল্যটা নিয়ে তার কিছুই করার নেই এবং মূল্যটা ওই জিনিসটার এবং সে ওই জিনিসটার মালিক মাত্র।

অর্থাৎ, চেয়ার-ব্যক্তি যে জিনিসটা তৈরি করেছে তার সাথে নিজের সম্পর্ক কী সেটা ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে না। একই ঘটনা ঘটে কম্বল-ব্যক্তির ক্ষেত্রেও।

পণ্যের মালিক যদিও জানে না মূল্য কী, সে দেখে জিনিসটাই ওই মূল্যটার অধিকারী। তারা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র মূল্যের দ্বারা পণ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কটাকেই দেখে। তারা নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কটাকে একমাত্র পণ্যের মধ্য দিয়েই দেখতে পায়।

এর অর্থ হলো, মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক, যে মানুষগুলো বেঁচে আছে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় করে, তাদের নিজেদের অনুধাবনে শ্রম সম্পর্ক হিসেবে উপস্থিত হয় না, উপস্থিত হয় পণ্য-মালিক এমন একটা সম্পর্ক হিসেবে। অর্থাৎ, বিনিময়ের ঘটনা সম্পর্কের প্রকৃত চিত্রটাকে আড়াল করে দেয়।

৩. 'মানুষের সম্পর্ক' হলো একমাত্র 'শ্রম সম্পর্ক', কিন্তু 'রক্তের সম্পর্ক' নয়। রক্তের সম্পর্কটা হলো একটা প্রাকৃতিক সম্পর্ক। রক্তের সম্পর্ক একমাত্র মানুষের মধ্যেই থাকে, তবে পশুদের এবং পাখিদের মধ্যেও থাকে। এই বিবেচনায়, মানুষের মধ্যে এই ক্ষেত্রে কোন বিশেষত্ব নেই। আমরা অতীত থেকে জেনেছি যে মানুষ এবং অন্য জীব-জন্তুর মধ্যে যে পার্থক্য সেটা একমাত্র 'শ্রম সম্পাদন' ক্ষেত্রে। শ্রম দিয়ে জিনিস তৈরি করা এবং এসব উৎপাদিত জিনিস দেওয়া এবং নেওয়ার ভেতর দিয়ে শ্রম দেওয়া-নেওয়ার এসব ঘটনাই মানুষের বিশেষত্বকে সংগঠিত করেছে। সেহেতু, মানুষের সম্পর্ক হলো একমাত্র 'শ্রম সম্পর্ক'। তাই রক্তের সম্পর্ক হলো প্রাকৃতিক সম্পর্ক এবং শ্রম-সম্পর্ক হলো 'সামাজিক সম্পর্ক'।

'সমাজ' হলো মানব জাতির 'সমবেত সংগঠন'। এই সংগঠন অন্য জীব-জন্তুর সংগঠনের মতো নয়। এটা এমন এক সংগঠন যেখানে শ্রম-সম্পর্কের উপস্থিতি রয়েছে। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এই শ্রম সম্পর্কটা নিজেই হলো সামাজিক সম্পর্ক। সমাজকে প্রকৃত অর্থে বুঝতে হলে আমাদের এর সাথে সম্পর্কিত আরও অনেক বিষয়কে বুঝতে হবে, আপততঃ এটাই যথেষ্ট।

ধরা যাক, কোন ব্যক্তি একাই একটা জঙ্গলে বসবাস করছে এবং বনের ফল-মূল খেয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। এর অর্থ হলো ওই ব্যক্তি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহ করার কাজে তার শ্রম সম্পাদন করছে। ধরে নিলাম, অন্য এক ব্যক্তিও জঙ্গলে বাস করছে এবং সে আরও কিছু বস্তু এবং জিনিস তৈরি করে ও ব্যবহার করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। এর অর্থ হলো, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির তুলনায় অধিক ধরনের শ্রম সম্পাদন করছে। এই ২টা উদাহরণে দুই ব্যক্তির কেউই নিজের শ্রম অন্যকে দিচ্ছে না বা অন্যের শ্রম নিজেও নিচ্ছে না। যেহেতু, এখানে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে এবং অন্য মানুষের সঙ্গে তাদের কোন প্রকারের শ্রম সম্পর্কের উপস্থিতি আমরা দেখছি না, তাই এখানে তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্কও আমরা দেখছি না।

৪. আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে বিনিময় প্রকৃত সম্পর্ককে আড়াল করে দেয়। প্রকৃত সম্পর্ককে আড়াল করার এই ঘটনা বেশি ঘটে যেখানে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ঘটনা বেশি ঘটে, বার্টার পদ্ধতিতে সংঘটিত বিনিময়ের তুলনায়। ধরে নিলাম বার্টার পদ্ধতিতে চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে একটা বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। এই বিনিময়ের ঘটনায় কেবলমাত্র ২ জন ব্যক্তির উপস্থিতি থাকে। প্রথম ব্যক্তির জিনিস এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জিনিসের মধ্যে সামনা-সামনিই বিনিময় ঘটছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে বার্টার পদ্ধতিতে বিনিময়, মূল্যের বিনিময়ের রূপেই একমাত্র সংঘটিত হয় না, ব্যবহার-মূল্য বিনিময়ের রূপেও সংঘটিত হয়। এখানে কম্বল-ব্যক্তি এবং চেয়ার-ব্যক্তি উভয়ের জন্য "আমাদের একে অপরের জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে, তাই আমরা একে অপরের জিনিস নিচ্ছি" – এটা বোঝার একটা সুযোগ থাকে। যদিও এই ব্যক্তিরা 'শ্রম সম্পর্ক' হিসেবে তাদের সম্পর্কটাকে অনুধাবন করতে পারে না, তারা অন্তত এটা বুঝতে পারে যে "একজনের অভাব অন্য ব্যক্তি পূরণ করছে"। কিন্তু, একই বিনিময়ের ঘটনা যদি অর্থের মাধ্যমে ঘটতো, ওই ব্যক্তিরা এই ন্যূনতম বিষয়টিও অনুধাবন করতে পারতো না।

আমরা এখন চেয়ার-ব্যক্তির দিক থেকে অর্থের মাধ্যমে একটা চেয়ার বিক্রয়ের এবং একটা কম্বল ক্রয়ের ঘটনায় কী ঘটে সেটা দেখবো। প্রথমে চেয়ারটা বিক্রি করা হলো। এটা হলো চেয়ার এবং অর্থের মধ্যে একটা বিনিময়। এখন কম্বলটা ক্রয় করতে হবে। এটা হবে অর্থ এবং কম্বলের মধ্যে একটা বিনিময়। এভাবে চেয়ার-ব্যক্তি কম্বলটা পেয়ে যাবে। কিন্তু, কম্বল-ব্যক্তি চেয়ারটা এক্ষেত্রে পাচ্ছে না। চেয়ারটা চলে যাচ্ছে অন্য এক ব্যক্তির কাছে।

এই লেনদেনের ঘটনায় ২টা জিনিস চেয়ার এবং কম্বল সামনা-সামনি বিনিময় করা হচ্ছে না। একজন অন্য ঘটনাটা দেখতে পারছে না। বার্টার পদ্ধতিতে ২ ব্যক্তির উপস্থিতিই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখানে ৩ ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন হচ্ছে।

আমরা নিচের উদাহরণটা দেখতে পারি :

চেয়ারের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি = প্রথম ব্যক্তি
কম্বলের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি = তৃতীয় ব্যক্তি
ভুট্টার সাথে সম্পর্কিত ব্যাক্তি = দ্বিতীয় ব্যক্তি
শস্যের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি = চতুর্থ ব্যক্তি

এই ৪ জন ব্যক্তি ৪টা জিনিস তৈরি করেছে।

ধরা যাক, চেয়ার-ব্যক্তি তার পণ্যটা ভুট্টা-ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেছে এবং প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কম্বলটা কিনেছে। ধরে নিলাম কম্বল-ব্যক্তি কম্বলটা বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে শস্য ক্রয় করেছে।

এই সমগ্র লেনদেনের ঘটনায়, যদি আমরা চেয়ার-বিক্রয়কারীর দিক থেকে দেখি, চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যেকার একটা বিনিময়ের ঘটনা হিসেবে এটা প্রতিভাত হবে, কারণ যেহেতু সে চেয়ারটা বিক্রি করেছে এবং কম্বল কিনেছে। কিন্তু, ওই ব্যক্তি যে চেয়ারটা ক্রয় করেছে তার দিক থেকে যদি দেখি, এটা চেয়ার এবং ভুট্টার মধ্যেকার একটা বিনিময়ের ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হবে, কারণ যেহেতু সে চেয়ারটা কিনেছে এবং ভুট্টা বিক্রি করেছে। বাস্তবে, এখানে চেয়ার এবং ভুট্টা অথবা চেয়ার এবং কম্বলের মধ্যে সামনা-সামনি, অর্থাৎ সরাসরি কোন বিনিময় ঘটেনি। প্রত্যেকটা জিনিস এখানে প্রথমে একমাত্র অর্থের সাথে বিনিময় করা হয়েছে – ভুট্টা অর্থের সাথে, চেয়ারও অর্থের সাথে, কম্বলও অর্থের সাথে এবং শস্যও অর্থের সাথে। এভাবে এখানে প্রত্যেকটা জিনিস অর্থের সাথে বিনিময় করা হয়েছে অন্য কোন জিনিসের সাথে নয়। কীভাবে এখানে ৪টা পণ্যের বিনিময়ের ঘটনা ঘটলো? ভুট্টার মালিক চেয়ার পেয়েছে, চেয়ারের মালিক কম্বল পেয়েছে এবং শস্যের মালিক অন্য জিনিস পেয়ে গেছে। প্রথম ব্যক্তি তার জিনিসটা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিয়েছে এবং তৃতীয় ব্যক্তির জিনিসটা নিয়েছে। একই ভাবে, তৃতীয় ব্যক্তি তার জিনিসটা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিয়েছে। এর অর্থ হলো, এখানে কোন দুটা জিনিস সামনা-সামনি বিনিময় করা হয়নি। যদিও জিনিসের বিনিময় এখানে সরাসরি ঘটেনি, তবে এটা বিনিময়ের ঘটনাই বটে। অর্থাৎ, এটাও 'একটা জিনিস দেওয়া এবং আর একটা জিনিস নেওয়ারই' ঘটনা। কিন্তু, এখানে জিনিসের মধ্যকার সম্পর্ক জিনিসের মালিকদের কাছে পরিষ্কার ভাবে প্রতিভাত হয়নি।

চেয়ার এবং কম্বল নামের এসব জিনিসের ক্ষেত্রে এখানে কী ঘটনা ঘটেছে? 'চেয়ার-ব্যক্তি (chair-person)' কম্বলটা পেয়েছে কিন্তু 'কম্বল-ব্যক্তি (blanket-person)' চেয়ারটা পাইনি। অথচ 'ভুট্টা-ব্যক্তি (maize-person)' চেয়ারটা পেয়েছে।

'চেয়ার-ব্যক্তি' চেয়ারটা বিক্রি করে টাকা পেয়েছে, সে কি ওই টাকার দিকে তাকিয়েছে, সে কি জানে ওই জিনিসটা কী যা বিক্রি করে তার প্রাপ্ত টাকাটা (ভুট্টা বিক্রি করে প্রাপ্ত টাকাটা) এসেছে? সে জানে না। সেই ঘটনা 'টাকা' মাধ্যম হিসেবে উপস্থিত হওয়ার কারণে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে না। এখানে 'চেয়ার-ব্যক্তি' একমাত্র যে ঘটনাটা দেখে তা হলো : চেয়ারটা বিক্রি করা এবং তার পরিবর্তে টাকাটা পাওয়া। সে চিন্তা করে "আমি টাকাটা পেয়েছি কারণ আমি চেয়ারটা বিক্রি করেছি সেজন্য"। কিন্তু, সে চিন্তা করে না "এখানে চেয়ার এবং ভুট্টার মধ্যে একটা বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে"। এর কারণ হলো সে তো ভুট্টা গ্রহণ করেনি।

পরের ধাপে 'চেয়ার-ব্যক্তি' যখন কম্বলটা ক্রয় করে, সে পুনরায় টাকা এবং কম্বলের মধ্যে একটা বিনিময়ের ঘটনা দেখে। সে চিন্তা করে "আমি আমার টাকা দিয়ে কম্বলটা কিনেছি"। কিন্তু, সে চিন্তা করে না "এখানে ইতিমধ্যে আমার চেয়ার

এবং কম্বলের মধ্যে একটা বিনিময়ের ঘটনা ঘটে গেছে"। এর কারণ হলো তার চেয়ারটা তো আর কম্বল-ব্যক্তির কাছে যাচ্ছে না।

অথবা চেয়ার-ব্যক্তি অন্য ভাবে কি এমন চিন্তা করে? –"আমার চেয়ারটা কারো-না-কারো কাছে পৌঁছে গেছে। একটা কম্বল যা কেউ-না-কেউ তৈরি করেছে, সেটা আমার কাছে এসেছে। ওই কম্বল-ব্যক্তিও কোন-না-কোন জিনিস পেয়ে গেছে। এভাবে সকল বিনিময়, যা টাকার মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে, তা জিনিসের মধ্যকার বিনিময়ও বটে। আমরা সকলে, মানব জাতি, একে অপরের জিনিস ব্যবহার করে চলেছি"। এভাবে কি সে চিন্তা করে? 'চেয়ার-ব্যক্তি' এত স্পষ্ট ভাবে ঘটনাটা অনুধাবন করতে পারে না। সে এসব ঘটনা নিয়ে সচেতন থাকে না : তার চেয়ারটা কোথায় গেল এবং কোথা থেকে সে কম্বলটা পেল। তার মনোযোগ এই ঘটনাতেই একমাত্র সীমাবদ্ধ থাকে : ক্রয় এবং বিক্রয়। "আমি জিনিসটা বিক্রি করেছি; আমার টাকা দিয়ে অন্য একটা জিনিস কিনেছি" – এমনটাই কোন ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয় এবং বোধগম্য হয়।

'চেয়ার-ব্যক্তি'র ধারণা কী হবে, তা হবে এই যে : যখন সে তার জিনিসটা বিক্রি করেছে, সে হলো বিক্রেতা এবং অন্য ব্যক্তি হলো ক্রেতা। তদ্রূপ, যখন সে নিজেই একটা জিনিস ক্রয় করে সে হয়ে যায় ক্রেতা এবং অন্য জন হয় বিক্রেতা। এই তো সব। অর্থাৎ, 'চেয়ার-ব্যক্তি' এবং অন্যদের মধ্যকার সম্পর্কটা 'চেয়ার-ব্যক্তি'র কাছে কী ধারণা নিয়ে উপস্থিত হয় : "সম্পর্কটা গঠিত হয় একমাত্র জিনিসের ক্রয় এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই"। বার্টার পদ্ধতিতে উপস্থিত থাকা সম্পর্কটা (যেখানে একজনের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হয়), অর্থের মাধ্যমে সংঘটিত বিনিময়ের ঘটনায় আড়াল হয়ে যায়।

যেহেতু সকল মানুষ যারা জিনিস উৎপাদন করে, তারা তাদের জিনিস ব্যবহার করতে সক্ষম হয় ক্রয় এবং বিক্রয়ের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, ওসব ব্যক্তিদের মধ্যকার সম্পর্কটা একমাত্র 'ক্রয় এবং বিক্রয়ের সম্পর্ক' হিসেবে হাজির হয়। কোন ব্যক্তি অন্যদের সাথে বিদ্যমান সম্পর্কটাকে এই পর্যন্তই অনুধাবন করতে পারে।

কিন্তু, 'ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্ক' অবশ্যই 'জিনিসের মধ্যকার সম্পর্ক'-ও বটে। সকল জিনিসের মধ্যকার সম্পর্ক একমাত্র 'শ্রম সম্পর্ক'-ও বটে। অর্থাৎ 'মানুষের সম্পর্ক' একমাত্র 'শ্রম সম্পর্ক'। কিন্তু, যেসব ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কের মধ্যে উপস্থিত থাকে, পণ্যগুলোর এই শারীরিক উপস্থিতির কারণে এই সম্পর্কের বাইরে ওই ব্যক্তিরা যেতে পারে না এবং 'প্রকৃত সম্পর্ক' কী তা অনুধাবন করতে পারে না।

৫. 'মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক' হলো কেবলমাত্র শ্রম সম্পর্ক, সেখানে বিনিময় উপস্থিত থাকুক আর না থাকুক। যাহোক, ওসব শ্রম সম্পর্ক কীভাবে অবস্থান করে : 'মূল্য-মুখী' সম্পর্ক হিসেবে যখন বিনিময়ের উপস্থিতি থাকে এবং 'ব্যবহার মূল্য-

মুখী' সম্পর্ক হিসেবে যখন কোন বিনিময়ের উপস্থিতি থাকে না। যখন সমাজে বিনিময়ের ঘটনা ঘটতে থাকে মানুষ অহর্নিশ শুধুমাত্র অর্থ ও পণ্যের মধ্যকার বিনিময়ের ঘটনাই দেখে। এই কারণে মানুষের চেতনায় এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় : "মানুষের মধ্যকার সম্পর্কটা কেবলমাত্র অর্থের সম্পর্ক। এসব সম্পর্ক সব সময় এমন প্রকৃতির সম্পর্ক যা ক্রয় এবং বিক্রয়ের দ্বারা গঠিত হচ্ছে"। সেহেতু, যত দিন সমাজে বিনিময়ের অস্তিত্ব থাকবে, মানুষের মধ্যকার সম্পর্কটা আড়ালেই থেকে যাবে, মানুষের কাছে স্পষ্ট ভাবে বোধগম্য হিসেবে প্রকাশিত না হয়ে।

৬. সমাজে যখন বিনিময়ের অস্তিত্ব থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তি যার কাছে পণ্য আছে বা পণ্য উৎপাদন করে ওই পণ্যের মালিক হয়, এসব থেকে কিছু পণ্য বিক্রি করবে এবং এই পণ্যের পরিবর্তে পাওয়া টাকা দিয়ে তার অভাব পূরণ করতে অন্য জিনিস ক্রয় করবে এবং নিজে ভোগ করবে। সেহেতু, এমন সমাজে যেখানে বিনিময়ের অস্তিত্ব আছে, সেখানে ব্যক্তির শ্রম অন্য কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার এবং নিজ কর্তৃক অন্যের শ্রম ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে কেবলমাত্র যদি তার জিনিস বা উৎপাদন বিক্রি হয়। ধরে নিলাম ১০ জন তাঁতি আলাদা ভাবে কিছু কাপড় উৎপাদন করেছে এবং আলাদা ভাবে কিছু কাপড় ক্রয় করেছে এসব বিক্রি করার জন্য। এখানে স্মরণ রাখতে হবে উভয় কাপড়ের রয়েছে একই প্রকৃতির ব্যবহার-মূল্য। ধরে নিলাম, কিছু কাপড় অবিক্রিত থেকে গেছে। ধরা যাক, সমস্ত অবিক্রিত কাপড় একজনের ভাগে পড়েছে। (অথবা ধরা যাক, অন্য সকলের পণ্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ অবিক্রিত থেকে গেছে। যেভাবেই আমরা ধরি না কেন মূল বিষয়টা একই থেকে যাবে)। যে ব্যক্তি তার জিনিস বিক্রি করতে পারলো না সে অন্য জিনিস ক্রয়ও করতে পারবে না যা তার প্রয়োজন। এর অর্থ হলো, যেহেতু একজনের পণ্য অবিক্রিত থেকে গেছে, অন্য ব্যক্তিদের সাথে তার সকল শ্রম সম্পর্ক থেমে গেছে। এমন সমাজ যেখানে বিনিময়ের মাধ্যমে জিনিস ব্যবহার করা হয়, এই সমাজে প্রত্যেক উৎপাদককে একটা 'সাগর' পাড়ি দিতে হয় যার নাম হলো 'বিনিময়'। একমাত্র এই 'সাগর' পাড়ি দিয়ে একজনের শ্রম অন্যের কাছে পৌঁছাতে পারে। অন্যথায়, এমনকি সকল জিনিস যদি প্রস্তুতও থাকে, এমন কোন পরিস্থিতি থাকবে না যাতে করে মানুষ তাদেরকে ব্যবহার করতে পারবে।

৭. ব্যক্তি শ্রমের জন্য এটা একটা 'সামাজিক চরিত্র' যার ফলে ওই শ্রমটা কেবল শ্রমদাতার কাজে ব্যবহৃত হয় না অন্যের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। যখন অন্যদের জন্য কোন ব্যক্তির উৎপাদনের উপযোগিতা, শুধুমাত্র ওসব উৎপাদনের বিনিময়ের উপর নির্ভর করে, তখন ওই ব্যক্তির শ্রমের সামাজিক চরিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বিনিময় একটা বড় 'বাধা' হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এমন একটা সমাজ কল্পনা করে নিলাম যেখানে বিনিময় ছাড়াই জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে। সেখানে এমন কোন পরিস্থিতি থাকবে না যাতে করে একজনের শ্রম তার সামাজিক চরিত্র

হারাবে, যা অন্যের জন্য কাজেরও বটে। এর অর্থ হলো, এমন কোন পরিস্থিতি কখনও সেখানে থাকবে না যেখানে কোন একটা পর্যায়ে মানুষের সম্পর্ক থেমে যাবে, এই কারণে যে একজন তার শ্রম অন্যকে দিতে পারছে না এবং অন্যের শ্রম সে নিজের জন্য নিতে পারছে না।

এমন সমাজ যেখানে বিনিময়ের অস্তিত্ব রয়েছে, ব্যক্তির সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন থাকবে কেবলমাত্র পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় চালু থাকলে; সেহেতু এখানে 'পণ্য-সম্পর্ক' হয়ে দাঁড়ায় 'প্রধান সম্পর্ক'।

৮. কোন জিনিসের মূল্য ধারন কোন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, বিজ্ঞান কর্তৃক এই সত্যটা আবিষ্কারের পরেও, মানুষের কাছে এটাই প্রতিভাত হয়েছে যে জিনিসের মূল্য ধারন করা একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এর কারণ হলো মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে মূল্য পরিশোধ না করে কোন জিনিস কখনও পায় না। যখন একটা 'সত্য' কেবলমাত্র 'তত্ত্বে' পরিদৃষ্ট হয় না, বাস্তব 'অনুশীলনে'ও পরীক্ষিত হয়, কেবলমাত্র তখনই সত্যটা সমাজের সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তাই বলা যায়, জিনিসের মূল্য ধারন করা কোন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয় – এই সত্যটা কেবলমাত্র তত্ত্বেই প্রমাণিত হয়েছে (যুক্তির নিরিখে)। আমাদের সক্ষম হতে হবে 'বাস্তব' অনুশীলনেও এই তত্ত্বটাকে সত্য হিসেবে দেখতে। এর অর্থ হলো, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মূল্য পরিশোধ ছাড়াই জিনিস ব্যবহারের মতো সুযোগ পেতে হবে (ক্রয় এবং বিক্রয় ছাড়া)। এটা তখন তত্ত্বকে বাস্তবে দেখার মতো হবে; তখনই কেবলমাত্র এই সত্যটা পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৯. জিনিসের মূল্য ধারন করা কোন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, এই সত্যটা যুক্তির নিরিখে যারা বিশ্বাস করে, এমনকি তাদের ক্ষেত্রেও মূল্য ধারন একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থিত হয়। ঘটনাটা এই বর্ণনার সম-প্রকৃতির : "সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না বরং পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে" এই সত্যটা জানার পরেও এটা মনে হয় যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। যদিও আমরা আমাদের চিন্তার ক্ষমতা ও চেতনাবোধ দিয়ে এটা জানতে সক্ষম হয়েছি যে সূর্য নয় পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, আমরা তবুও একটা ঘোরের মধ্যে থাকি, যখন প্রতিদিন আমরা সূর্য এবং পৃথিবীকে লক্ষ্য করি, এবং মনে হয় যেন-বা সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। এর অর্থ হলো, আমরা চেতনাবোধ দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে যা জানতে পারি না, সেটাই একই চেতনাবোধ দিয়ে 'যুক্তির নিরিখে' জানতে পারি। এর অর্থ হলো প্রকৃতির একটা সত্যকে আমরা জানতেও পারি না-ও জানতে পারি, যে সত্যটা কয়েকটা বিশেষত্বের সমাহার এবং এটা জটিলও বটে। বিজ্ঞানের যেকোন বিষয় সম্পর্কে একই ঘটনা। একই ভাবে, মূল্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একই

ঘটনা। যদিও আমরা যুক্তির নিরিখে বিশ্বাস করি 'মূল্য' হলো অপ্রাকৃতিক, আমরা দৈনন্দিন জীবনে এই ভ্রান্তিতে পড়ি যে মূল্য হলো প্রাকৃতিক।

যাই হোক, 'প্রাকৃতিক ঘটনা'র সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভ্রান্তি এবং 'সামাজিক ঘটনা'র সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভ্রান্তির মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে। প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভ্রান্তিকে কখনও নিরসন করা যায় না, কিন্তু সামাজিক ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভ্রান্তিকে নিশ্চিতভাবে বাতিল করা যায় যদি এর অনুকূলে উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

১০. প্রশ্ন হলো : মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বিভিন্ন জিনিসের দরকার হয়। কিন্তু, একজন ব্যক্তি সকল ধরনের জিনিস তৈরি করতে পারে না। তাকে অন্যদের কাছ থেকে অন্যান্য জিনিস নিতে হয়। একই ভাবে, তাকে অন্যদের তার তৈরি জিনিস দিতে হয়। এর অর্থ হলো, তাকে বিনিময়ের মধ্যে যেতে হয়। এসব কারণে জিনিস পণ্য হয়ে যায়। মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা এক অপরিহার্য বাস্তবতা, এমনটাই কি নয়? বিনিময় ছাড়া মানুষের অভাব পূরণ কীভাবে সম্ভব? – এই হলো প্রশ্নটা। এই প্রশ্নের জবাব পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক ভাবে পেতে হলে আমাদেরকে *"ক্যাপিটাল"* গ্রন্থের আলোচিত বিষয়গুলো শেষ অবধি জানতে হবে। এর সমস্ত বিষয়বস্তু না জেনে, এই প্রশ্নের উত্তর নিজ থেকে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু, বর্তমান মুহূর্তের জন্য আমরা নিজেদেরকে সংক্ষেপে যা বলতে পারি তা হলো :"এটা এই অর্থ করে না যে, বিনিময় ছাড়া এমন একটা সমাজ, যার কল্পনা আমরা করছি, মানুষের মধ্যে বিদ্যমান 'শ্রম বিভাজন' ওই সমাজে একই রূপে থাকবে না যেমনটা বর্তমান সময়ে রয়েছে। জিনিস পণ্যে রূপান্তরিত হবে না এমন একটা সামাজিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে, অর্থাৎ বিনিময়ের প্রয়োজনকে পরিহার করতে, বর্তমান সময়ের 'শ্রম বিভাজন' ব্যবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আমরা এই আলোচনায় যতই এগিয়ে যাব এর বাস্তবায়নের সম্ভাব্য রূপরেখা ততই আমরা জানতে পারবো। ওই ধরনের 'শ্রম বিভাজন' ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকলে, জিনিসের জন্য পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন হবে না"।

বর্তমান মুহূর্তের জন্য আমরা 'আদিম সমাজ' ব্যবস্থার কথা স্মরণ করতে পারি, যেখানে মোটের উপর কোন 'বিনিময়' শুরু হয়নি। যখন আমরা বলি ওই সমাজে কোন বিনিময়ের অস্তিত্ব ছিল না, এর অর্থ কি এই হয় যে সেখানে জিনিসের কোন অস্তিত্ব ছিল না? না, যদিও সেখানে জিনিস ছিল, সেসব বিনিময় ছাড়াই ব্যবহৃত হতো। এটা সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে একটা গোত্রের সকল মানুষ 'যূথবদ্ধ' হয়ে বসবাস করতো। কয়েক সদস্য শিকার করতো, অন্য কয়েক সদস্য পশু পালন করতো আর অন্যরা বনের বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করতো। একই গোত্রের

সকল মানুষ এভাবে সংগৃহীত জিনিস সবাই মিলে একত্রে ব্যবহার করতো। এটাই হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থার ভ্রূণ-রূপ যেখানে জিনিস পণ্যে রূপান্তরিত হয় না। আমাদেরকে এই ব্যবস্থার অনেক বিকাশ ঘটাতে হবে, যা রয়েছে ভ্রূণ স্তরে, অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত কয়েকটা মৌলিক নীতিমালাকে আয়ত্ত করে। এটা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন এই ব্যবস্থার উপযোগী অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা যাবে।

সকল সক্ষম মানুষ একটা পরিকল্পনা মোতাবেক সকল ধরনের জিনিস (যাকিছু সমাজের জন্য প্রয়োজন) সমবেত ভাবে উৎপাদন করছে এবং যদি এভাবে উৎপাদিত এসব জিনিস ব্যক্তিগত মালিকানায় না থাকে, আর সকল মানুষ এসব জিনিস সম্মিলিত ভাবে ভোগ করে, তখন একটা জিনিসের পক্ষে পণ্যে রূপান্তরিত না হওয়াটা সম্ভব। এর অর্থ হয়, সমস্ত উৎপাদকরা অবশ্যই সমাজের সকল সমবেত উৎপাদনের 'যৌথ মালিক' হবে। এই বিষয় প্রসঙ্গে 'রবিনসন ক্রুসো'র কাহিনিটা আমরা এখন দেখতে পারি, যে কাহিনি যুগে যুগে সকল অর্থনীতিবিদের মনযোগ আকৃষ্ট করেছে।

'রবিনসন ক্রুসো' একটা ইংরেজি উপন্যাস, ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে ডেনিয়েল ডিফো (Daniel Defoe) লেখেন। গল্পটা হচ্ছে এমন : রবিনসন ক্রুসো নামের এক যুবক সমুদ্র-অভিযানে খুবই আগ্রহী ছিলো। একদা সে এক সমুদ্র অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে, পথিমধ্যে ঝড়ে তার জাহাজটা ভেঙে গেল এবং সাগরের ঢেউ তাকে এক অজানা দ্বীপের কূলে নিয়ে আছড়ে ফেলল। পরের দিন ভাঙ্গা জাহাজটাও উপকূলে এসে আছড়ে পড়লো। রবিনসন জাহাজটার কাছে গেল এবং জাহাজের ভেলায় থাকা কিছু খাদ্য-খাবার, কাঠমিস্ত্রির কিছু যন্ত্রপাতি, কয়েকটা তরবারি, একটা বন্দুক, কিছু বিস্ফোরক এবং আরও অনেক জিনিস সে সংগ্রহ করে নিল। একটা দীর্ঘ সময় একাকী সে ওই দ্বীপে কাটিয়ে দিল এবং অবশেষে একদিন উদ্ধার পেল।

যখন সে এই মনুষ্যবিহীন নির্জন দ্বীপে ছিল, তাকে একাকী অনেক জিনিস বানাতে হয়েছে। রবিনসন একাকী জীবনে যখন ওই দ্বীপে যেসব বিভিন্ন শ্রম সম্পাদন করেছিল, ওই শ্রম নিয়ে অর্থনীতিবিদরা নিজের মতো করে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা যুগে যুগে দাঁড় করিয়েছেন।

রবিনসন তার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন কাজ করেছে। সে অনেক কার্যকর শ্রম সম্পাদন করেছে, যেমন : পশু শিকার, মাছ ধরা, একটা ঘর বানানো, রান্না করা এবং ছাগল লালন-পালন। সে প্রার্থনাও করেছে। কিন্তু, যেহেতু এই প্রার্থনা তাকে কোন ব্যবহার-মূল্য দেয়নি, আমাদের ওসবে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই। রবিনসনের সম্পাদিত শ্রম যত ধরনের, যত প্রকারের, যত সংখ্যারই হোক না-কেন, এই সমগ্র শ্রমটা হলো একক ব্যক্তির শ্রম। একটা শ্রম সম্পাদন

করে সে থামতে পারতো না, কারণ তার প্রয়োজন একটাই ছিল না। সে একটা ঘর বানিয়েই শান্ত হয়ে অবসর নিতে পারতো না। অথবা মাছ ধরার পর সে বসে থাকতে পারতো না। তার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে তাকে ওই কাজটা করতে হতো। যেহেতু প্রয়োজন বিভিন্ন প্রকৃতির, আমরা তার 'শ্রম'-কে বিভিন্ন ধরনে ভাগ করতে পারি।

যদি রবিনসন ১০ ধরনের শ্রম সম্পাদন করে থাকে, সে সময়কে নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করে সেসব কাজ করেনি : প্রত্যেকটা কাজ ১ ঘন্টা বা ২ ঘন্টা ধরে। একটা কাজ হয়তো অধিক সময় নিয়েছে, অন্য একটা কাজ হয়তো কম সময় নিয়েছে। এটা নির্ভর করেছে ওই কাজের ধরন এবং ওই দ্বীপের পরিস্থিতির ওপর। সে তার অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে একটা কাজ করতে কত সময় লাগে।

রবিনসন জাহাজের ভেলা থেকে সংগ্রহ করেছিল একটা ঘড়ি, একটা নোট-বই, কলম এবং কালি। যখন ওই দ্বীপে তার একাকী জীবন শুরু হলো, সে প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা লিখে রেখেছে। ওই সমস্ত জিনিসের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের একটা তালিকাও সে লিখে রেখেছে। সে ওসব জিনিস তালিকা অনুযায়ীই তৈরি করতো। রবিনসন এবং তার সম্পদ, যা এতদিন ধরে সে তৈরি করেছে, এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝাটা কোন কষ্ট ছাড়াই আমাদের জন্য খুবই সহজ। সে তার বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতে নানা প্রকৃতির শ্রম দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতো। তার কাছে এসব জিনিসের কেবলমাত্র ব্যবহার-মূল্যই ছিল। এটা বুঝতে কোন বিভ্রান্তিতে পড়তে হয় না।

ধরা যাক, জাহাজ ভাঙার সময় আরও কিছু মানুষ তার সাথে ওই দ্বীপে এসেছিল। ধরে নিলাম, তারা সবাই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করছিল, তাদের প্রত্যেকে সম্মিলিত ভাবে তার সাধ্যমতো শ্রম দিচ্ছিল এবং এভাবে তৈরি বিভিন্ন জিনিস তারা একত্রে ব্যবহার করেছিল। কী ধরনের সম্পর্ক তাদের মধ্যে রয়েছে, এ সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল।

ধরা যাক, ওই ব্যক্তিদের প্রত্যেকে আলাদা ভাবে জিনিস তৈরি করছে, তার তৈরি জিনিসের মালিক সে নিজেই হচ্ছে এবং নিজের তৈরি জিনিস দিয়ে অন্যের কাছ থেকে বিনিময়ের মাধ্যমে তার তৈরি জিনিসটা নিচ্ছে। এর অর্থ হয়, তাদের প্রত্যেককে এখন মূল্যের বিভ্রান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

যদি রবিনসনের তৈরি জিনিস বিভিন্ন মালিকের সম্পত্তি হয়ে যায় এবং ওসব জিনিসের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হলো এমনটা যদি আমরা ধরে নিই, তখন বহু বিভ্রান্তি ওই দ্বীপে সৃষ্টি হবে। কারণ বিভিন্ন জিনিসের শ্রম সময় বিভিন্ন, তাই বিভিন্ন জিনিসের মূল্যও বিভিন্ন হয়ে যাবে। এই বিভ্রান্তি মারামারি, হত্যা এবং যুদ্ধ ডেকে

আনতে পারে। রবিনসনের তৈরি জিনিসের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা এসে যাবে। কিন্তু, যখন সে একাই ওসব জিনিসের মালিক ছিল এবং তার কাছে এসব জিনিসের মূল্যের কোন প্রশ্ন ছিল না, সে 'মূল্য'র বিপদের হাত থেকে তখন মুক্ত ছিল।

মূল্যের বিপদের মধ্যে পতিত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে সবচেয়ে সঠিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সর্বোত্তম সমাধান হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সমাজের সবাই সম্মিলিত পরিকল্পনায় উৎপাদন করবে এবং উৎপাদিত জিনিস সম্মিলিত ভাবে নিজেদের কাজে লাগাবে।

যখন আমরা 'যৌথ জীবন'-এর কথা বলি, এই কথা বলে আমরা এটা বুঝাতে চাই না যে এটা যে-কোন যুগে সম্ভব। এটা এই অর্থ করে না যে এটা বার্টার পদ্ধতির যুগে শুরু হতে পারে, অথবা পরবর্তী কোন এক স্তরে। কারণ হলো মানব জাতি তখনও তো মূল্যের বিভ্রান্তিতে পতিত হয়নি, তাই এটা শুরু হতে পারে না।

এটা এই অর্থও করে না যে আগামী 'যৌথ জীবন' আদিম যুগের সেই যৌথ জীবনে ফিরে যাওয়া। আদিম যুগের যৌথ জীবন এবং আমরা আগামী যে যৌথ জীবনের কথা আলোচনা করছি, এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে বহু পার্থক্য। সেই প্রাচীন কালে আমাদের পূর্ব পুরুষদের মূল্যের ভিত্তি কি সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। আমাদের পূর্ব পুরুষদের যৌথ জীবন ছিল পশুদের যৌথ জীবনের প্রায় কাছাকাছি। আমরা আগামী যে যৌথ জীবনের কথা বলছি তার সাথে আদিম যৌথ জীবনের কোন মিল নেই। বর্তমান সময়ে আমরা শ্রমের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সকল ঘটনা সম্পর্কে পরিচিত। এখন আমরা অর্থশাস্ত্রের সকল নীতিমালা সম্পর্কে কম-বেশি অবগত রয়েছি। এখন যৌথ জীবনের উপযোগী উৎপাদনে দক্ষ জনশক্তির বিকাশ ঘটেছে। সেহেতু, ভবিষ্যতের যৌথ জীবন হবে এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা মানব জাতি গড়ে তুলবে একটা পরিষ্কার স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে।

আমরা পরবর্তী অংশে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, যেমন : কোন্ ধরনের পরিস্থিতি যৌথ জীবনকে সম্ভব করে তুলবে, আর মানুষের মধ্যে বর্তমান কালে বিদ্যমান রয়েছে এমন সব দ্বন্দ্ব, কীভাবে কোন্ পথে এসবের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে আগামীর প্রত্যাশিত ওই ব্যবস্থা বা সমাজকে সম্ভব করতে।

মূল্যের অস্তিত্ব রয়েছে এমন সমাজ থেকে মূল্যের উপস্থিতি থাকবে না এমন সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার 'বিবর্তন প্রক্রিয়া' হলো একটা প্রলম্বিত দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যেখানে পৌঁছাতে মানব সমাজকে কয়েকটা স্তর পার হতে হবে। এই প্রক্রিয়ার সূচনা পর্যায়ে সমাজের উৎপাদন উপায়ের সকল মাধ্যমকে সমাজের 'যৌথ সম্পত্তি'তে রূপান্তরিত করতে হবে, আর এই প্রক্রিয়া চালু থাকবে যতক্ষণ এমন সামাজিক অবস্থা না আসবে, যেখানে কিছু মানুষ 'মালিক-প্রভু' আর অধিকাংশ মানুষ

'দাস'-এরও অধম এর পরিবর্তে সকল মানুষ হবে 'স্বাধীন' মানুষ এবং 'সমানাধিকারপ্রাপ্ত' মানুষ। এই সামাজিক অবস্থা প্রকৃত যৌথ জীবনকে বাস্তব রূপ দেবে, বলা যায়। যখন সমাজ এমন একটা স্তরে পৌঁছাবে, কেবলমাত্র তখন থেকে জিনিসের পণ্যে রূপান্তর প্রক্রিয়া থেমে যাবে। আমরা যতই এই আলোচনায় সামনে এগিয়ে যাব, এসব বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ বহু ধারণা আমরা পেয়ে যাব। এর আগে আমরা এসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক কোন ধারণা পাব না।

১১. মানব জাতির 'বস্তুভিত্তিক সম্পর্ক' (Material Relations) দুই ধরনের :

১. মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক

২. একজন মানুষের সাথে অন্য একজন মানুষের সম্পর্ক, অর্থাৎ মানব জাতির মধ্যকার সম্পর্ক

ধরে নিলাম, এক ব্যক্তি শিকার করছে। এটা হলো মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক। আমরা আরও ধরে নিলাম, কোন ব্যক্তি জমিতে চাষ করছে। এটাও মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক। এর অর্থ হলো, প্রত্যেকটা 'শ্রম-কার্যক্রম'-এ মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক অস্তিত্বশীল হয়। কোন্ ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে মানুষ ওই শ্রমটা সম্পাদন করছে এবং তাদের উৎপাদন শক্তির ক্ষমতা কোন্ পর্যায়ে রয়েছে এই প্রসঙ্গে এসব বিষয়ও এসে যায়।

এই একই 'শ্রম কার্যক্রম'-এ আর একটা বিষয়ও এসে যায়, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। মানুষ আলাদা ভাবে না-কি সমবেত ভাবে শ্রম সম্পাদন করছে? শ্রম দিয়ে তৈরি জিনিস মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে ব্যবহার করছে? কিছু মানুষ অধিক জিনিস ব্যবহার করছে আর অন্যরা খুব কম জিনিস ব্যবহার করছে কি? সকল মানুষ কি সমান?—মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের প্রসঙ্গে এসব বিষয় এসে যায়।

'শ্রম কার্যক্রম' প্রকাশ করে, একদিকে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ককে আর অন্যদিকে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে। প্রাচীন কালে বস্তুভিত্তিক সম্পর্ক অত্যন্ত ন্যূনতম এবং সীমাবদ্ধ পর্যায়ে ছিল, তখন উৎপাদন শক্তিও ছিল অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে।

আদিম মানুষ 'প্রকৃতি' সম্পর্কেও, বলতে গেলে, বিশেষ কিছু জানতো না। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অতি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যত বেড়েছে, উৎপাদন শক্তিও তত উন্নত হয়েছে। এভাবে উৎপাদনশীলতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ তত শক্তিশালী হয়েছে, আর হস্তক্ষেপ করার সামর্থ্যও তত বৃদ্ধি তো পেয়েছেই, গতিশীলও হয়েছে। মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক আজকের দিনে গভীরতর এবং বিস্তৃততর হয়েছে, ফলে মানুষ

প্রকৃতির নিয়ম-নীতি আরও বেশি আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং নানাবিধ প্রয়োজনে এসব নীতি-কৌশল বাস্তব প্রয়োগে নিয়েছে। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যকার বর্তমান সম্পর্ক-রূপ, সেই আদিম সমাজে উপস্থিত ছিল না।

একই ভাবে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সেই আদিম যুগে অতি সীমাবদ্ধ পর্যায়ে ছিল। ওই পর্যায়ে মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল শুধুমাত্র 'শ্রম সম্পর্ক'। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে উৎপাদন শক্তি ছিল অত্যন্ত নিচু পর্যায়ে, ওই সময় মানুষ অতি সীমিত সংখ্যক জিনিস তৈরি করতে পারতো। এসব জিনিসকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, একটা সুদীর্ঘ কাল এসব জিনিসের মধ্যে কোন বিনিময় ঘটেনি। এমন একটা সময়ে যখন বিনিময়ই শুরু হয়নি, কোন গোত্রের একজন মানুষের সাথে ওই একই গোত্রের মানুষের শ্রম সম্পর্ক ছিল, অন্য গোত্রের কোন মানুষের সাথে নয়। এমনকি বিনিময় শুরুর পরেও, বিনিময়ের ঘটনাও ছিল অত্যন্ত কম, সেহেতু বিনিময়ের ফলে সংগঠিত সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একটা সময়ে যখন উৎপাদন শক্তি ছিল অত্যন্ত নিচু পর্যায়ে, মানুষের মধ্যকার বস্তুভিত্তিক সম্পর্কও টিকে ছিল অত্যন্ত নিচু মাত্রায়।

প্রকৃতির সাথে আদিম মানুষের এই ন্যূনতম সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে তাদের পুজো-পার্বণের ধরনে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের চরিত্রের মধ্যে। এর অর্থ হলো, প্রকৃতি সম্পর্কে আদিম মানুষের জানার পরিধি অত্যন্ত কম ছিল, যা তাদের প্রকৃতি-পুজোর মতো সরল ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

পণ্য-মূল্য এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো অপ্রাকৃতিক, এর বিপরীতে জিনিস-ব্যবহার মূল্য এর উপর ভিত্তিশীল মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কটা হলো প্রাকৃতিক; ব্যক্তি-শ্রমের সকল বিশেষত্বকে ভিত্তিহীন করে দিয়ে একক 'বিমূর্ত শ্রম'-এর দিকে যাওয়ার মধ্য দিয়ে মানব জাতির একে অপরের সাথে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ, এমন একটা সমাজকে গড়ে তোলে যে সমাজের এসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেখানে এটাই স্বাভাবিক যে ওই সমাজে বিদ্যমান ধর্মমতের মধ্যে অপ্রাকৃতিক, অবাস্তব এবং "বিমূর্ত শক্তি"-কে পুজো করার মতো ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা থাকবে। ওই ধরনের সমাজের সাথে, আমরা বর্তমান সময়ে নানা যেসব ধর্মমত দেখি, এমন সব ধর্মমতের শতকরা একশ ভাগ মিল থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

যদিও আজকের মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে, যেহেতু তারা অপ্রাকৃতিক 'পণ্য সম্পর্ক'-এর উদরে আজও আটকে রয়েছে, তাই এসব মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান এমন স্তরে পৌঁছাতে পারছে না, যাতে করে ওই 'বিমূর্ত শক্তি'র প্রতি অন্ধ ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং পুজো-অর্চনাকে পরিত্যাগ করতে পারে।

কার্ল মার্কস বলেছেন, "ধর্মীয় জগতটা হচ্ছে বাস্তব জগতের প্রতিফলনই বটে"।[৫]

যখন একদিকে মানব জাতির প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক এবং অন্যদিকে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, কোন প্রকার অস্পষ্টতা এবং দ্বন্দ্বের উপস্থিতির কোন সুযোগ ছাড়াই অত্যন্ত স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে ওঠে, বাস্তব এই জগতটার প্রতিফলনও তখন মানুষের চেতনাবোধের কাছে প্রকৃত চেহারা নিয়ে ধরা দেয়। বাস্তব জগতটা এতদিন যে মেকি ও ভুল প্রতিচ্ছবি নিয়ে তাদের চেতনাবোধের জায়গায় প্রতিফলিত হচ্ছিল, তা শূন্যে হারিয়ে যায়। যত দীর্ঘ কাল ধরে মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক একটা অস্পষ্টতা এবং বিভ্রান্তি নিয়ে মানুষের চেতনায় প্রতিফলিত হতে থাকবে, বাস্তব জগতের এই প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি থেকে যা-কিছু প্রতিফলিত হবে সেগুলোও মানুষের কাছে অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে ও ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা নিয়ে সমাজে টিকে থাকবে।

"বাস্তব জগতটা ধর্মীয় চেতনার প্রতিচ্ছবিই বটে। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত মানুষকে বিভিন্ন সম্পর্কের মুখোমুখি হতে হয় এবং তাকে মোকাবেলা করতে হয়, ওই সম্পর্কগুলো আবার প্রকৃতি এবং মানুষের সাথেও সম্পর্কিত। ওইসব সম্পর্ক পূর্ণাঙ্গ ও যুক্তিসিদ্ধ চেহারা নিয়ে সমগ্র মানব জাতির কাছে যখন স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে যাবে, কেবলমাত্র তখনই চূড়ান্ত ভাবে ধর্মীয় চেতনার বিলুপ্তি ঘটবে।"[৬] চেতনার ক্ষেত্রে এই অস্পষ্টতা এবং বিভ্রান্তির মূল ভিত্তি হলো একমাত্র পণ্য ব্যতীত অন্যকিছু নয়; পণ্য অর্থাৎ পণ্য সম্পর্ক। কিন্তু, আপতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন-বা 'অর্থ' নিজেই এই বিভ্রান্তির জন্য দায়ী, যেন-বা অর্থ নিজেই এই 'পৌত্তলিকতা' সৃষ্টি করছে। কিন্তু, প্রকৃত সত্য এটা নয়। যে পৌত্তলিকতা টাকার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, বাস্তবত, সেটা হলো পণ্যের পৌত্তলিকতা। 'অর্থ'র সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র পণ্যের বিনিময়কে সাহায্য করতে, তাকে গতিশীল করতে, এটা ব্যতীত অর্থের আর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে অর্থের কারণেই পণ্যের এই পৌত্তলিকতা উজ্জ্বলতার সাথে দেদীপ্যমান রয়েছে। এটা সত্য যে অর্থকে সরিয়ে নিলে (যদি সাধারণ সমতুলকে সরিয়ে নেওয়া হয়) অথবা বার্টার পদ্ধতি বা এমন অন্য কোন পদ্ধতিতে বিনিময় সম্পন্ন হলে, পণ্যের এই পৌত্তলিক উজ্জ্বলতা ফিকে হয়ে আসবে। কিন্তু, যদি পণ্য বিনিময়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এটা দ্রুততার সাথে ঘটতে থাকে, অর্থের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব নয়। বিনিময় সাধারণ সমতুলকে (অর্থকে) অপরিহার্য করে তুলেছে। বিনিময়ের ক্ষেত্রে অর্থকে সঙ্গী করা

---

৫. কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল* প্রথম খণ্ড, মস্কো সংস্করণ ১৯৭৪, পা.৮৩।

৬. কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, মস্কো সংস্করণ ১৯৭৪, পৃ.৮৪।

কারও পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়। যখন এই দুই একত্রিত হয়, পণ্যের পৌত্তলিকতা আরও বিভ্রান্তি সৃষ্টির ক্ষেত্র পেয়ে যায়, যার শিকার হয় সমগ্র মানব জাতি। সেহেতু, এসব বিভ্রান্তি ও বিড়ম্বনা সৃষ্টির মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় 'পণ্য' নিজেই, অর্থ নয়।

যেহেতু 'মূল্য' নামের এই রহস্য, যা জিনিসের মধ্যে জন্ম নেয়, আড়ালে চলে যেতে থাকবে কেবলমাত্র ওই সময় থেকে যখন মানুষ পুঁজিবাদী পণ্য-সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করবে এবং 'ব্যবহার-মূল্য'র প্রেক্ষাপটে মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে গড়ে তুলতে বাস্তব পদক্ষেপ নেবে। মূল্য নামের রহস্য দিয়ে অবগুণ্ঠিত মানব সমাজের উপরকার 'পৌত্তলিকতার পর্দা' এভাবে উঠে যাবে।

জিনিসের মূল্য এমন কোন অংশ বা উপাদান নয় যাকে জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। পণ্যের পৌত্তলিকতা এমন কোন জিনিস নয় যাকে আক্রমণ বা জর্জরিত করা যায়। কিন্তু, আগামী কোন এক কালে মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট নতুন জ্ঞানের আলোকে সমাজ বিকাশের যে নতুন প্রক্রিয়া শুরু হবে, একমাত্র তারই পরিণতিতে এক সময় সমাজের প্রত্যাশিত রূপান্তর সংঘটিত হবে।

অধ্যায় দশ

পণ্য সঞ্চলন
(Circulation of Commodities)

বিশ শতকের বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের অভিজ্ঞতা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে যে, সর্বহারাশ্রেণী যদি একটি সঠিক বিপ্লবী আদর্শ, নীতিমালা এবং কর্মসূচি নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, তখন জনগণ নিতান্তই একটা শূন্য অবস্থা থেকে এমন এক দুর্জেয় গণ সেনাবাহিনী তৈরি করতে পারে, যে বাহিনী শত্রুর অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু পার্টি যদি ভুল আদর্শ দিয়ে পার্টি এবং বাহিনীকে পরিচালিত করে, তখন ওই একই বাহিনী প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ারে পরিণত হয়ে যায়। চীনের গণবাহিনীর ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে বিপ্লবের আগে এই বাহিনী পূর্ণ নিষ্ঠা, সাহস, আত্মত্যাগ এবং বিপ্লবী মতাদর্শে সমর্পিত থেকে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুর কাছে সর্বদাই অপরাজেয় থেকেছে, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরে এই একই বাহিনী বিশেষ ব্যবস্থায় এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে ব্যারাকে থাকতে শুরু করার পরে, তারা আধুনিক পেশাদার বুর্জোয়া সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হওয়ার এবং সংহত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি এমন একটা পদ্ধতি ও কাঠামো বিকশিত করি ও প্রতিষ্ঠা করি, যেখানে সেনাবাহিনী ব্যাপক জনগণের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে থেকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত আর থাকবে না এবং সর্বহারা বিপ্লবী আদর্শ দ্বারা আর পরিচালিত হবে না, তখন এমন কিছু প্রবণতা গাণিতিক হারে বেড়ে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছাবে, যখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই বাহিনী প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হবে। এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য সেই শুরু থেকেই প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য গণবাহিনী এবং ব্যাপক জনগণকে মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত উভয় দিক থেকে সচেতন করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। একই সাথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, একুশ শতকে এসে জনগণের সেনাবাহিনীকে আধুনিক উন্নত অস্ত্র ও প্রশিক্ষণে সুসজ্জিত করে শুধুমাত্র ব্যারাকের মধ্যে আটকে রাখা ঠিক হবে না, বরং ব্যাপক জনগণকে সামরিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ করতে তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত করতে হবে এবং জনগণের নানাবিধ সেবার কাজে লাগাতে হবে, এভাবে তারা বিপ্লবের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে। আদর্শগত এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে প্রশিক্ষিত ও সমৃদ্ধ সশস্ত্র ব্যাপক জনগণই একমাত্র পারে বিদেশি আক্রমণ এবং প্রতিবিপ্লবকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে, এই বিষয়টি সম্পর্কে পার্টি এবং সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে শুরু থেকেই পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। একুশ শতকের জনগণের সেনাবাহিনীকে প্রধান যে কাজটি বিশ্বস্ততার সাথে করতে হবে তাহলো– জাতীয়ভাবে বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী সচেতন সশস্ত্র জনশক্তি তৈরি করতে হবে। জনগণ যেন সঠিক সময়ে বিদ্রোহ করার অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং প্রতিবিপ্লব প্রতিহত করতে সবসময় সজাগ থাকে, একুশ শতক জনগণকে এভাবে শিক্ষিত করে তোলার এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব জনগণের সেনাবাহিনী হিসেবে গণ মুক্তি ফৌজের উপর অর্পণ করেছে।

–*THE WORKER*-৯ থেকে সংকলিত।

আমরা এখানে পণ্য সঞ্চলন প্রসঙ্গে ৮টা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এই ৮টা বিষয় হলো : ১) অর্থের ভূমিকা, ২) পণ্য সঞ্চলন, ৩) 'অর্থ'র চলাচল, ৪)

'সঞ্চলন মাধ্যম'-এর পরিমাণ, ৫) মুদ্রা এবং মূল্যের প্রতীক, ৬) অর্থ সঞ্চলন, ৭) 'পরিশোধ মাধ্যম' হিসেবে অর্থের ভূমিকা এবং ৮) বিশ্বজনীন অর্থ।

১. অর্থের ভূমিকা (Functions of money)

অর্থ প্রধানত দুটো ভূমিকা পালন করে :

১. 'মূল্য পরিমাপ' মাধ্যম হিসেবে

২. 'দামের মানদণ্ড' হিসেবে

১. অর্থ মূল্য পরিমাপ' মাধ্যম হিসেবে কাজ করে

টাকা হচ্ছে মূল্য পরিমাপের একটা স্কেল। যে-কোন ধাতুর তৈরি এই 'পরিমাপ স্কেল' অর্থ হিসেবে ভূমিকা রাখে। যেহেতু সোনা অর্থের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা ধরে নিলাম যে ১ গ্রাম ওজনের সোনা হলো ১ টাকা (এক একক)। যেহেতু এই স্কেলে বিভিন্ন মাপ আছে তাই একে আমরা আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান ভাগে ভাগ করতে পারি। এভাবে সমান ভাগে বিভক্তির পরেও টাকা মূল্য পরিমাপের স্কেল হিসেবে থেকে যায়।

ধরা যাক, একজন তাঁতি ২০ মিটার কাপড় তৈরি করলো এবং এই কাজে যে ব্যয় হয়েছে তার হিসেব বের করার চেষ্টা করতে লাগলো। সে মূলত হিসেবটা টাকায় কত সেটা 'কল্পনা' দিয়ে বের করার চেষ্টা করবে। ধরে নিলাম, তার গণনায় হিসেবটা হলো : "২০ মিটার কাপড়ের মূল্য ৪০ টাকা, প্রতি মিটার কাপড়ের দাম ২ টাকা"। এভাবে হিসেবটা করার সময় কি কাপড়ের সাথে টাকার উপস্থিতি থাকার কোন প্রয়োজন হয়? কোন দরকার নেই। এমনকি একটা পয়সারও এখানে দরকার পড়ে না, ৪০ টাকার কথা এখানে ওঠেও না। এর কারণ কী, এখানে যেটা ঘটছে তাহলো হিসেবটা এভাবে বের করা 'কাপড়ের মূল্য কত হবে?' সুতরাং, এখানে 'প্রকৃত অর্থ'র উপস্থিতির কোন দরকার পড়ে না। ওই অর্থ একমাত্র ওই ব্যক্তির 'কল্পনা' জগতে থেকে যায়, যে এই মূল্যের হিসেবটা করছে, অথবা যা হিসেবের কাগজে থেকে যায়।

যখন কোন পণ্যের মূল্য কত তার হিসেব করা হয়, অর্থ কেবলমাত্র 'মূল্য পরিমাপ' করার কাজ করে (মূল্য পরিমাপের মাধ্যম হিসেবে)। সুতরাং, অর্থ এখানে 'বাস্তব অর্থ' হিসেবে না দাঁড়িয়ে একমাত্র 'কাল্পনিক অর্থ' হিসেবে দাঁড়ায়।

২. অর্থ 'দামের মানদণ্ড' হিসেবে ভূমিকা রাখে

অর্থ দ্বিতীয় যে ভূমিকা রাখে তাহলো 'দামের মানদণ্ড' হিসেবে দাঁড়িয়ে যাওয়া। আমাদের 'মূল্য' এবং 'দাম' এই দুটো শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করতে হবে, কারণ শব্দ দুটো আলাদা ঠিকই যার মানে এক। 'মানদণ্ড' হতে হলে

'প্রমাণিত' করার বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। 'দামের মানদণ্ড' হতে হলে 'দাম প্রমাণ' করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

ধরা যাক, তাঁতি বললো, "আমার কাপড়ের প্রতি মিটারের দাম ২ টাকা"। এই দামটা কি ইতিমধ্যে প্রমাণিত, যে মুহূর্তে সে বললো যে তার কাপড়ের প্রতি মিটার ২ টাকা? না, এটা প্রমাণিত হতে হলে কোন ক্রেতাকে ২ টাকায় অবশ্যই এটা ক্রয় করতে হবে। এর অর্থ হলো, ওই কাপড়টা বিক্রয়ের একটা ঘটনা এখানে ঘটতে হবে। অর্থাৎ, কাপড়টার ওই দাম এটা প্রমাণিত হতে হলে 'কাল্পনিক অর্থ'র পরিবর্তে 'প্রকৃত অর্থ'-কে এখানে কাপড়ের সম্মুখে হাজির হতে হবে।

যখন অর্থ 'মূল্যের পরিমাপক' হিসেবে ভূমিকা রাখে, অর্থের উপস্থিতি হয় 'কাল্পনিক টাকা' এবং 'কাল্পনিক পরিমাণ' হিসেবে। আর অন্য দিকে, অর্থ যখন 'দামের মানদণ্ড' হিসেবে ভূমিকা রাখছে তখন টাকাকে দৃশ্যমান অর্থ হিসেবে সরাসরি কাপড়ের সম্মুখে হাজির হতে হচ্ছে।

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে সোনা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মোট শ্রম-সময় বাড়ে বা কমে, যেহেতু সোনা এমন একটা জিনিস যার উৎপাদনের কাজে শ্রমের প্রয়োজন, তাই এমনটা ঘটা স্বাভাবিক। এর অর্থ হলো, সোনার মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে, সেহেতু টাকার মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটবে। তাহলে যার মূল্যের এভাবে পরিবর্তন ঘটে, সে কি 'মূল্যের পরিমাপক' এবং 'দামের মানদণ্ড' হিসেবে দাঁড়াতে পারবে? এটা সম্পূর্ণ যুতসই বটে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে তার মূল্য যা হয় তা ধারন করে অর্থ এসব ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালন করতে পারে।

একটা পরিমাপ পাত্র ছোট হোক আর বড় হোক ওটা কি শস্য মাপার কাজে ব্যবহার করা যায় না? এটা ওই কাজে লাগে। ওই পরিমাণ শস্য যদি ছোট পাত্রটা দিয়ে মাপি, তখন বড় পাত্রের তুলনায় বহুবার মাপতে হতে পারে। পাত্রটা ছোট হোক বা বড় হোক তাতে কিছু যায় আসে না। টাকার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা।

সোনার মূল্য যদি টাকার মুদ্রাকারে থাকে, একটা পণ্যের পরিবর্তে কম সংখ্যক মুদ্রা পাবো। যদি টাকার মান কমে যায়, তখন পণ্যটার পরিবর্তে আগের তুলনায় বেশি সংখ্যক মুদ্রা পাবো।

আবার, যদি টাকার মূল্য কমে যায় তার ছোট অংশের (মুদ্রাকারে) মানও কমে যাবে, আর যদি বৃদ্ধি পায় তখন ছোট অংশের মানও বৃদ্ধি পাবে। টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি পাক অথবা কমুক না-কেন, উভয় ক্ষেত্রে এক টাকার সাথে অর্ধেক টাকার পার্থক্য একই থেকে যাবে। অর্থাৎ, কোন ক্ষেত্রেই টাকা এবং এর ছোট অংশের আনুপাতিক মানে নতুনতর কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। সুতরাং, মূল কথা হলো,

যেকোন ভাবে অর্থের মূল্যমানের পরিবর্তন ঘটুক না-কেন, অর্থ মূল্য পরিমাপের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, টাকা যার মূল্যমানের পরিবর্তন ঘটে, সে কি 'দামের মানদণ্ড' হিসেবেও ভূমিকা রাখতে পারবে? অবশ্যই, এই ভূমিকা পালনে সে সক্ষম। দামের মানদণ্ড হিসেবে ভূমিকা রাখার অর্থ হলো, একটা পণ্যের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অবমুক্তিকরণ। এটাই হলো 'দামের পরিমাপ' যা প্রথমেই নির্ধারণ করে দেয় অবমুক্তিপ্রাপ্ত টাকার পরিমাণ বাড়বে না-কি কমবে। যদি অর্থের মূল্যমান কমে যায় তখন অধিক পরিমাণ অর্থ বেরিয়ে যায়। আর মূল্যমান বাড়লে কম পরিমাণ অর্থ লাগবে।

সেহেতু আমরা বলতে পারি, যেকোন ভাবেই অর্থের মূল্যমানের পরিবর্তন ঘটুক, অর্থ 'মূল্যের পরিমাপক' এবং 'দামের মানদন্ড' হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে।

২. পণ্যের 'সঞ্চলন' ('Circulation' commodities) (পণ্যের 'বিনিময়') ('Exchange' of commodities)

'সঞ্চলন' অর্থ কেবলমাত্র 'বিনিময়'। বার্টার পদ্ধতিতে যেসব সমস্যার উপস্থিতি থাকে না, এমন প্রকৃতির সমস্যাক্রান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যখন বিনিময় অর্থের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

ধরা যাক, বার্টার পদ্ধতিতে কিছু কাপড় এবং কিছু শস্যের মধ্যে একটা বিনিময়ের ঘটনা ঘটলো। কাপড়ের মালিক তার কাপড়টা দিয়ে একইসাথে শস্য পেয়ে গেল। একই ভাবে শস্যের মালিক তার শস্য দিয়ে সাথে সাথে কাপড় পেয়ে গেল। এভাবে বার্টার পদ্ধতিতে উভয় জিনিসের ব্যবহার-মূল্য দেওয়া এবং নেওয়ার ঘটনা (২টা পণ্যের বিনিময়ও বটে) একই সময়ে সম্পূর্ণ হলো।

অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। ধরে নিলাম, বিনয় নামের কোন তাঁতি তার কাপড়টা দিয়ে ২ টাকা পেল। এখানে বিনিময়ের ঘটনা কি পুরোপুরি সম্পন্ন হলো? না এখনও হয়নি। প্রথম পণ্যের বিনিময়ের ঘটনা সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ একটা ব্যবহার-মূল্য পরিত্যাগ করে আর একটা ব্যবহার-মূল্য গৃহীত হবে। এখানে কাপড়ের পরিবর্তে প্রাপ্ত টাকা কোন ব্যবহার-মূল্য সংগঠিত করে না। সেহেতু, কাপড়ের পরিবর্তে টাকা পাওয়া মাত্রই কাপড়ের এই বিনিময়কে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হয় না। ধরা যাক, বিনয় প্রাপ্ত ২ টাকা দিয়ে কিছু শস্য ক্রয় করলো। এখন কাপড়ের বিনিময় সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হলো।

প্রথম ধাপে কাপড়কে ২ টাকার সাথে বিনিময় করা হলো, এভাবে কাপড় চলে গেল, টাকা গৃহীত হলো এবং এই কাপড়ের মূল্য হলো ২ টাকা।

পরের ধাপে ২ টাকা চলে গেল এবং শস্য গৃহীত হলো, এখানে কাপড়ের মূল্য হলো শস্য। কাপড়ের মূল্য প্রথমে 'টাকা রূপ'-এ রূপান্তরিত হলো এবং পরের ধাপে 'শস্য রূপ'-এ। সেহেতু আমরা বলি "কাপড়ের মূল্য রূপান্তরিত হলো দুইটা রূপে অথবা দুটো রূপান্তর এখানে সংঘটিত হলো"।

এই ২টা রূপান্তর একটা 'পরিক্রমণ' সংগঠিত করলো। কেবলমাত্র যখন কোন পণ্য এমন একটা পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করে, ওই পণ্যের বিনিময় সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। সহজ করে বললে কথাটা হয়, প্রথম পণ্যের বিনিময় সম্পূর্ণ হয় যখন এই পণ্যের পরিবর্তে অন্য কোন পণ্য পাওয়া যায়।

কোন পণ্যের বিনিময়ের ঘটনায় ২টা ধাপ থাকে :

১. পণ্য টাকায় পরিবর্তিত হয়
২. টাকা অন্য পণ্যে পরিবর্তিত হয়

পণ্য	–	অর্থ	টাকা	–	পণ্য
C	–	M	M	–	C
প্রথম রূপান্তর			দ্বিতীয় রূপান্তর		

বিনয় বা কোন ব্যক্তির জন্য দুই ধাপে ২টা রূপান্তরকে এভাবে দেখানো যায় :

১. কোন ব্যক্তির পণ্য দিয়ে দেওয়া, এটা হলো বিক্রয়।
২. অন্য কোন পণ্য ওই ব্যক্তির পেয়ে যাওয়া, এটা হলো ক্রয়।

কোন পণ্যের বিনিময়ের পূর্ণ চিত্রটা হয় এমন :

পণ্য	–	অর্থ	–	পণ্য
C	–	M	–	C

এই পরিক্রমণের গতিধারায় মোটের উপর মূল কথাটা হলো : নিজের কোন পণ্যের পরিবর্তে অন্য কোন পণ্য নিজের কাছে চলে আসা।

অর্থাৎ, পণ্য	–	পণ্য	
C	–	C	এই হলো 'সরল সঞ্চলন'।

যদি কোন জিনিস দেওয়ার জন্য অন্য কোন জিনিস পাওয়া যায়, তখন বিনিময় সম্পূর্ণ হলো বলা যায়। যদি একজন বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ নিজের কাছে রেখে দেয় অন্য কোন পণ্য ক্রয় না করে, এর অর্থ হয় এই যে তার পণ্য কেবলমাত্র প্রথম রূপান্তরটা সম্পূর্ণ করলো।

যদি সে দ্বিতীয় পণ্য ক্রয় করে, তার পণ্য দ্বিতীয় রূপান্তরটাও সম্পূর্ণ করলো, বলা যায়। যদি সে তার পণ্য বিক্রি করে প্রাপ্ত ২ টাকা থেকে ১ টাকা দিয়ে অন্য কোন পণ্য ক্রয় করে এবং বাকি ১ টাকা নিজের কাছে রেখে দেয়, কাপড়ের বিনিময় এখনও সম্পূর্ণ হয়েছে এটা বলা যায় না। এর অর্থ হয়, কেবলমাত্র দ্বিতীয় রূপান্তরের একটা খণ্ডাংশ সম্পন্ন হলো মাত্র। প্রথম পণ্যের বিনিময় সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে কেবলমাত্র তখনই, যখন পণ্য বিক্রি করে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ দিয়ে অন্য কোন পণ্য ক্রয় করা হবে।

প্রথম রূপান্তর – ক্রয়
পণ্যটা দিয়ে কাজ শুরু হলো – ক্রয়
যদি অর্থ দেওয়া হয় এবং পণ্য নেওয়া হয় – ক্রয়
অর্থ এবং পণ্য – ক্রয়
M - C – ক্রয়

বিনয় প্রথমে একটা 'বিক্রয়' এবং পরে 'ক্রয়' সম্পন্ন করলো। এই দুটা কাজ তাকে দুটো বৈশিষ্ট্য উপহার দিল। যখন 'বিক্রয়' সম্পন্ন হলো সে হয়ে গেল একজন 'বিক্রেতা' এবং যখন 'ক্রয়' সম্পন্ন হলো সে হয়ে গেল একজন 'ক্রেতা'। অর্থাৎ, এমনটা কখনও ঘটে না যে কোন ব্যক্তি যখন একটা পণ্য বিনিময় করছে সে সব সময় একজন 'বিক্রেতা' বা একজন 'ক্রেতা'। ওই ব্যক্তি এক সময় একজন 'ক্রেতা' হতে পারবে এবং অন্য কোন সময়ে একজন 'বিক্রেতা' হতে পারবে। প্রত্যেক ব্যক্তি পণ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই দুই ধরনের ভূমিকা রাখে।

'কাপড় বিক্রি করা' এবং 'অন্য কোন পণ্য ক্রয় করা' এই দুই কাজে আরও দুই ব্যক্তি বিনয়ের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। বিনয় ২ টাকায় তার কাপড় বিক্রি করেছে, এটা নয় কি? ওই ২ টাকা কার? ধরা যাক, ওগুলো বিকাশের। বিকাশ ২ টাকা বিনয়কে দিয়ে কাপড়টা ক্রয় করেছে, বিকাশ এই টাকাটা কীভাবে পেয়েছে? ধরে নিলাম, বিকাশ কিছু গম বিক্রি করলো যা সে নিজেই উৎপাদন করেছিল এবং এভাবে সে ২ টাকা পেল। ধরা যাক, এখন সে বিনয়ের কাছ থেকে ওই ২ টাকা দিয়ে কাপড়টা ক্রয় করলো। বিনয় ওই ২ টাকা দিয়ে মাসুদের কাছ থেকে কিছু শস্য ক্রয় করলো। পরে মাসুদ ওই ২ টাকা দিয়ে শামিমের কাছ থেকে ভুট্টা ক্রয় করলো। যদি আমরা এখানে একমাত্র বিনয়কে বিবেচনা করি (যদি শুধু কাপড়কে বিবেচনা করি), একদিকে বিনয়ের একটা 'বিনিময় সম্পর্ক' থাকে বিকাশের সাথে এবং অন্যদিকে শামিমের সাথে।

এই ঘটনায় সমগ্রভাবে ৪ ধরনের পণ্য রয়েছে : ১. গম, ২. কাপড়, ৩. শস্য এবং ৪. ভুট্টা। এই ৪টা পণ্যের বিনিময়ের ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা বিনিময়ের সাথে আর একটা বিনিময়ের যোগসূত্র রয়েছে।

'গমের মালিক' গম বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কাপড় ক্রয় করলো। এভাবে 'কাপড়ের মালিক'-এর কাছে অর্থটা চলে গেল। 'কাপড়ের মালিক' কাপড় বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে শস্য ক্রয় করলো। এভাবে 'শস্যের মালিক'-এর কাছে অর্থটা চলে গেল। 'শস্যের মালিক' শস্য বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ভুট্টা ক্রয় করলো। এভাবে 'ভুট্টার মালিক'-এর কাছে অর্থটা চলে গেল। এভাবে ৪টা পণ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একটা চেইন এখানে সৃষ্টি হয়ে যায়। এই চেইন বিনিময়ের ঘটনাগুলোকে একটার সাথে অন্যটাকে গেঁথে ফেলে।

যখন একটা 'রূপান্তর' সংঘটিত হচ্ছে, এর অর্থ হয়, অন্য পণ্যের 'শেষ রূপান্তর' একই সময়ে সংঘটিত হচ্ছে। অর্থাৎ, যখন কোন পণ্যের 'শেষ রূপান্তর' শেষ হচ্ছে, অন্য পণ্যের 'প্রথম রূপান্তর' তখন শুরু হচ্ছে। এর অর্থ হলো, একটা পণ্যের 'পরিক্রমণ' যখন শেষ হয়, অন্য পণ্য তখন 'পরিক্রমণ' প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে।

এখানে ৪টা পণ্যের বিনিময়ের ঘটনাগুলো এভাবে একে অপরের সাথে যোগসূত্র তৈরি করে :

গম - অর্থ - কাপড় - অর্থ - শস্য - অর্থ - ভুট্টা - .....

C - M - C - M - C - M - C - .....

একটা ২-টাকার মুদ্রা প্রথমে কিছু গমের সাথে বিনিময় করা হয়েছে, তারপর কিছু কাপড়ের সাথে, তারপর কিছু শস্যের সাথে এবং পরে কিছু ভুট্টার সাথে, এভাবে বিনিময়ের একটা চেইন তৈরি হয়ে গেল। এই চেইনের বিস্তার এভাবে যে-কোন দৈর্ঘ্যের হতে পারে।

একই মুদ্রাকে বিভিন্ন পণ্যের সাথে বিনিময় করা হচ্ছে, এমনটা কি ঘটছে না? কোন্ পণ্যটা এখানে মূল্য রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে? এটা হচ্ছে কোন পণ্যের মূল্য রূপ যার সাথে একটা সময়ে তার বিনিময় ঘটেছে। যখন মুদ্রাকে কাপড়ের সাথে বিনিময় করা হয়েছে, এটা হলো কাপড়ের মূল্য। এই মুদ্রা কাপড়ের মূল্য হয়ে অবস্থান করতে থাকবে, যতক্ষণ এটার অন্য কোন পণ্যের সাথে বিনিময় না ঘটছে। পরবর্তী সময়ে, যদি আমরা ওই মুদ্রা দিয়ে শস্য ক্রয় করি, তখন থেকে ওই মুদ্রা শস্যের মূল্য হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে, মুদ্রা হবে ওই পণ্য'র মূল্য যার সাথে তার বিনিময় ঘটেছে।

এই ৪টা পণ্যই শুধু নয়, প্রতিদিন কয়েক লক্ষ নয় কয়েক কোটি পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের ঘটনা বাজারে ঘটে চলেছে। যখন ১ টাকার মুদ্রা দিয়ে একটা বিনিময়ের ঘটনা একখানে ঘটছে, অন্য কোথায়ও একই সময়ে আর একটা বিনিময়ের ঘটনা

ঘটে যাচ্ছে। অর্থাৎ, যখন কিছু টাকা কোন পণ্যের সাথে বিনিময় করা হচ্ছে, ওই একই সময়ে আরও কিছু টাকা দিয়ে অন্য কোন পণ্যের সাথে বিনিময়ের ঘটনা ঘটছে। এভাবে, বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ের ঘটনাগুলো যা একই সময়ে সংঘটিত হচ্ছে, তা-ই হলো 'পণ্যের সঞ্চলন'। যদি আমরা মাত্র একটা পণ্যকে বিবেচনা করি, পণ্যের বিনিময়ের ঘটনা সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ হলো সঞ্চলন সম্পূর্ণ হলো।

পণ্য সঞ্চলনের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, এখানে সেগুলো একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা হলো :

১. বিক্রয় নিজেই একটা ক্রয়

ধরা যাক, বার্টার পদ্ধতিতে কাপড় এবং শস্যের মধ্যে একটা বিনিময়ের ঘটনা ঘটলো। আমরা জানি যে বার্টার পদ্ধতিতে 'ক্রয়' এবং 'বিক্রয়' এই শব্দ দুটোর কোন ব্যবহার নেই। কিন্তু, বোঝার ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য আমরা এখানে বার্টার পদ্ধতিতেও এই শব্দ দুটো ব্যবহার করছি।

আমরা যদি কাপড়ের দিক থেকে দেখি, এটা একই সাথে কাপড় বিক্রয় এবং শস্য ক্রয়ের ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়। তদ্রূপ, শস্যের দিক থেকে দেখলে, ঘটনাটা শস্য বিক্রয় এবং কাপড় ক্রয়ের ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ, বার্টার বিনিময়ে ক্রয় এবং বিক্রয়ের ঘটনা একটা একক ঘটনাকে সংগঠিত করে। এর অর্থ হলো, এখানে ক্রয় নিজেই বিক্রয় এবং বিক্রয় নিজেই ক্রয়।

২. বিক্রয় নিজেই ক্রয় নয়

অর্থ বা টাকার মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে, ক্রয় এবং বিক্রয়, ভিন্ন কার্যক্রম ধারায় একে অপর থেকে পৃথক থাকে। ধরা যাক, বিনয় কাপড় বিক্রির টাকা দিয়ে শস্য কিনলো।

এই বিনিময়ের ক্ষেত্রে কী ঘটছে? প্রথমে কাপড় দেওয়া হচ্ছে এবং টাকা নেওয়া হচ্ছে, এটা হলো 'কাপড় বিক্রি করা'। পরের ধাপে টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং শস্য নেওয়া হচ্ছে, এটা হলো 'শস্য ক্রয় করা'। অর্থাৎ, এখানে কাপড় বিক্রি এবং শস্য ক্রয় দুই ভিন্ন প্রকৃতির কাজ, যারা একে অপর থেকে পৃথক। এর অর্থ হলো, টাকা বা অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে, একটা পণ্য ক্রয় এবং অন্য একটা পণ্য বিক্রয়ের ঘটনা একটা একক কাজকে সংগঠিত করে না। এখানে বিক্রয় নিজেই ক্রয় নয়; তারা পৃথক এবং দুটো ভিন্ন ঘটনা।

৩. একটা বিক্রয় হয় কয়েকটা ক্রয়; কয়েকটা বিক্রয় হয় একটা ক্রয়

ধরা যাক, কাপড় বিক্রি থেকে বিনয় ২০ টাকা আয় করলো। এই ২০ টাকা দিয়ে সে কি একটা পণ্যই কিনবে? সে এমনটা নাও করতে পারে। সে কিছু টাকা

দিয়ে একটা পণ্য কিনতে পারে এবং কিছু টাকা দিয়ে অন্য একটা পণ্য কিনতে পারে। এভাবে একটা বিক্রয় যে-কোন সংখ্যক ভাগে ভাগ হয়ে যেতে পারে। একই ভাবে, কয়েকটা বিক্রয় একটা ক্রয় হিসেবে সম্পন্ন হতে পারে। এর অর্থ হলো, কয়েকটা বিক্রয় একত্রিত হয়ে একটা ক্রয় সম্পন্ন হতে পারে। অন্য ক্ষেত্রে একটা বিক্রয় কয়েকটা ক্রয়ে বিভক্ত হতে পারে, কয়েকটা বিক্রয় একটা ক্রয়ে পরিণতি পেতে পারে।

৪. বিক্রয় এবং ক্রয় পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক

একটা চুম্বকের পজিটিভ মেরু এবং নেগেটিভ মেরু যেমন পরস্পরের বিপরীত ধর্মী এবং সাংঘর্ষিক, তেমনি একটা বিনিময়ের সাথে যুক্ত ক্রয় এবং বিক্রয়ের ঘটনা পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক।

'ব্যবহার-মূল্য' চলে যাওয়ার ঘটনা	– নেগেটিভ কোণ
পণ্যটা (ব্যবহার-মূল্য) আসার ঘটনা	– পজিটিভ কোণ
বিক্রয় (C-M)	– নেগেটিভ কোণ
ক্রয় (M-C)	–পজিটিভ কোণ

ক্রয় এবং বিক্রয়ের পারস্পরিক সাংঘর্ষিক এই ঘটনা 'বার্টার' পদ্ধতির বিনিময়ে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। এই পদ্ধতিতে ক্রয় ছাড়া কেবলমাত্র বিক্রয় কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে যদি কোন ব্যক্তি একটা পণ্য বিক্রয় করে, এটা এই অর্থও করে যে তাকে একই মূল্যের অন্য একটা পণ্য কিনতে হয়। সেহেতু, এই পদ্ধতিতে বিক্রয় এবং ক্রয়ের মধ্যে 'ভারসাম্যহীনতা' সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। কিন্তু, অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে, 'ভারসাম্যহীনতা' ভ্রূণাকারে সৃষ্টি শুরু হয়।

অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি একটা পণ্য বিক্রয় করে, এটা এই অর্থ করে না যে তাকে অন্য কোন পণ্য কিনতে হবে। ধরা যাক, ওই ব্যক্তি টাকাটা দিয়ে অন্য কোন পণ্য না কিনে নিজের কাছে কিছু সময়ের জন্য রেখে দিল। অর্থাৎ, ওই ব্যক্তি শুধুমাত্র তার পণ্য বিক্রি করলো কিন্তু অন্য কোন পণ্য কিনলো না। তখন কী ঘটে? পণ্য সঞ্চলনের প্রবাহ সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি ওই ব্যক্তি বিক্রি থেকে প্রাপ্ত টাকা চিরদিনের জন্য নিজের কাছে রেখে দেয়, সে অন্য কোন পণ্য পাবে না; সেহেতু, কোন পণ্য না কিনে চিরদিনের জন্য টাকা নিজের কাছে রেখে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাপ্ত টাকার একটা অংশ দীর্ঘ সময়ের জন্য অথবা সমস্ত টাকাটা কিছু সময়ের জন্য নিজের কাছে রেখে দেওয়া সম্ভব। এর অর্থ হলো, যে পরিস্থিতিটা বার্টার পদ্ধতিতে ছিল না, টাকার মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে সেটা শুরু হয়, আর এটাই হলো সেই ভারসাম্যহীনতা।

অর্থের মাধ্যমে যে 'সঞ্চলন' সংগঠিত হলো, বার্টার পদ্ধতির বিনিময়ের সকল সীমাবদ্ধতাকে তা অতিক্রম করতে সক্ষম হলো। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিক্রয় এবং ক্রয় পৃথক হয় না; কিন্তু, সঞ্চলন কোথায় ঘটবে, কখন ঘটবে, কত সময় ধরে ঘটবে সবকিছু পৃথক হয়ে যায়। বার্টার পদ্ধতিতে ক্রয় এবং বিক্রয় একই স্থানে একই সময়ে ঘটে, অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ক্রয় একখানে এবং বিক্রয় অন্য একখানে ঘটতে পারে। এভাবে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ক্রয় এবং বিক্রয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টির অনুকূল ক্ষেত্রের উদ্ভব ঘটে। কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি বিনিময়ের ঘটনার পথ পরিক্রমণের মধ্যে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যে পরিস্থিতিতে ক্রয় এবং বিক্রয়ের মধ্যে কোন ভারসাম্য না থাকতে পারে, ফলে বাজার একটা ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, যা পণ্য সঞ্চলন প্রবাহকে থামিয়ে দেয়।

৩. 'অর্থে'র চলাচল (Circulation of 'Money')

বার্টার পদ্ধতির বিনিময়ের ক্ষেত্রে অর্থ বা টাকার কোন উপস্থিতি থাকে না, এখানে পণ্যের শুধুমাত্র উভয় দিকে চলাচলের ঘটনার উপস্থিতি থাকে। এর অর্থ হলো, কেবলমাত্র পণ্যসমূহ, যাদেরকে বিনিময় করা হয়, এদিকে এবং ওদিকে চলাচল করে। কিন্তু, টাকা বা অর্থের মাধ্যমে বিনিময়ের ঘটনায়, পণ্যসমূহের চলাচলের এবং একই সাথে টাকারও চলাচলের ঘটনা ঘটে।

ধরা যাক, বিনয় ২০০ টাকায় কাপড় বিক্রি করলো এবং এর পরে এই টাকা দিয়ে শস্য ক্রয় করলো। এই সমগ্র ঘটনায়, এখানে কেবলমাত্র ২টা পণ্যই এদিকে এবং ওদিকে চলাচল করেনি একই সাথে টাকাও দুই বার চলাচল করেছে। প্রথম দফায়, টাকা কাপড় ক্রয়কারীর কাছ থেকে বিনয়ের কাছে এসেছে। দ্বিতীয় দফায়, টাকা বিনয়ের কাছ থেকে শস্য বিক্রেতার কাছে গেছে। টাকা এভাবে দুই বার চলাচল করেছে একটা পণ্য বিক্রয় এবং অন্য একটা পণ্য ক্রয়ের এই ঘটনায়।

যেহেতু পণ্য এবং অর্থ উভয়ে এসব বিনিময়ের ঘটনায় চলাচল করে, এক্ষেত্রে এসব চলাচলকে কেন্দ্র করে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। প্রশ্নটা হলো : পণ্যসমূহের চলাচলের উপর কি অর্থের চলাচল নির্ভর করে অথবা অর্থের চলচলের উপর কি পণ্যসমূহের চলাচল নির্ভর করে? কে কার উপর নির্ভর করে? কোন্‌টা এমন ঘটনার মূল ভিত্তি? উত্তর হলো : অর্থের চলাচল পণ্যসমূহের চলাচলের উপর নির্ভরশীল। পণ্যসমূহই হলো বিনিময়ের মূল ভিত্তি। পণ্যসমূহ অর্থ ব্যতিরেকেই চলাচল করতে পারে (বার্টার পদ্ধতিতে পণ্যসমূহ অর্থ ছাড়াই চলাচল করে), কিন্তু অর্থ পণ্য ব্যতিরেকে চলাচল করতে পারে না।

কাপড় বিক্রি এবং শস্য ক্রয়ের উদাহরণে, অর্থ প্রথম দফায় চলাচল না-ও করতে পারে, যদি কাপড় বিক্রির উপযোগী অবস্থায় প্রস্তুত না থাকে। দ্বিতীয় দফায়

অর্থ চলাচল করবে না, যদি শস্য বিক্রির জন্য প্রস্তুত না থাকে। পণ্যসমূহ বিক্রির জন্য প্রস্তুত না-ও থাকতে পারে। অথবা পণ্যসমূহ প্রস্তুত থাকলেও পরিভোগের জন্য প্রয়োজনে না-ও লাগতে পারে। এভাবে, যদি পণ্যসমূহ কোন এক কারণে অথবা পণ্যসমূহের দিক থেকে উদ্ভূত অন্য কোন কারণে চলাচল না করে, সেক্ষেত্রে অর্থও চলাচল করে না। যদি পণ্যসমূহের চলাচল থেমে যায়, অর্থেরও চলাচল থেমে যায়। এর অর্থ হলো, অর্থের চলাচল পণ্যসমূহের চলাচলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু পণ্যসমূহের চলাচল অর্থের চলাচলের উপর নির্ভর করে না। যদি কোন সময় 'পণ্যের সঞ্চলন' থেমে যায়, এর কারণ একমাত্র পণ্যের দিক থেকে আসে কিন্তু অর্থের দিক থেকে নয়।

অর্থের দিক থেকে উদ্ভূত নির্দিষ্ট বিশেষ কয়েকটা পরিস্থিতির বিষয় আমাদের এখানে বিবেচনা করতে হবে। মাঝে মাঝে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যাতে করে সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজন যত টাকার, তার উপস্থিতি বাজারে না-ও থাকতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে 'পণ্য সঞ্চলন' পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি এসে হাজির হয়। যদিও এসব পরিস্থিতি যেন অর্থের দিক থেকে উপস্থিত হচ্ছে বলে আপতত মনে হয়। কিন্তু আমরা যদি আরও গভীর ভাবে এর মূল কারণ অনুসন্ধান করি, তাহলে দেখতে পাবো, এটা পণ্যসমূহের দিক থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

'পণ্যসমূহের নিরবচ্ছিন্ন চলাচল' নির্ভর করে অবাধ পণ্য বিনিময়ের উপর, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয়সমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ বিক্রয়ের ঘটনা বাজারে বিদ্যমান থাকলেই সম্ভব। যা-কিছুই ঘটুক না-কেন, চলাচলের প্রতবন্ধকতার মূল কারণ সব সময় একমাত্র পণ্যসমূহের দিক থেকে উদ্ভূত হয়।

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে যখন একটা পণ্য অর্থ দিয়ে ক্রয় করা হয়, ওই পরিমাণ অর্থ 'দামের মানদণ্ড' হিসেবে কাজ করে। যদি আমরা এই ঘটনাকে অন্য ভাবে বলি, আমরা এটাও বলতে পারি যে ওই অর্থ 'ক্রয়ের মাধ্যম' হিসেবে কাজ করে। এর অর্থ হলো, বিক্রয়ের মাধ্যমও বটে। আমরা যখন বলি 'দামের মানদণ্ড', 'ক্রয়ের মাধ্যম', 'সঞ্চলনের মাধ্যম', 'সঞ্চলন মাধ্যম', 'বিনিময়ের মাধ্যম'–এই কথাগুলোর অর্থ একই। পণ্যসমূহের বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে একমাত্র অর্থের চলাচল গড়ে তুলেছে 'অর্থের সঞ্চলন'।

যদি অর্থ একবার চলাচল করে, এর অর্থ হয়, একটা পণ্যের 'বিক্রয়' সংগঠিত হলো। যদি এটা ১০ বার চলাচল করে, এর অর্থ হয়, ১০টা পণ্যের 'বিক্রয়' সংগঠিত হয়েছে। যদি একটি অর্থ মুদ্রা (money coin) নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলাচল করে, এর অর্থ হয় পণ্যসমূহও অবাধে চলাচল করছে। সেহেতু বলা যায়, অর্থের

চলাচল হলো পণ্যসমূহের চলাচল। কিন্তু, এই ঘটনা আপতদৃষ্টিতে উল্টাভাবে হাজির হয়। এটা এমন ভাবে প্রতিভাত হয়, যেন 'অর্থ চলাচল করছে সেহেতু পণ্যসমূহ চলাচল করছে'; কিন্তু 'পণ্যসমূহ চলাচল করছে বলেই অর্থও চলাচল করছে' এমন হিসেবে নয়। অর্থাৎ, এটা প্রতিভাত হয় যেন অর্থই 'পণ্য সঞ্চলন'-এর ভিত্তি। কিন্তু, এটা ঠিক নয়। অবাধ অথবা বাধাযুক্ত অথবা অন্য কোন ধরনের পণ্য সঞ্চলন পরিক্রমায় মূল প্রভাবকের ভূমিকা রাখে পণ্যসমূহ, অর্থ নয়।

৪. 'সঞ্চলন মাধ্যম'-এর পরিমাণ
(Quantity of the means of circulation)

'পণ্য সঞ্চলন মাধ্যম' হচ্ছে সেই মাধ্যম যা পণ্যসমূহের সঞ্চলনকে সহজতর করে। আর এই মাধ্যমটা হলো অর্থ। 'সঞ্চলন মাধ্যমের পরিমাণ' বলতে বুঝায় 'অর্থের পরিমাণ'।

যেহেতু অর্থ টাকা হিসেবে বার্টার পদ্ধতির বিনিময়ে উপস্থিত থাকে না, সেখানে অর্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন সমাজে উপস্থিত থাকে না। কিন্তু পণ্য চলাচলের বা সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে অর্থের সমাজে প্রবেশের পরে, অর্থ সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় আমাদের অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

মাত্র একটা বা দুটা পণ্যই সমাজে থাকে না, লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি পণ্য সমাজে রয়েছে। প্রতিদিন কয়েক কোটি পণ্যের বিক্রয়ের ঘটনা সমাজে ঘটছে। "সমাজে বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই সমগ্র পণ্যের জন্য সর্বমোট কত টাকার উপস্থিতি থাকা দরকার?"–অর্থ বিষয়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

আমরা সাধারণত সমাজে অর্থের উপস্থিতি রয়েছে একথা প্রায়ই বলি, কিন্তু প্রশ্ন হলো এই অর্থ কোথায় রয়েছে? অর্থ একমাত্র জনগণের কাছেই থাকে। সমাজে সকল মানুষের কাছে অর্থ থাকে। কিছু মানুষের কাছে বিশাল পরিমাণ অর্থ থাকতে পারে, অন্য দিকে কিছু মানুষের কাছে কম পরিমাণ অর্থ থাকতে পারে। কিছু মানুষের কাছে মোটের উপর না-ও থাকতে পারে। এসব পার্থক্য বিবেচনায় না নিয়ে সমাজটাকে সামগ্রিক অর্থে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, সমাজে সর্বমোট অর্থের পরিমাণ হবে সমাজের সকল মানুষের কাছে যে অর্থ রয়েছে তার একত্রিত পরিমাণটাই। এখানে হিসেবে আসবে ওই অর্থ যা দিয়ে বিভিন্ন পণ্য বিনিময় করা হচ্ছে। যেহেতু কোন সমাজে পণ্য বিনিময়ের জন্য এক টাকার মুদ্রা বা দুই টাকার মুদ্রাই যথেষ্ট নয়, আমাদেরকে দেখতে হবে : 'সমাজে কত টাকা থাকতে হবে?'

কোন পণ্যের অর্থের সাথে বিনিময় ঘটার পরের ধাপে ওই পণ্যটা চূড়ান্ত পর্যায়ে সঞ্চলন প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে পরিভোগে চলে যায়। কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে

এমনটা ঘটে না। অর্থ কোন পণ্যের সাথে বিনিময়ের পরের ধাপে সঞ্চলনের বাইরে চলে যায় না। ওই একই মুদ্রা তখন অন্য একটা পণ্যের সাথে বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থ সর্বদাই একটা পণ্যের সাথে বিনিময়ের পর আর একটা পণ্যের সাথে বিনিময়ের সঞ্চলন পরিক্রমায় সচল থাকে। এটাই হচ্ছে অর্থ বা অর্থ-মুদ্রার ভূমিকা। একটা দিনের মধ্যে একটা মুদ্রার কয়েকটা পণ্যের সাথে বিনিময় ঘটতে পারে। আমাদের আগের উদাহরণে ৪টা পণ্যের উল্লেখ ছিল, ২ টাকার মুদ্রা প্রথমে গমের সাথে বিনিময় করা হয়েছিল, পরে কাপড়ের সাথে, পরে শস্যের সাথে এবং সব শেষে ভুট্টার সাথে। এর পরের ধাপে, এই মুদ্রাকে একই ভাবে যেকোন সংখ্যক পণ্যের সাথে বিনিময় করা যেতে পারে।

আমরা সাধারণত বলি যে 'পণ্যটার মূল্য উশুল হলো', এই কথার মানে হলো ওই পণ্যটা বিক্রি হয়েছে এবং টাকায় তার মূল্যটা আমরা পেয়েছি। 'উশুল' কথাটার অর্থ হলো, পণ্যটার মূল্য বাস্তব 'সত্য' হলো এবং অর্থটা আমার হাতে আসলো। 'কত টাকা সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় সচল থাকবে' এটা নির্ভর করে সর্বমোট অর্থের পরিমাণ যা একই সময়ে উশুল করতে হবে।

'একই সময়' কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে, আমাদেরকে এক সপ্তাহ বা একদিন বা নির্দিষ্ট একটা সময়কে বিবেচনায় নিতে হবে। আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে 'এক দিন'-কে ধরে নিলাম। আমরা ধরে নিলাম, ১০০ টাকা মূল্যের পণ্য থেকে এক দিনে তার মূল্য হিসেবে ১০০ টাকা উশুল করতে হবে এবং ওই সঞ্চলনে প্রতিটা মুদ্রা এক দিনে একবার চলাচল করেছে। এই সঞ্চলন পরিক্রমায় চলাচল সচল রাখতে কত টাকা এখানে থাকতে হবে? ১০০ টাকা থাকতে হবে। অথবা, আমরা যদি ধরি, প্রতিটা মুদ্রা দিনে ২ বার চলাচল করেছে, এক্ষেত্রে সঞ্চলন চালু রাখতে ৫০ টাকাই যথেষ্ট হবে। প্রথম চলাচলে ৫০ টাকা মূল্যের পণ্য থেকে ৫০ টাকা উশুল হবে, দ্বিতীয় চলাচলে ৫০ টাকা মূল্যের পণ্য থেকে ৫০ টাকা উশুল হবে। এভাবে একটা দিনের মধ্যে ১০০ টাকা মূল্যের পণ্য থেকে ১০০ টাকা উশুল হলো। সেহেতু, সঞ্চলনে কত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, এটা নির্ভর করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে মোট কত মূল্য উশুল করতে হবে তার ওপর এবং ওই সময়ে টাকার গড় চলাচলের ওপর।

বাস্তবে বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা সঞ্চলনে উপস্থিত থাকে, ১ টাকার মুদ্রা, ২ টাকার, ৫ টাকার, ১০ টাকার এবং ১০০ টাকার মুদ্রা এমনি ভাবে আরও হতে পারে। এসব মুদ্রার মধ্যে কিছু মুদ্রা বেশি চলাচল করে কিছু মুদ্রা কম চলাচল করে। সেহেতু, আমরা একটা গড় অবস্থার কথা বিবেচনায় নিতে পারি। ধরা যাক, এই সঞ্চলনে

সকল মুদ্রা একই মূল্যের, অর্থাৎ ২ টাকার আর দিনে এই মুদ্রা গড়ে ২ বার চলাচল করেছে। এর অর্থ হলো, প্রতিটা মুদ্রা দিনে ৪ টাকা উশুল করে। এই ক্ষেত্রে, যেখানে একদিনে ১০০ টাকা উশুল করতে হবে, সেখানে সঞ্চলনে ১০০ − ৪ = ২৫টা মুদ্রা থাকতে হবে। প্রতিটা মুদ্রা ২ টাকা মূল্যের, ২৫টা মুদ্রার মোট মূল্য দাঁড়ায় ৫০ টাকা। আমাদের উদাহরণে এই ৫০ টাকাকে সঞ্চলনে চলাচল করতে হবে। এই মুদ্রাগুলোকে ১০০ টাকা মূল্যের পণ্যের সাথে ১ দিন সঞ্চলন পরিক্রমার মধ্যে থেকে চলাচল করতে হবে।

এই উদাহরণকে আমরা অন্যভাবে দেখতে পারি। ধরে নিলাম, এই সঞ্চলনে প্রতিটা মুদ্রা ৫ টাকার এবং প্রতিটা মুদ্রা দিনে ২ বার চলাচল করছে। আমাদেরকে ১০০ টাকা মূল্যের পণ্য থেকে ১০০ টাকা একদিনে উশুল করতে হবে। এক্ষেত্রে কত টাকা এই সঞ্চলনে থাকতে হবে? যদি প্রতিটা মুদ্রা দিনে ২ বার চলাচল করে, তাহলে দিনে ৫ ২ = ১০ টাকা উশুল হবে। এখানে ১০০ টাকা উশুল করতে হবে। সেহেতু, ১০০ ১০ = ১০টা মুদ্রা এখানে লাগবে। যেহেতু একটা মুদ্রার মূল্য ৫ টাকা, ১০টা মুদ্রার মূল্য হবে ৫০ টাকা। এক্ষেত্রেও আমরা একই পরিমাণ অর্থ পেয়ে যাচ্ছি। সঞ্চলনে ২ টাকা মূল্যের বা ৫ টাকা মূল্যের যে মূল্যের মুদ্রাই উপস্থিত থাকুক না-কেন, এই সঞ্চলনে চলাচলের জন্য একই পরিমাণ অর্থের উপস্থিতি থাকার প্রয়োজন হচ্ছে। যদি সঞ্চলনে অধিকতর মূল্যের মুদ্রার উপস্থিতি থাকে, সেক্ষেত্রে কম সংখ্যক মুদ্রা লাগবে; আর কম মূল্যমানের মুদ্রা থাকে তখন বেশি সংখ্যক মুদ্রা লাগবে। আমরা যেভাবেই দেখি না-কেন, ঘটনার মূল যুক্তিধারা থাকবে একই প্রকৃতির।

বাস্তব ক্ষেত্রে সঞ্চলনে বিভিন্ন মূল্যমানের মুদ্রার উপস্থিতি থাকে। যেকোন মূল্যমানের মুদ্রাই উপস্থিত থাকুক না-কেন, সঞ্চলনে এর জন্য কোন প্রভাব পড়ে না। আমরা যদি সমস্ত মুদ্রার মূল্যকে যোগ করি, পণ্য বিনিময়ের জন্য সেটাই (যোগফল) যথেষ্ট হবে।

একটা সঞ্চলনে কত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, এটা নির্ধারণ করতে আমাদের মোট কত পরিমাণ মূল্য উশুল করতে হবে সেটা জানতে হবে; আর মুদ্রার গড় চলাচলের সংখ্যাও জানতে হবে। একটা সঞ্চলনে কত পরিমাণ অর্থের উপস্থিতি থাকতে হবে? উশুল করতে হবে মোট যে পরিমাণ মূল্য তাকে মুদ্রার চলাচলের গড় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে তা আমরা পেয়ে যাব। ঘটনা হলো এই যে সঞ্চলনে কত টাকার উপস্থিতি থাকতে হবে? বিষয়টা বিবেচনা করতে হলে আমাদের সমগ্রভাবে সময়টা কত সেটা মাথায় রাখতে হবে।

সঞ্চলনে অর্থের পরিমাণ কত সেটা মূলত ৩টা বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (১) পণ্যের পরিমাণ, (২) মূল্যের পরিস্থিতি এবং (৩) অর্থ সঞ্চলনের গতি।

১. পণ্যর পরিমাণ

যখন আমরা পণ্যসমূহের কথা বলি, এসব পণ্য বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন : শস্য, কাপড়, ওধুধ, লোহা এবং কয়লা। যে-কোন ধরনের পণ্যের পরিমাণ প্রতি বছর একই থাকে না। যদি কোন বছর গত বছরের তুলনায় বেশি ফসল উৎপাদন হয়, এক ব্যাগ শস্যের মূল্য গত বছরের তুলনায় কমে যায়। যদি অন্য কোন বছরে ফসলের উৎপাদন কমে যায়, তখন এক ব্যাগ শস্যের দাম বেড়ে যায়। অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। পণ্যসমূহের পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে পণ্যসমূহের মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে। যখন কোন পণ্যের একক অংশের মূল্যের পরিবর্তন ঘটে, এই একক অংশগুলোর মূল্য যোগ করলে তখন সর্বমোট মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে যায়। যদি তাদের উশুল হওয়া মোট মূল্যের পরিবর্তন ঘটে এমন সব ক্ষেত্রে, সকল ধরনের পণ্যের মূল্যের পরিবর্তন ঘটার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে যেসব 'প্রধান জিনিস' যেমন : শস্য, তুলা, কাপড়, কয়লা ইত্যাদি জিনিস আমাদের প্রয়োজনে লাগে, এসব জিনিসের মূল্যের পরিবর্তন ঘটাই যথেষ্ট। একক মূল্যের পরিবর্তন ঘটলে, মোট মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটবে।

এক একর জমিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতিরেকেই, যদি অনেক একর জমিতে উৎপাদিত ফলনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় মোটের উপর বৃদ্ধি পায়, তখন 'মোট' ফসলের উৎপাদন বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রতি ব্যাগ শস্যের মূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটতে না-ও পারে। এভাবে, পণ্যসমূহের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটলেও, প্রতি একক অংশের মূল্যের পরিবর্তন ঘটবে না। কিন্তু সাধারণত, পণ্যের একক অংশের মূল্য পণ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। পণ্যসমূহের মধ্যে বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ, যেসব পণ্যকে বিক্রি করা হবে, এমন বিভিন্ন পণ্যের একক অংশের মূল্যের উপর নির্ভর করে। এভাবে, অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, পণ্যসমূহের পরিমাণ প্রধান শর্ত হয়ে দাঁড়ায়।

২. 'মূল্য'-এর পরিস্থিতি

পণ্যসমূহের মূল্য বাড়তে পারে আবার কমতেও পারে, এটা সম্ভব। এর ভিত্তিতে, উশুল হতে পারে এমন মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে। সঞ্চলনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ সর্বমোট মূল্যের উপর নির্ভর করে। এটা এমন একটা বিষয় যা প্রথম বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৩. অর্থ সঞ্চলনের গতি

আমরা দেখেছি, অর্থ চলাচল করে যখন পণ্য চলাচল করে। সেহেতু, পণ্যের চলাচল নিজেই 'অর্থের চলাচল'। এখন আমরা দেখবো 'সঞ্চলনের গতি' বলতে কী বুঝায়। ধরে নিলাম, প্রতি দিন ১০০ মূল্যের পণ্য বিক্রি হচ্ছে। ওই সমস্ত পণ্য 'একই সময়'-এ বিক্রি হচ্ছে। এক্ষেত্রে ওসব পণ্যের বিনিময়ের জন্য ১০০ টাকা উপস্থিত থাকার দরকার হয়। এর অর্থ হয়, সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় ১০০ টাকা থাকতে হয়। এই পরিমাণ টাকা একদিনে চলাচল করবে। আমরা আরও ধরে নিলাম, প্রতিদিন এসকল পণ্যের বিক্রি সম্পন্ন হবে না এবং এক সপ্তাহের জন্য যে পরিমাণ পণ্য লাগবে, তা শুধুমাত্র এক দিনের মধ্যে বিক্রি হবে না। প্রতি সপ্তাহে ৭০০ মূল্যের পণ্য বিক্রি হবে একই সময়ে। তখন, 'সাপ্তাহিক বাজার' এমন জায়গায় ৭০০ টাকা সঞ্চলন পরিক্রমায় চলাচল করতে হবে। এই পরিমাণ টাক সপ্তাহে মাত্র একবার চলাচল করবে।

এই উদাহরণে, যদি আমরা পণ্যের দিক থেকে দেখি, প্রতি দিন ১০০ হারে অথবা প্রতি সপ্তাহে ৭০০ হারে সঞ্চলন দেখবো, দুটা ঘটনা কিন্তু একই। যা-কিছুই ঘটুক না-কেন, পণ্যসমূহের পরিমাণে এবং মূল্যে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। কিন্তু, যদি আমরা অর্থের দিক থেকে দেখি, প্রতি দিন পণ্যসমূহের বিক্রি চালু রাখতে সঞ্চলনে ১০০ অর্থ থাকাটাই যথেষ্ট হবে। কারণ একই টাকা বারবার চলাচল করবে। কিন্তু, পণ্যসমূহের বিক্রির ঘটনা যদি সপ্তাহে একবার ঘটে, সঞ্চলনে ৭০০ অর্থ চলাচলের প্রয়োজন হবে। এই পরিমাণ অর্থ সপ্তাহে একবারই মাত্র চলাচল করবে, বাকি ৬ দিন স্থির হয়ে বসে থাকবে। সেহেতু, সঞ্চলনে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ 'কীভাবে পণ্য চলাচল' করছে তার উপর নির্ভর করে।

এই উদাহরণে, যদি ১০০ পণ্য প্রতি দিন বিক্রি হয়, এর অর্থ দাঁড়ায় পণ্য সঞ্চলনের গতি উঁচু মাত্রার, অথবা যদি ৭০০ পণ্য সপ্তাহে একবারেই বিক্রি হয়ে যায়, পণ্যসমূহের সঞ্চলন গতি হবে নিচু মাত্রার। উঁচু গতি মানে 'বেশি পণ্য বিক্রি হয়ে যাচ্ছে' এমন নয় এবং কম গতি মানে 'কম পণ্য বিক্রি হয়ে যাচ্ছে' এমন নয়। এক্ষেত্রে গতি যাই হোক না-কেন, প্রতি দিন পণ্যের বিক্রি ১০০ এবং সপ্তাহে ৭০০ থাকবে। সঞ্চলন গতির সাথে সম্পর্কহীন থেকে পণ্যের পরিভোগের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

অর্থ সঞ্চলনের গতি পণ্য সঞ্চলনের গতির উপর নির্ভর করে। যদি পরেরটা উঁচু গতির হয়, প্রথমটাও হবে উঁচু গতির এবং পরেরটা নিচু গতির হলে, প্রথমটাও নিচু গতির হবে।

কিন্তু, সঞ্চলনের গতি যাই হোক না-কেন, পণ্যের পরিমাণের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটবে। সেহেতু, আমরা 'সঞ্চলনের গতি' বোঝাতে একমাত্র অর্থের কথা বলি, পণ্যের উল্লেখ করি না। এর অর্থ হলো, যদি অর্থের সঞ্চলন গতি বৃদ্ধি পায়, সঞ্চলন ক্ষেত্রে চলাচলের জন্য কম অর্থ হলেই যথেষ্ট হবে। অথবা, যদি সঞ্চলনের গতি কমে যায়, বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে। এভাবে, সঞ্চলনের গতি অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনে।

অন্য একটা উদাহরণকে আমরা বিবেচনা করতে পারি। ধরে নিলাম, ১০০ মূল্যের পণ্য প্রতি দিন বিক্রি হচ্ছে; এক্ষেত্রে পণ্যসমূহের বিনিময়ের জন্য, সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় ১০০ অর্থ আছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে, এখানে একই সময়ে ওই সকল পণ্য বিক্রি না হয়ে, সকালে ৫০ হারে এবং বিকালে ৫০ হারে বিক্রি হচ্ছে, এমনটা আমরা ধরে নিলাম। এর অর্থ হয়, একই সময়ে বিক্রি হওয়া মোট পণ্যের পরিমাণ কমে গেছে, কিন্তু তাদের চলাচলের সময় বেড়ে গেছে। যদি ঘটনা এভাবে ঘটে, এর অর্থ হয়, পণ্যের সঞ্চলন গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা এই অর্থ করে না যে বেশি সংখ্যক পণ্য বিক্রি হচ্ছে এবং পরিভোগে যাচ্ছে। এখানে এক দিনে পণ্য বিক্রির 'মোট' পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। যদি আমরা অর্থের প্রশ্নে আসি, সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় চলাচলের জন্য ১০০ অর্থের পরিবর্তে ৫০ অর্থই এখানে যথেষ্ট। কারণ এক্ষেত্রে একই অর্থ দিনে দুই বার চলাচল করছে। যদি ঘটনা এভাবে ঘটে, এর অর্থ হয়, এখানে অর্থের সঞ্চলন দ্বিগুণ হয়েছে। যদি আমরা ১০০ অর্থের দিনে একবার চলাচল দেখি, এবং ২০০ অর্থের ২ দিনে একবার চলাচল দেখি, তখন বলা যায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সঞ্চলনের গতি অর্ধেক হয়েছে।

অন্য একটা উদাহরণ : ১০০ পণ্য দিনে একই সময়ে বিক্রি হচ্ছে। এক্ষেত্রে সঞ্চলনে ১০০ অর্থ থাকতে হবে। এটা হলো একটা সাধারণ পরিস্থিতি। ধরে নিলাম, উৎসবের কারণে একদিন হঠাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলো। উৎসবের কোন এক দিন, ২০০ পণ্য বিক্রি হতে হবে। এমন পরিস্থিতি সামাল দিতে সঞ্চলনে থাকা অর্থের কোন্ ধরনের পরিবর্তন ঘটবে? এই পরিবর্তনটা দুই ভাবে ঘটতে পারে। (১) প্রথম পর্যায়ে ১০০ পণ্য এবং এর পরেই আরও ১০০ পণ্য বিক্রি হবে। যদি ঘটনা এভাবে ঘটে, এক্ষেত্রে সঞ্চলনের জন্য ১০০ অর্থই যথেষ্ট হবে। এখানে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না। (২) প্রথম পথের পরিবর্তে আমরা বিষয়টাকে অন্য ভাবে দেখতে পারি। এক্ষেত্রে সমস্ত ২০০ পণ্য একই সময়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতির এই বাধ্যবাধকতা সামাল দিতে ১০০ অর্থ যথেষ্ট হচ্ছে না; এক্ষেত্রে আরও ১০০ অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে। পণ্যের ক্রয়কে কার্যকর রাখতে শুধুমাত্র ১০০ অর্থই যদি বাজারে আসে, এক্ষেত্রে বিক্রয় কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে।

কিন্তু, কোন একদিন হঠাৎ বিক্রি বৃদ্ধি পাবে, এই সমস্যা প্রথম পথ গ্রহণ করেই সমাধান করা যাবে, অর্থাৎ, পণ্যের সঞ্চলণ গতি বৃদ্ধি করে বাজারে শুধুমাত্র প্রাপ্তিযোগ্য অর্থের যোগানের সাহায্যে।

আমরা দৈনিক বিদ্যমান সাধারণ পরিস্থিতিকে বিবেচনা করি, অথবা হঠাৎ উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিকে বিবেচনা করি না-কেন, এই উভয় ক্ষেত্রে অর্থ চলাচলের গতি নির্ভর করে পণ্যসমূহের সঞ্চলন গতির ওপর। এভাবে অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে অর্থের সঞ্চলন গতির ওপর।

অর্থ মুদ্রাসমূহ পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে দাঁড়ায়। আমরা সাধারণত বলি ১০০ অর্থ সঞ্চলনে উপস্থিত আছে, এই সমস্ত অর্থ একই মূল্যের মুদ্রায় থাকে না। এখানে উপস্থিত মুদ্রাসমূহ হবে বিভিন্ন মূল্যের, যেমন : ১ টাকার মুদ্রা, ২ টাকার মুদ্রা, ৫ টাকার মুদ্রা এবং ১০ টাকার মুদ্রা। এই সকল ধরনের মুদ্রা একই ভাবে চলাচল করবে না। কিছু মুদ্রা বেশি সংখ্যক বার এবং কিছু মুদ্রা কম সংখ্যক বার চলাচল করবে। এমনকি যদি আমরা সকল মুদ্রাকে একই মূল্যের ধরি, সেক্ষেত্রেও সকল মুদ্রা একই হারে চলাচল করবে না।

তবুও যেভাবেই মুদ্রাসমূহ চলাচল করুক, সঞ্চলনে প্রবেশ করেছে এমন সকল মুদ্রা হবে একে অপরের পরিপূরক। এর অর্থ হলো, মুদ্রাসমূহের মধ্যে একটা ঐক্যতান থাকবে।

ধরে নিলাম, একজন মহিলা ১০০ টাকা দামের একটা জিনিস কিনছেন। তার কাছে ৫ টাকা এবং ২ টাকার মুদ্রা আছে, কিন্তু ১০ টাকার মুদ্রা নেই। জিনিসটার দাম পরিশোধ করতে তাকে ৫ টাকার ২টা মুদ্রা দিতে হবে।

এর অর্থ হলো, এখানে একটা ১০ টাকার মুদ্রার একবার চলাচলের পরিবর্তে, ২টা ৫ টাকার মুদ্রাকে একবার চলাচল করতে হচ্ছে। ২টা ৫ টাকার মুদ্রাকে সেই কাজটা করতে হচ্ছে, যা ১টা ১০ টাকার মুদ্রা করতে পারতো। যেভাবেই ঘটনা ঘটুক না-কেন, ঘটনার মূল তাৎপর্য একই থাকবে। অথবা, যদি তিনি ৫টা ২ টাকার মুদ্রা দেন, তা হবে ১টা ১০ টাকার মুদ্রার একবার চলাচলের সমরূপ।

যদি একটা মুদ্রা চলাচল না করে, অন্যান্য মুদ্রাসমূহ চলাচল করবে। যদি একটা মুদ্রার চলাচল কমে যায়, অন্যান্য মুদ্রার চলাচল বেড়ে যাবে যাতে করে ওই উশুলযোগ্য মূল্যের সাথে সংগতি রাখা সম্ভব হয়। যদি কোন এক স্থানে মুদ্রার গতি কমে যায়, অন্য কোথায়ও অন্য মুদ্রার গতি বেড়ে যাবে। যদি সকল মুদ্রাসমূহের চলাচল বেড়ে যায়, সঞ্চলনে থাকা মুদ্রার সংখ্যা কমে যাবে, যদি চলাচল কমে যায়, মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

সঞ্চলনে থাকা অর্থের পরিমাণ এভাবে পণ্যের পরিমাণ, মূল্যের পরিস্থিতি এবং অর্থের সঞ্চলন গতির উপর নির্ভর করে। এই ৩টা বিষয় সব সময় স্থিতিশীল থাকে না। এই সকল বিষয়ের কোন-না-কোন পর্যায় পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সেহেতু, যে ভাবেই এসব পরিবর্তন ঘটুক না-কেন, উশুলযোগ্য মোট মূল কিছু সময়ের জন্য স্থিতিশীল থাকে প্রতিদিন পরিবর্তিত হওয়ার পরিবর্তে।

যদি আমরা একটা দেশকে একটা নির্দিষ্ট কালপর্বে বিবেচনা করি, সঞ্চলনে চলাচলের জন্য যে পরিমাণ অর্থের উপস্থিত থাকার প্রয়োজন, ওই পরিমাণটা জানা যাবে যদি আমরা এই অবস্থায় সঞ্চলনের প্রয়োজন কত সেটা জানি। ওই অর্থের প্রয়োজনীয় পরিমাণটার জন্য এখানে একটা গড় সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে অথবা অন্যকিছু। আমরা ধরে নিলাম, গড় মাত্রাটা হলো ১০০ টাকার উপস্থিতি থাকা, ওই একই পরিমাণ ১০০ টাকা বার বার মূল্য উশুলের কাজে যাবে, ওই পরিমাণ অর্থের মধ্যে থাকা কোন মুদ্রা যেভাবেই চলাচল করুক তার প্রতি নিরপেক্ষ থেকে। আমরা যদি ভিন্ন একটা কালপর্বকে বিবেচনা করি, ২০০ টাকা এই পর্যায়ে প্রয়োজন হতে পারে। ওই সমগ্র কাল পরিধিতে ২০০ টাকা বারবার চলাচল করবে।

এভাবে একটা নির্দিষ্ট কাল পরিধিতে, উপস্থিত অর্থের পরিমাণের একটা গড় মাত্রা থাকবে। ওই কালপর্বে, একটা বিশেষ ঘটনায় এই পরিমাণ অর্থ যথেষ্ট না-ও হতে পারে। অথবা, অন্য কোন পরিস্থিতিতে এই পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন মোটের উপর না-ও থাকতে পারে। এসব হলো বিশেষ পরিস্থিতি। যদি অর্থের অবমুক্তিকরণ নীতিমালা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়, কোন দেশে এমনটা ঘটে না যে সঞ্চলনে হঠাৎ বেশি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে, অথবা প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ হঠাৎ কমে যাবে।

সংকটের সময়ে যখন পণ্যের উৎপাদন এবং বিক্রি বড় আকারে থেমে যায়, হঠাৎ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে, যখন উপস্থিত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট না-ও হতে পারে। (এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে 'সংকট' নিয়ে যে অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে আমরা এই বিষয়টা বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবো)। এমন পরিস্থিতি সাধারণ পরিস্থিতিতে ঘটে না।

'অর্থের পরিমাণ'-এর সাথে সম্পর্কিত থেকে কয়েকটা পরিস্থিতি সাধারণ ভাবে তৈরি হয়, যেগুলো আমরা এখানে আলোচনা করবো :

১. পণ্যসমূহের মূল্যে পরিবর্তন না ঘটলেও যেসব কারণে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় : পণ্যসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে, অথবা অর্থের সঞ্চলন গতি কমে গেলে, অথবা এই দুইয়ের প্রতিটার কোন ক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটলে।

২. পণ্যসমূহের মূল্যের পরিবর্তন না ঘটলেও যেসব কারণে অর্থের পরিমাণ কমে যায় : পণ্যের পরিমাণ কমে গেলে, অথবা অর্থ সঞ্চলনের গতি বৃদ্ধি পেলে, অথবা এই দুইয়ের প্রতিটার কোন ক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটলে।

৩. পণ্যসমূহের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যেসব কারণে অর্থের পরিমাণ একই থেকে যায় : পণ্যসমূহের মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে পণ্যের পরিমাণ কমে গেলে, অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য অনুসারে অর্থের সঞ্চলন গতি বৃদ্ধি পেলে, অথবা এই দুইয়ের প্রতিটার কোন ক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটলে।

৪. পণ্যসমূহের মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও যেসব কারণে অর্থের পরিমাণ কমে যায় : পণ্যের পরিমাণ কমে গেলে, অথবা অর্থের সঞ্চলন গতি যদি মূল্য বৃদ্ধির শতকরা হারকে অতিক্রম করে যায়, অথবা এই দুই কারণের প্রতিটার পরিবর্তন ঘটলে।

পণ্যসমূহের মূল্য কমে যাওয়া সত্ত্বেও যেসব কারণে অর্থের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না : পণ্যের মূল্য কমে যাওয়ার অনুপাতে পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে, অথবা অর্থের মূল্য কমার অনুপাতে অর্থের সঞ্চলন গতি কমে গেলে, অথবা এই দুইয়ের প্রতিটার ক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটলে।

৫. অর্থের মূল্য কমে গেলেও যেসব কারণে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় : পণ্যের পরিমাণে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটলে, অথবা অর্থ সঞ্চলনের গতি অতিরিক্ত কমে গেলে, অথবা দুই ঘটনা একত্রে ঘটলে।

এভাবে অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, যেসব পরিস্থিতি এই পরিমাণকে নির্ধারণ করে।

৫. মুদ্রা এবং মূল্যের প্রতীক (Coins and Symbols of Value)

এখনও পর্যন্ত 'অর্থ' বলতে আমরা বুঝি একমাত্র 'সোনা-অর্থ'। 'মুদ্রা' বলতে আমরা বুঝি একমাত্র 'সোনার মুদ্রা'। এখনও আমাদেরকে স্বর্ণমুদ্রার কথা মাথায় রাখতে হয়। যদি পণ্যসমূহের বিনিময়ের ঘটনা ঘটে, মুদ্রাকেও চলাচলে রাখতে হয়। প্রত্যেকটা মুদ্রাকে সব সময় সঞ্চলনে রাখতে হয়, মাঝে মাঝে কিছুটা অবসর দিয়ে। মুদ্রাসমূহকে সব সময় মানুষের হাতে, ব্যাগে এবং বাক্সে প্রবেশ করতে হচ্ছে আবার বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। এই ধরনের চলাচলের জন্য মুদ্রাসমূহ সব সময় একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। একটা নতুন মুদ্রা টাঁকশাল থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে একটু একটু করে ক্ষয়ে যেতে থাকে। যদি আমরা সঞ্চলনে থাকা ১০০ মুদ্রাকে নিয়ে তাদের ওজন লক্ষ করি, প্রতিটা মুদ্রা সামান্য ক্ষয়ে গেছে এটা দেখা যাবে। কিছু মুদ্রা বেশি আর কিছু মুদ্রা কম ক্ষয়ে যেতে পারে, কিন্তু মোটের উপর সঞ্চলনে থাকা সকল মুদ্রাকে একটা পরিমাণ পর্যন্ত ক্ষয়ে যেতেই হবে।

ধরে নিলাম, একটা 'ব্রান্ডের নতুন টাকা' বাজারে এসেছে, টাকাটার একটা নির্দিষ্ট ওজন থাকবে, ধরলাম মুদ্রাটা সাথে করে ২ গ্রাম সোনা এনেছে। এই টাকার মুদ্রাটা নতুন অবস্থায় পুরো ওজন নিয়ে সঞ্চলনে এসেছে। ধরে নিলাম, মুদ্রাটার ওজন সঞ্চলনে কিছু দিন চলাচলের পর অর্ধেক ক্ষয়ে গেছে। এর অর্থ হয়, মুদ্রাটার মধ্যে এখন অর্ধেক সোনা আছে। কিন্তু, এর পরেও ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রাটা সঞ্চলনে চলাচল করতে থাকে, নতুন অবস্থায় যেমন করছিল সেভাবেই। এর অর্থ হয়, এই ক্ষয়ে-যাওয়া টাকাটা দিয়ে একই পরিমাণ পণ্য পাওয়া যায়, নতুন অবস্থায়-থাকা এই একই মুদ্রাটা দিয়ে যেমন পাওয়া যেত। প্রকৃত পক্ষে, ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রাটা দিয়ে নতুন অবস্থায়-থাকা মুদ্রার মতো একই পরিমাণ পণ্য পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সঞ্চলনে থাকা মুদ্রাসমূহের মধ্যে এমন ধরনের কোন পার্থক্য থাকে না।

মানুষ পণ্য দিয়ে তার পরিবর্তে ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রা নিচ্ছে কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছাড়াই, যেন-বা এটা একটা নতুন মুদ্রা। কারণ ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রা দিয়ে মানুষ অন্য পণ্য কিনছে, সেখানে এটা নতুন মুদ্রার মতোই কাজ করছে। এর অর্থ হয়, ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রা দিয়ে নতুন মুদ্রার মতো একই পরিমাণ পণ্য পাওয়া যায়। মানুষ তার পণ্য বিক্রি করে নতুন মুদ্রা অথবা ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রা যেটাই পাক, সেটা অন্য পণ্য কেনার কাজেই ব্যবহার করে, মুদ্রাটা গলিয়ে সোনা না বানিয়ে। যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রাটা গলিয়ে প্রাপ্ত সোনা ব্যবহার করতে চাইতো, পণ্য-ব্যক্তি ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রা থেকে প্রাপ্ত কম ওজনের সোনা নিয়ে পণ্য দিতে রাজি হতো না। মুদ্রা নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো, এটা দিয়ে শুধুমাত্র পণ্য কেনা যাবে, কিন্তু এটা গলিয়ে প্রাপ্ত সোনা ব্যবহার করা নয়। সেহেতু, কোন পণ্য-ব্যক্তি (commodity-person) ক্ষয়ে-যাওয়া পণ্য নিতে ইতস্তত করে না।

একটা ক্ষয়ে-যাওয়া টাকা পুরো মূল্য শরীরে ধারন না করেও, পুরোপুরি মূল্য আছে এমন মুদ্রার মতো ভূমিকা সঞ্চলনে রাখতে পারছে, এর কারণ কী? এর অর্থ হলো, ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রা শরীরে সম্পূর্ণ মূল্য ধারন না করেও, তার শরীরে নামঙ্কিত মূল্যের ভূমিকা রাখছে; অর্থাৎ, টাকার নামের সাথে যে মূল্য মুদ্রিত করা হয়েছে সেই মুল্য। এর অর্থ হলো, মুদ্রা তার প্রকৃত মূল্য অনুযায়ী ভূমিকা রাখছে না, কিন্তু 'প্রতীক নির্দেশিত মূল্য' মতো ভূমিকা রাখছে!

যদি পণ্যসমূহ চলাচল করে, মুদ্রাসমূহও তাদের সাথে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সঞ্চলনে চলাচল করে। মুদ্রাসমূহ এভাবে চলাচল করে বিধায় ক্ষয়ে যেতে বাধ্য। আমরা বিনিময়ের কাজে ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রাসমূহকে পুরো মূল্য আছে এমন মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকি। সেহেতু, একটা মুদ্রা যে শুরুতে পুরো মূল্য ধারন

করে সঞ্চলনে এসেছে, ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে এবং ওজন হারায়, কিন্তু প্রতীক হিসেবে পুরো মূল্য আছে এমন ভূমিকা রাখতে পারে শরীরে পুরো মূল্য ধারন না করেও। এর অর্থ হলো, মুদ্রা নিজেই পুরো মূল্য নিয়ে প্রতীক হয়ে ওঠে, যে মূল্য তার শরীরে শুরুতেই ছিল। এটা হচ্ছে একটা অপরিহার্য পরিস্থিতি, পণ্য সঞ্চলনের মধ্য দিয়ে যা গড়ে ওঠেছে।

অর্থশাস্ত্রের আধুনিক সূত্রগুলো এই 'অপরিহার্য পরিস্থিতি'-কে স্বীকার করে নিয়েছে। এসব সূত্র অনুযায়ী, যেসব মুদ্রা বেশি নষ্ট হয়ে গেছে সঞ্চলন প্রক্রিয়া থেকে তাদেরকে তুলে নেওয়া হয়। অল্প ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রাগুলোকে সঞ্চলনে রেখে দেওয়া যেতে পারে। সঞ্চলন প্রক্রিয়া থেকে মুদ্রাসমূহকে তুলে নিতে, এসব সূত্র ওজনের ক্ষেত্রে কতটা অবক্ষয় ঘটেছে সেই মোতাবেক একটা সীমা নির্ধারণ করেছে। যেসব মুদ্রার অবক্ষয় এই সীমার বাইরে চলে যায়, তাদের আইনত কোন স্বীকৃতি থাকে না। যেসব মূদ্রা এই সীমার মধ্যে আছে, তাদেরকে নতুন মুদ্রার সমান মূল্য আছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

অল্প ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রার আইন অনুযায়ী সঞ্চলনে চলাচল করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু, এগুলোও ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রা। আইন অনুযায়ী নিশ্চিত করা এই অধিকারের বিষয়টি এক পাশে রেখে, আমরা এখন কোন্ পরিস্থিতিতে মুদ্রা মূল্যের 'প্রতীক' হয়ে ওঠে, সেসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নেব। আমরা দেখতে পাবো, মুদ্রার ভূমিকা এমন কিছু হয়ে ওঠে যা তার মূল্যের সাথে সম্পর্কিত নয়। মুদ্রার পক্ষে টাকা হিসেবে ভূমিকা রাখা সম্ভব, এমনকি টাকা হিসেবে তার যে নির্দিষ্ট মূল্য থাকা উচিত তা না থাকলেও! 'কাগজের নোট'-এর উদ্ভব ঘটেছে এমন পরিস্থিতিতে, যেখানে সে যে ভূমিকা রাখে তার সাথে তার প্রকৃত মূল্যের কোন সম্পর্ক থাকে না। 'কাগজের টাকা' যার নিজস্ব কোন মূল্য নেই, 'সোনার টাকা'র পরিবর্তে তার পক্ষে মূল্যের প্রতীক হিসেবে ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে, ঠিক সেই ভূমিকা যা 'সোনার টাকা'র পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল, যে সোনার টাকার পুরো মূল্য নিয়ে ভূমিকা রাখার পরিবর্তে ক্ষয়ের কারণে মূল্য কমে যাচ্ছিল।

যদি সোনার মুদ্রাসমূহ নিজেরাই সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হতে থাকে, তারা ক্ষয়ে যেতে বাধ্য, যার ফলে সোনা নষ্ট হয়ে যায়। সেহেতু, সোনার মুদ্রাসমূহকে একটা নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষিত করা হয় সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় চলাচল করতে না দিয়ে, এর পরিবর্তে 'কাগজের টাকা' সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হতে থাকে। সমস্ত 'অর্থ অবমুক্তিকরণ'-এর সার্বিক দায়িত্ব থাকে সরকারের। যেকোন সমাজে সরকারই এই কাগজের টাকা অবমুক্তিকরণের দায়িত্ব পালন করে। ১, ২, ৫, ১০ এবং ১০০

টাকা কাগজের নোট হিসেবে ছাপানো যেতে পারে, যাতে করে এসব কাগজের নোট সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে আবর্তিত হতে পারে। শুধুমাত্র কাগজের নোট নয়, সস্তা ধাতুর তৈরি 'ক্ষুদ্র মূল্য নির্দেশক মুদ্রাসমূহ' তৈরি করা হয়।

'সোনা-টাকা'র পরিবর্তে 'কাগজের টাকা' অর্থের সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় চলাচল করতে থাকে, যখন সমস্ত সোনা-টাকা সরকারের কোষাগারে (সরকারি ব্যাংক) সংরক্ষিত থাকে। ১টা কাগজের টাকা ১টা সোনার টাকার পরিবর্তে কাজ করে। যত পরিমাণ কাগজের টাকা উপস্থিত থাকবে তত পরিমাণ সোনার টাকা প্রয়োজন হবে।

কাগজের টাকার নিজস্ব কোন মূল্য থাকে না, এর মূল্য থাকে সোনা-টাকার মধ্যে, যে সোনা-টাকা কাগজের টাকার পেছনে নিরাপত্তা হিসেবে অবস্থান করে। যেহেতু সোনার টাকা সঞ্চলন প্রক্রিয়ার আবর্তনে থাকলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, 'কারেন্সি নোট' সোনার টাকার পরিবর্তে সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হতে থাকে। কাগজের টাকার ভূমিকা কেবলমাত্র এই পর্যন্তই।

ধরা যাক, একজন শস্যের মালিক ১ টাকা মূল্যের শস্য অন্য একজনের কাছে বিক্রি করলো। এই শস্যের ক্রেতা শস্যের বিক্রেতাকে একটা এক টাকার 'কাগজের নোট' দিলো। এই কাগজের নোটটা কি শস্য বিক্রেতা গ্রহণ করবে? সে কি বলবে, "যখন আমি তোমাকে শস্য দিচ্ছি, তুমি কেন আমাকে হাতের তালু আকারের একটা কাগজের টুকরা দিচ্ছ? আমি এটা নেব না। আমাকে তুমি কেবলমাত্র সোনার টাকা দিতে পার"। যখন কাগজের টাকা প্রথম সঞ্চলনে আসলো, বিভিন্ন পণ্য মালিকরা এভাবেই কথা বলতো। স্বর্ণ-মুদ্রার যে মূল্য আছে কাগজের টুকরার সেই মূল্য নেই। সেহেতু, মানুষ তাদের পণ্যসমূহ বিক্রির পরিবর্তে কাগজের নোট নিতে ভয় পেত। কিন্তু, একজন মানুষ পণ্য বিক্রির মাধ্যমে তার পণ্যের পরিবর্তে যে অর্থ পায়, তা দিয়ে সে কী করে? সে এই অর্থ দিয়ে অন্য একটা পণ্য ক্রয় করে, এটাই কি ঘটে না? যখন কাগজের টুকরাগুলো দিয়েও বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছিল, মানুষ যখন এটা বুঝলো, তখন কাগজের নোটের প্রতি আস্থার ভয় চলে গেল। এভাবে পণ্যসমূহের পরিবর্তে কাগজের নোট নেওয়ার প্রতি মানুষের সন্দেহ ও দ্বিধা-সংকোচ আর থাকলো না। যখন একজন কাগজের নোট নিয়ে অন্যদের কাছে গেল তার পণ্য ক্রয়ের জন্য, তখন পণ্য-বিক্রেতারও কাগজের ওসব নোট নিতে আর দ্বিধা-সংকোচ থাকলো না। যখন সকল মানুষ সময়ের সাথে সাথে কাগজের নোটের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো, তখন থেকে কাগজের নোট দিয়ে পুরোদমে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়ে গেল। কিছু বিক্রেতা তখনও সোনার মুদ্রায় কেনা-বেচা চালু রেখেছিল ঠিকই, তারা কাগজের নোট এবং স্বর্ণ-মুদ্রা দুটোই চালু রেখেছে। তাদের কাছে কাগজের

নোট এবং স্বর্ণ-মুদ্রা দুটোই সমান। যখন কোন একজন কাগজের নোট দিয়ে এক তাল সোনা কিনতে চায়, অন্য কোন পণ্য ক্রয়ের মতো ঘটনাটা একই দাঁড়ায়। ১ টাকা মূল্যের কাগজের নোট দিয়ে সে যে পরিমাণ সোনা ক্রয় করতে পারে, একই পরিমাণ সোনা সে ১ টাকা মূল্যের স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়ে ক্রয় করতে পারে। অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তির কাছে ১ টাকার কাগজের নোট থাকে, সেটা তার কাছে ১ টাকার স্বর্ণ-মুদ্রা থাকারই সামিল। সেহেতু, কোন ব্যক্তির জন্য ১ টাকার কাগজের নোট এবং ১ টাকার স্বর্ণ-মুদ্রার মধ্যে কোন পার্থক্য নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকার আর প্রয়োজন থাকলো না। এখন কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ব্যতিরেকেই মানুষ কাগজের নোট নিয়ে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারছে।

একমাত্র কাগজের টাকাই এখন সঞ্চলনে চালু রয়েছে, কিন্তু এসব কাগুজে নোট দ্রুত পুরনো এবং দীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। আমরা ছেঁড়া নোট দিয়ে নতুন নোট পেয়ে যাই। ছেঁড়া কাগজের নোট নতুন নোট দিয়ে বদল করার তুলনায় ক্ষয়ে-যাওয়া স্বর্ণ-মুদ্রার বদলে নতুন স্বর্ণ-মুদ্রা পাওয়া অনেক বেশি খরচবহুল। সেহেতু, কাগজের নোট ছিঁড়ে যাওয়াটা কোন বড় সমস্যা নয়। এভাবে স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের নোট সঞ্চলনে এসে গেল।

স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের নোট চালু হয়ে গেল, এর অর্থ কি কাগজের টাকা সোনার পরিবর্তে 'সাধারণ সমতুল' হয়ে ওঠলো? না, মোটেই তা নয়। এমনকি এখনও সোনাই থেকে গেল 'সাধারণ সমতুল'। এখনও একমাত্র সোনা পাত্রের মতো মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড হয়ে থাকলো। সেহেতু, সোনা এখনও 'অর্থ'র মানদণ্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা জানি, অর্থ কেবলমাত্র 'মূল্য পরিমাপ'-এর মানদণ্ড হিসেবে ভূমিকা রাখে না, সঞ্চলন মাধ্যম হিসেবেও চলাচল করে। সোনার টাকা সঞ্চলনে চলাচল করলে যেহেতু ক্ষয়ে যায়, সোনার টাকা দ্বিতীয় ভূমিকাটা কাগজের টাকার উপর অর্পণ করেছে। যেহেতু কাগজের নোট প্রকৃত অর্থের ভূমিকাগুলোর একটা অন্তত পালন করে, কাগজের নোট 'অর্থ' এই নামটাও অর্জন করলো। তবুও, এটা এই অর্থ করে না যে কাগজের নোট 'সাধারণ সমতুল'-এর অবস্থানে এসে গেল। একমাত্র সোনাই এখনও 'অর্থের অবস্থান'-এ দাঁড়িয়ে আছে।

কাগজের টাকা চালুর পর থেকে সকল স্বর্ণ-মুদ্রা তাদের 'মুদ্রা-রূপ' পরিত্যাগ করলো। এরপর থেকে সমস্ত সোনা পিণ্ডাকারে সরকারি ব্যাংকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

যেহেতু বর্তমানে যেকোন পণ্য একমাত্র কাগজের টাকার সাথে বিনিময় করা হয়, এখন কাগজের টাকার রূপ নিজেই মূল্যের নিজস্ব-রূপ গঠন করেছে। অর্থাৎ, ১ কিলো শস্য বিক্রি করে আমরা যদি ১ টাকার একটা কাগজের নোট পাই, ওই শস্যের মূল্য তখন '১ টাকার কাগজের নোট' হিসেবে উপস্থিত হয়। 'সঞ্চলনের মাধ্যম' এই নামের সাধারণ পরিভাষা হলো 'কারেন্সি' অর্থাৎ কাগুজে নোট। সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় কাগজের নোটই থাকুক অথবা স্বর্ণ-মুদ্রাই থাকুক, উভয়ের রয়েছে একই নাম।

কাগজের নোটের আবির্ভাবের পরে, সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় 'কত পরিমাণ টাকা' থাকতে হবে, এ সংক্রান্ত একটা আইন কার্যকর করার প্রয়োজন এসে গেল। আমরা আগেই সঞ্চলনে কত পরিমাণ অর্থ থাকা দরকার তা দেখেছি। এটা সোনার টাকায় বা কাগজের নোটের ক্ষেত্রে একই ভাবে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হবে না।

ধরে নিলাম, ১০০ টাকার সমান মোট মূল্য উশুল করতে হবে। এর অর্থ হলো, সঞ্চলনে ১০০ টাকা উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ, উপস্থিত মোট অর্থের পরিমাণ ১০০ টাকার বেশিও হবে না কমও হবে না। এর অর্থ হলো, অর্থের পরিমাণের একটা উর্ধ্বতম সীমা এবং একটা নিম্নতম সীমা থাকতে হবে।

অর্থের পরিমাণ ১০০ টাকার (নিম্নতম সীমা) কম হতে পারবে না এই নিয়মটা সোনার টাকা এবং কাগজের টাকা উভয়ের ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রযোজ্য। যখন উশুলযোগ্য মোট মূল্যের পরিমাণ হবে ১০০ টাকা, পণ্যসমূহের বিক্রয়ের কার্যক্রম সহজে কার্যকর হতে পারবে না, যদি না ১০০ টাকা সঞ্চলনে উপস্থিত থাকে। সেহেতু, নিম্নতম সীমার এই নিয়ম সকল ধরনের অর্থের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু উচ্চতম সীমার ক্ষেত্রে সোনার টাকা এবং কাগজের টাকার মধ্যে একটা পার্থক্য এসে হাজির হয়। যখন উশুলযোগ্য মোট মূল্যের পরিমাণ হয় ১০০ টাকা, সঞ্চলনে থাকা অর্থ যদি এক্ষেত্রে হয় সোনার টাকা, ১০০ টাকার বেশি উপস্থিত থাকলেও বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়বে না। এক্ষেত্রে এর জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না। এমনকি যদি মানুষের কাছে বেশি স্বর্ণ-মুদ্রা থাকেও, তারা ১ টাকা মূল্যের পণ্যের পরিবর্তে বেশি স্বর্ণ-মুদ্রা পরিশোধ করবে না। অর্থাৎ, মানুষের কাছে অধিক স্বর্ণ-মুদ্রা থাকলেও পণ্যের দামের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়বে না। কিন্তু যদি এটা কাগজের টাকা হয়, এবং যদি উপস্থিত টাকার পরিমাণ যত টাকা উপস্থিত থাকা উচিত তার চেয়ে বেশি হয়, এর ফলে জিনিসের দাম বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য ঘটনাও ঘটে (আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে 'পুঁজিবাদী দাম' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)। আমরা এখানে যা জেনেছি তার সারমর্ম হলো : সমাজে

কাগজের নোট চালু হওয়ার পর থেকে কাগজের নোটের মোট পরিমাণ সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন নিয়ম কার্যকর করার প্রয়োজন দেখা দেয়, সোনার টাকা চালু থাকা অবস্থায় যার কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

৬. অর্থের সঞ্চয় (Hoarding of Money)

যদি কোন পণ্য বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে অন্য কোন পণ্য ক্রয় করা না হয়, ওই অর্থটা সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে না। ধরা যাক, একজন তাঁতি তার কাপড় বিক্রি করে ৪ টাকা পেল। যদি সে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থটা ব্যবহার না করে সঞ্চয় করে রাখে, সে তার প্রয়োজন এমন কোন পণ্য ক্রয় করতে পারবে না। আর এই কারণে তার পক্ষে সমস্ত টাকাটা সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। ধরে নিলাম, তাঁতি ৩ টাকা দিয়ে কয়েকটা পণ্য ক্রয় করলো এবং বাকি ১ টাকা নিজের কাছে সঞ্চয় করে রাখলো। অর্থাৎ, তার পরিভোগে লাগবে এমন পণ্যসমূহের একটা অংশ সে কমিয়ে কিছু অর্থ সে সঞ্চয় করলো। অর্থের একটা অংশকে সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে না দিয়ে অবরুদ্ধ করার এই কাজটা হলো 'অর্থ সঞ্চয়'।

অর্থও একটা পণ্য কিন্তু কোন সাধারণ পণ্য নয়। এটা এমন একটা পণ্য যে এক সেকেন্ডের মধ্যে যেকোন ব্যবহার মূল্য (যেকোন পণ্য ক্রয়ের) অর্জন করার বিশেষ সক্ষমতা নিয়ে ক্ষমতাবান। এমন একটা পণ্য যদি কারও হাতে জমা হতে থাকে, এটা তাকে বিশেষভাবে ক্ষমতাবান করে তোলে। পরিমাণটা যত বিশাল হয়, ক্ষমতাও তত বিশাল হয়।

তাঁতি, দর্জি, কাঠমিস্ত্রি, কুমোর এবং এমন সব পেশার মানুষ, যারা বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে এবং বিক্রি করে, তাদের পক্ষে নিজেদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে বিশাল পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। এই ধরনের সাধারণ কাজে জড়িত কোন ব্যক্তি যদি অধিক সঞ্চয় করতে চায়, তার পক্ষে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন না মিটিয়েই কেবলমাত্র এই সঞ্চয়টা গড়ে তোলা সম্ভব। যদি সে এভাবে সঞ্চয় করতে থাকে, এমনকি তার পক্ষে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। সেহেতু, এদের কারও পক্ষে সম্ভব নয় বিশাল পরিমাণ অর্থের সঞ্চয় গড়ে তোলা, একমাত্র 'চুরি' ব্যতীত। বর্তমান সমাজে এটা করার বিভিন্ন পথ আছে। কিন্তু, আমরা এখানে সেসব পথ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না (এই খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এমন সব বিষয় থেকে আমরা এ সম্পর্কে আরও জনতে পারবো)।

শস্য, তুলা, চিনি এমন সব সাধারণ জিনিস (অর্থ ব্যতীত অন্যান্য জিনিস) বিশাল পরিমাণে মজুত করা সম্ভব নয়, অন্য কোন কাজে ব্যবহার না করে। কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে এসব জিনিস নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে ঘটনা

এমন নয়। অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত সোনা, রূপা বা কাগজের নোটের আকারে থাকছে, এর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এভাবে, অর্থ সঞ্চিত করার সুযোগ নিজেই অর্থের সঞ্চয়কে সাহসী করে তোলে।

শস্য, তুলা এবং কয়লা প্রত্যেকের রয়েছে একটা ব্যবহার মূল্য। শস্যের রয়েছে প্রধানত মানুষের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন মিটানোর গুণ। তুলার রয়েছে মানুষের কাপড়ের প্রয়োজন মেটানোর গুণ। একই ভাবে, অন্যান্য জিনিসেরও মানুষের কোন-না-কোন উপকার করার গুণ রয়েছে। এভাবে এসব জিনিসের মানুষের উপকারে আসার গুণের ক্ষেত্রে একটা 'সীমা' থেকে যাচ্ছে। এসব জিনিস, যার রয়েছে 'গুণগত সীমা,' একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বাইরে নিজেদের কাছে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যদি কোন ব্যক্তির প্রয়োজন যতটুকু, তার চেয়ে অতিরিক্ত শস্য তার কাছে থাকে, এটা তার কোন কাজে আসে না। তাকে এই অতিরিক্ত শস্য বিক্রি করে দিতে হয় এবং এর পরিবর্তে অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হয়। এভাবে সে যদি অতিরিক্ত অন্য জিনিস পেয়ে যায়, তারও কোন ব্যবহার থাকবে না। একজন ব্যক্তির পক্ষে কোন জিনিস মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সেহেতু, কোন মানুষের জন্য সীমাতিরিক্ত পরিমাণ শস্য অথবা সীমাতিরিক্ত পরিমাণ তুলা অথবা সীমাতিরিক্ত পরিমাণ জুতা বা সীমাতিরিক্ত পরিমাণ ইট নিজের জন্য রেখে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। 'সীমাবদ্ধ গুণ' রয়েছে এমন সব জিনিস সব সময় 'সীমাবদ্ধ পরিমাণে' প্রয়োজন হয়। একই কথাটা অন্যভাবে বলা যায়, গুণগত দিক থেকে জিনিসসমূহের রয়েছে একটা 'গুণগত সীমা', যা ধারন করে জিনিসসমূহ আমাদের উপকারে আসে কেবলমাত্র একটা 'পরিমাণগত সীমা' পর্যন্ত। এমন প্রকৃতির এসব জিনিসের ক্ষেত্রে 'গুণ' এবং 'পরিমাণ'-এর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না।

কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একই নয়। অর্থের ক্ষেত্রে 'পরিমাণ' এবং 'গুণ' এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বটা কী তা আমরা জানতে পারবো যদি আমরা কিছু অর্থকে বিবেচনায় নিয়ে তার গুণ এবং পরিমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। ধরা যাক, প্রথমে আমরা ১ টাকা নিয়ে তার 'গুণ' কি তা পরীক্ষা করবো। অর্থ মানে 'মূল্য'। কিন্তু এর কোন ব্যবহার-মূল্য নেই। কিন্তু সেকেন্ডের মধ্যে অর্থ যে-কোন ব্যবহার-মূল্যে পরিবর্তিত হতে পারে। অর্থাৎ, অর্থ দিয়ে এক সেকেন্ডের মধ্যে যে-কোন জিনিস ক্রয় করা যায়। সেহেতু, বলা যায় অর্থের সব ধরনের ব্যবহার-মূল্য আছে। অর্থাৎ, এটাই হলো ১ টাকার গুণ। এখানে এই গুণের কোন সীমা নেই। এখন আমরা ১ টাকার পরিমাণ বিষয়ক দিকটা দেখতে পারি। এই পরিমাণের একটা সীমা আছে। আমাদের পক্ষে যে-কোন জিনিস ওই পরিমাণে ক্রয় করা সম্ভব

নয়, যে পরিমাণে জিনিসটা রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র ১ টাকা মূল্যে প্রাপ্তিযোগ্য পরিমাণে ওই জিনিসটা ক্রয় করতে পারি। ১ টাকা দিয়ে আরও অধিক মূল্যের পণ্যসমূহ ক্রয় করা সম্ভব নয়; ২ টাকা অথবা ১০ টাকা মূল্যের পণ্যও ক্রয় করা সম্ভব নয়। যদি আমাদের কাছে ১০ টাকা থাকে, হয়তো বেশি পরিমাণ জিনিস কেনা সম্ভব, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। এই অর্থ দিয়ে ১০ টাকার অধিক মূল্যের জিনিস ক্রয় করা সম্ভব নয়। এমনকি আমাদের কাছে যদি ১০০ টাকা থাকে, তখনও ঘটনা একই ঘটে। সুতরাং, যত বেশি পরিমাণ অর্থ আমাদের কাছে থাকুক-না-কেন, ওই পরিমাণেরও একটা সীমা থাকে। এর অর্থ হলো, আমাদের পক্ষে 'পণ্যের বিশাল জগৎ' থেকে যেকোন পণ্য ক্রয় করা সম্ভব 'অর্থের গুণ' কাজে লাগিয়ে, কিন্তু 'অর্থের পরিমাণ'-কে কাজে লাগিয়ে যেকোন পণ্য ক্রয় করা সম্ভব নয়। যখন অর্থের গুণ সীমাহীন এবং পরিমাণ সীমাবদ্ধ, তাই এমনটা ঘটছে। এই দ্বন্দ্বই অর্থের মধ্যে রয়েছে। এই দ্বন্দ্বই মানুষকে অর্থ সঞ্চয়ের 'প্রণোদনা' দেয়। যেসব মানুষ অর্থ সঞ্চয় করে, তারা অর্থ সঞ্চয়ের লোভের কবলে একের পর এক পড়তে থাকে এবং এভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে, উদ্দেশ্য হলো যে-কোন পণ্য ক্রয়ের সক্ষমতা অর্জন করা, অর্থাৎ অর্থকে যে-কোন জিনিস ক্রয়ের সক্ষমতা অর্জনের গুণের মাত্রায় উন্নীত করা, কিন্তু মানুষ যে-কোন পণ্য নির্দিষ্ট পরিমাণেই পরিভোগ করতে পারে, ক্রয়রেরও রয়েছে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এসব নিয়েই মানুষ এমন সংগতিহীন কাজটা করছে। যারা সঞ্চয় শুরু করে তারা যে-কোন পরিমাণ অর্থ নিয়ে, তা যত বিশাল পরিমাণেরই হোক, সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাদের সঞ্চিত এই অর্থ যত বিশাল পরিমাণের হোক-না-কেন, এমন পরিমাণটা তাদের কাছে সীমিতই মনে হয়। অর্থের মধ্যে 'গুণগত সীমাহীনতা' এবং 'পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা' এই দুই দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্যই অর্থ সঞ্চয়কারীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে অসন্তুষ্ট রাখে। সঞ্চয়কারীদের অসন্তুষ্ট হয়ে এই আচ্ছন্ন বা ঘোরের মধ্যে থাকার বৈশিষ্ট্যটা সব সময় একই পরিমাণে থেকে যায়, যতই তারা সঞ্চয় করতে থাকে।

সোনা এবং রূপা মজুত করা টাকা মজুত করারই সামিল। টাকাকে সোনা এবং রূপায় রূপান্তরিত করা এবং মজুত করা, টাকার এই নান্দনিক রূপও বিকশিত হয়েছে। সোনা এবং রূপাকে দণ্ড বা তাল বা পিণ্ড আকার দিয়ে মজুত করার পরিবর্তে, অলঙ্কার, পাত্র এবং আরও কোন অদ্ভুত ও বিচিত্র আকার দিয়ে মজুত করা হলো – টাকারই 'নান্দনিক রূপ' দিয়ে মজুত করার সামিল। কোন ব্যক্তি টাকার মজুত গড়ে তুলতে আগ্রহী হয় কেবলমাত্র ধনী হওয়ার বাসনায় নয়, ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ থেকেও। এমন সব আগ্রহে উদ্দীপিত হয়ে, তারা সোনা এবং রূপা ব্যবহারের নানা পদ্ধতির বিকাশ ঘটায় এবং তাদের চতুর্দিকে

সোনা এবং রূপার তৈরি ওই সব বিচিত্র এবং অদ্ভুত জিনিসের সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের প্রদর্শনির ব্যবস্থা করে।

৭. 'পরিশোধ মাধ্যম' হিসেবে অর্থের ভূমিকা
(Money functioning as Means of Payment)

আমরা দেখেছি অর্থ প্রধানত ২টা ভূমিকা পালন করে। আমরা এখন অর্থের 'তৃতীয় ভূমিকা' কী, সেটা দেখবো। অর্থ যেসব ভূমিকা পালন করে তার প্রথমটা হলো 'মূল্য পরিমাপক' হিসেবে কাজ করা, দ্বিতীয়টা হলো 'সঞ্চলন মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখা এবং তৃতীয়টা হলো 'পরিশোধ মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখা।

ধরে নিলাম, বিনয় তার কাপড় ২০০ টাকায় প্রকাশের কাছে বিক্রি করতে চাইলো। আমরা জানি যে অর্থ এখানে 'পরিশোধ মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু, ধরা যাক, বিনয় যার কাছে তার কাপড় বিক্রি করলো সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে টাকাটা দিল না, যেহেতু তার কাছে ওই সময় টাকাটা নেই। এক্ষেত্রে প্রকাশ এভাবেই কথা বলবে, "আমার কাছে এই মুহূর্তে কোন টাকা নেই, কিন্তু আমার এখনই কাপড়টা দরকার। এক সপ্তাহ পরে আমি টাকাটা তোমাকে পরিশোধ করে দিব"। ধরা যাক, বিনয় এই শর্তে রাজি হলো এবং প্রকাশকে কাপড়টা দিয়ে দিল। এখানে কাপড়ের সঞ্চলন সম্পূর্ণ হলো কিন্তু টাকা তবুও আসলো না। এর অর্থ হলো, কাপড়ের বিক্রয় সম্পন্ন হলো 'ক্রেডিট পদ্ধতি'র ভিত্তিতে।

যদিও কাপড়ের মালিক এখানে টাকা পেল না, কাপড়ের মূল্য এখানে নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং বিক্রয়ও সম্পন্ন হয়েছে। এই ঘটনা কাপড়ের মালিকের জন্য টাকা পাওয়ারই সামিল। কিন্তু এখানে টাকাটা তার কল্পনায় এসে গেছে তবে বাস্তবে নয়। কাপড়ের মালিক কল্পনা করে নিচ্ছে যে সে তার পণ্যের জন্য ২০০ টাকা পেয়ে গেছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে অর্থ 'মূল্যের পরিমাপক' হিসেবে যে ভূমিকা রাখে সেটা সব সময় কেবলমাত্র কল্পনায়। কিন্তু অর্থ এখন 'সঞ্চলনের মাধ্যম' হিসেবে যে ভূমিকা রাখছে সেটাও একমাত্র কল্পনায়।

ধরে নিলাম, প্রকাশ টাকাটা বিনয়কে এক সপ্তাহ পর পরিশোধ করে দিল। এটার মানে কি এই যে অর্থ এখন 'সঞ্চলনের মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখলো? না, কারণ কাপড়ের সঞ্চলন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে, সেহেতু অর্থ এখন কাপড়ের সঞ্চলনের পক্ষে ভূমিকা রাখতে পারে না। এখন ধারের টাকাটা পরিশোধ করা হচ্ছে। সুতরাং, এর অর্থ হয় এই যে অর্থ এখন 'পরিশোধের মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা

রাখলো। 'ঋণের ভিত্তিতে পণ্যের বিক্রয়' এই ঘটনার ফলে অর্থের জন্য 'পরিশোধের মাধ্যম' এমন একটা নতুন ভূমিকার উদ্ভব ঘটলো।

যখন ঋণ-ভিত্তিক পণ্যের সঞ্চলন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়, অর্থ 'মূল্যের পরিমাপক' এবং 'সঞ্চলনের মাধ্যম' এই উভয় ভূমিকা কেবলমাত্র কল্পনায় পালন করে থাকে এবং 'বাস্তব' অর্থ একমাত্র ঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হয়।

উৎপাদন এবং পণ্যসমূহের বিনিময়ের সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পণ্যসমূহের বিনিময়ের মধ্যে 'ঋণ পদ্ধতি'র প্রবেশ ঘটেছে। বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বিভিন্ন ঋতুর উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট কিছু পণ্য প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে, কিছু পণ্য সপ্তাহে একবার এবং কিছু পণ্য বছরে একবার তৈরি হয়ে থাকে। শস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা তাদের উৎপাদন বছরে একবার বিক্রি করে, কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য বছর ধরে ক্রয় করে থাকে। এসব পণ্যের কিছু তারা নগদ অর্থে ক্রয় করে এবং অনেক জিনিস ঋণের ভিত্তিতে ক্রয় করে থাকে।

'ঋণের ভিত্তি'-তে ক্রয় এবং বিক্রয়ের এসব ঘটনা যেসব কারণে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তা হলো : বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়; এসব পণ্যসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিলম্বের ঘটনা ঘটে এবং নিজেদের পণ্যসমূহ বিক্রয়ের আগেই বিভিন্ন জিনিস ক্রয়ের প্রয়োজন হয়।

বার্টার পদ্ধতির বিনিময়ের সময় থেকে 'ঋণ' বিষয়টা কল্পনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, একটা পাত্রের পরিবর্তে এক জোড়া জুতা নেওয়া হয়েছে। যদি পাত্র দেওয়ার আগেই জুতা নেওয়া হয়ে থাকে, এর অর্থ হয় এই যে এখানে জুতা 'ঋণ পদ্ধতি'-তে নেওয়া হয়েছে। এই ঋণটা পরিশোধ হবে যখন পাত্রটা দেওয়া হবে। এভাবে, বার্টার ব্যবস্থায় 'ঋণ পদ্ধতি'-তে যে-কোন সংখ্যক বিনিময়ের ঘটনা ঘটুক না-কেন, এখানে কোন সমস্যার উদ্ভব ঘটে না। কিন্তু, টাকার মাধ্যমে যখন বিনিময়ের ঘটনা ঘটে, ঋণ পদ্ধতি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে।

পণ্যসমূহের জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে :
যে ব্যক্তি পণ্যটা বিক্রয় করে – – বিক্রেতা
যে ব্যক্তি পণ্যটা ক্রয় করে – – ক্রেতা
পণ্যসমূহের জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে অর্থ পরিশোধ না হওয়ার ক্ষেত্রে :
যে ব্যক্তি পণ্যটা ঋণের ভিত্তিতে বিক্রয় করে – – পাওনাদার
যে ব্যক্তি পণ্যটা ঋণের ভিত্তিতে ক্রয় করে – – ঋণগ্রহীতা

যখন আমরা পণ্যসমূহের সঞ্চলন দেখি, আমরা দেখেছি যে পণ্য-মালিক সব সময় একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা হয়ে থাকে না। প্রত্যেক পণ্য-মালিক কেবলমাত্র তার পণ্যসমূহ বিক্রি করে না অন্যদের পণ্যসমূহও ক্রয় করে থাকে। একই ভাবে, পণ্যসমূহের সঞ্চলন যখন ঋণের ভিত্তিতে ঘটে, কোন পণ্য-মালিক সব সময় পাওনাদার বা ঋণগ্রহীতা হয়ে থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তি একটা সময়ে পাওনাদার আবার অন্য কোন সময়ে ঋণগ্রহীতা। সুতরাং, যে পদ্ধতিতেই পণ্য বিনিময়ের ঘটনা ঘটুক না-কেন, এর পরিণতি উভয়ের দিক থেকে সমপ্রকৃতির (ক্রেতা এবং বিক্রেতা)।

অর্থ যখন 'পরিশোধ মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখে (ঋণভিত্তিক পদ্ধতি) বিনিময় ক্ষেত্রে একটা প্রতিকূল এবং অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

যদি বিনিময়ের অধিকাংশ ঘটনা ঋণ ভিত্তিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, খুবই অল্প পরিমাণ অর্থ সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হলেই যথেষ্ট হবে। অর্থ যখন 'সঞ্চলন মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখে এবং অর্থ যখন 'পরিশোধ মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখে, এই উভয় ক্ষেত্রে কী ঘটে, আমরা এখন সেটা দেখবো।

অর্থ যখন 'সঞ্চলন মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখে :

বিনয় তার কাপড় ২০০ টাকায় প্রকাশের কাছে বিক্রি করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা নিয়ে নিলো। তারপর বিনয় ৩০০ টাকা দিয়ে প্রকাশের কাছ থেকে শস্য কিনলো এবং টাকাটা তাৎক্ষণিক ভাবে দিয়ে দিল। এখানে ২০০ টাকায় কাপড় বিক্রির এবং ৩০০ টাকায় শস্য বিক্রির ঘটনা ঘটলো; এভাবে মোট ৫০০ টাকার পণ্য বিক্রির ঘটনা ঘটলো। এখানে এসব পণ্য বিনিময়ের জন্য ৫০০ টাকা কি উপস্থিত থাকতে হবে? না, তার প্রয়োজন নেই, ৩০০ টাকাই যথেষ্ট। প্রথমে প্রকাশ কাপড় ক্রয় করে ২০০ টাকা বিনয়কে দেবে। তারপর বিনয় এই ২০০ টাকার সাথে ১০০ টাকা যোগ করে ৩০০ টাকা প্রকাশকে দেবে তার কাছ থেকে শস্য ক্রয়ের জন্য। অর্থাৎ, এখানে ২০০ টাকার মুদ্রা দুবার এবং ১০০ টাকার মুদ্রা একবার চলাচল করায় মোট ৫০০ টাকা মূল্য উশুল করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি যে পদ্ধতিতে অর্থ তাৎক্ষণিক ভাবে পরিশোধ করতে হয়, ৫০০ টাকা উশুল করার জন্য সঞ্চলনে ৫০০ টাকা উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হয় না ২টা (পণ্য) বিনিময়ের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকাই যথেষ্ট। এখানে বিক্রয় কি ঋণভিত্তিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে কম টাকা দিয়ে, এমনকি ৩০০ টাকারও কম টাকা দিয়ে বিনিময় সংঘটিত হওয়া কি সম্ভব হচ্ছে।

অর্থ যখন 'পরিশোধ মাধ্যম' হিসেবে ভূমিকা রাখে :

ধরে নিলাম, বিনয় প্রথমে প্রকাশকে ২০০ টাকার কাপড় ঋণ পদ্ধতিতে দিয়ে দিল। বিনয় ৩০০ টাকা মূল্যের শস্য প্রকাশের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে পেল। অর্থাৎ, তারা উভয়ে একে অপরের কাছে ঋণগ্রহীতা হয়ে গেল। এখানে তারা এই ঋণের একটা অংশ অর্থ ছাড়াই একে অপরকে পরিশোধ করতে পারছে। যেহেতু বিনয় ৩০০ টাকার মধ্য থেকে ২০০ টাকা প্রকাশের কাছ থেকে পেয়েছে, যা বিনয়ের পাওনা ছিল প্রকাশের কাছে, পরিশোধ করার দরকার হচ্ছে না বিধায় ২০০ টাকার উপস্থিতি সঞ্চলনে থাকা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। মাত্র ১০০ টাকা নগদে দিলেই বিনিময় সম্ভব হচ্ছে। যখন পরিশোধ করার কাজ একে অপরকে বাতিল করে, ওই টাকাটা কেবলমাত্র হিসেবে পাওয়া যায় (হিসেবের টাকা)। উভয় পক্ষের এই ঋণ পরিশোধ হবে যদি ৩০০ টাকা থেকে হিসেবে থাকা ২০০ টাকা বিয়োগ করে বিনয় ১০০ টাকা প্রকাশকে দিয়ে দেয়, যে ৩০০ টাকা বিনয় ঋণ নিয়েছে। যদি ২টা পণ্য ঋণ-ভিত্তিতে বিক্রি হয়, সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় এখানে ১০০ টাকা উপস্থিত থাকলেই যথেষ্ট হবে। এই ১০০ টাকা কেবলমাত্র একবারই চলাচল করেছে। আমরা এখন অন্য একটা উদাহরণ দেখবো।

৩ জন ব্যক্তির ঋণের চিত্রটা এমন :

প্রথম ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পরিশোধ করতে হবে – টাঃ ৯০/-
দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পরিশোধ করতে হবে – টাঃ ৫০/-
তৃতীয় ব্যক্তির জন্য প্রথম ব্যক্তিকে পরিশোধ করতে হবে – টাঃ ৮০/-
মোট ঋণ = টাঃ ২২০/-

এখানে ঋণের বিষয়টা সমাধান করতে সঞ্চলনে কি ২২০ টাকা উপস্থিত থাকতে হবে? কোন প্রয়োজন নেই। অনেক কম টাকাই যথেষ্ট হবে। কী ঘটবে সেটা জানতে, আমরা এখন এভাবে দেখতে পারি :

প্রথম ব্যক্তি ৮০ টাকা পেল; কিন্তু তাকে ৯০ টাকা পরিশোধ করতে হবে;
ফলাফল দাঁড়ালো : (−) ১০ টাকা

দ্বিতীয় ব্যক্তি ৯০ টাকা পেল; কিন্তু তাকে ৫০ টাকা পরিশোধ করতে হবে;
ফলাফল দাঁড়ালো : (+) ৪০ টাকা

তৃতীয় ব্যক্তি ৫০ টাকা পেল; কিন্তু তাকে ৮০ টাকা পরিশোধ করতে হবে;
ফলাফল দাড়ালো : (-) ৩০ টাকা

অর্থাৎ, যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি ১০ টাকা প্রথম ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়ে যায় এবং ৩০ টাকা তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে, এভাবে মোট ৪০ টাকা পেলে, ঋণের বিষয়টা

সমাধা হয়ে যাবে। এই উদাহরণে, বাস্তব অর্থ হিসেবে কেবলমাত্র ৪০ টাকা নগদে দরকার হচ্ছে, ঋণের মোট ২২০ টাকার প্রধান অংশটা এখানে 'হিসেবের টাকা' হিসেবে থেকে যাচ্ছে। যদি পণ্যসমূহের বিক্রয় ঋণ পদ্ধতির পরিবর্তে তাৎক্ষণিক পরিশোধের ভিত্তিতে ঘটে, ৪০ টাকার অনেক বেশি টাকা সঞ্চলনে আবর্তিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। সেহেতু, যদি পণ্যসমূহের ক্রয় এবং বিক্রয় 'ঋণভিত্তিক পদ্ধতি'-তে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে ঘটে, সঞ্চলনে থাকা প্রয়োজন এমন অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া সম্ভব।

যখন আমরা 'ঋণ'-এর কথা বলি, এটা একমাত্র 'পণ্য' ঋণ দেওয়া বুঝায় না, কিন্তু 'অর্থ'-কেও ঋণ হিসেবে দেওয়া বুঝায়। পণ্য দেওয়ার পরে যদি তাৎক্ষণিক ভাবে অর্থ দেওয়া না হয়, সেটাই হলো পণ্যকে ঋণ-ভিত্তিতে দেওয়া। যদি পণ্য দেওয়ার পরে টাকাটা তাৎক্ষণিক ভাবে নেওয়া না হয়, সেটাই হলো অর্থকে ঋণ-ভিত্তিতে দেওয়া। যখনই আমরা 'ঋণ' কথাটা বলি এক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

যখন আমরা সঞ্চলনে কত টাকা চলাচল করতে হবে, এই বিষয়টা দেখি, আমরা আগেই দেখতে চাই ওই সময়ে মোট যে মূল্য উশুলযোগ্য সেটা কার্যকর করতে কত টাকা সঞ্চলনে থাকতে হবে। এই নীতিটাকে আমরা আরও বিশদ ভাবে জানতে, এই বিষয়টার সাথে আরও এই প্রশ্নটা যোগ করে দেখি, প্রশ্নটা হলো সেখানে কত অর্থ ঋণ হিসেবে রয়েছে বা থাকতে হবে। যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়কালকে বিবেচনায় নিই, যেসব পণ্য ওই সময়ে বিক্রি হয়ে যায় তার মধ্যে কিছু পণ্য থাকে যেগুলো ঋণের ভিত্তিতে বিক্রি হয়, সেহেতু এর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থকে ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সঞ্চলনে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে সময়ে ওই ঋণটা পরিশোধের বিষয়টা এসে যায়, তখন কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। সুতরাং, সঞ্চলনে থাকা অর্থের পরিমাণ এসব শর্তের উপর নির্ভর করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই ২টা কার্যক্রম – পণ্যসমূহের উৎপাদন এবং উৎপাদিত সমস্ত পণ্য পরিভোগে আসা – যথাযথ ভাবে চলতে থাকে, ততক্ষণ ঋণের ভিত্তিতে বিক্রয় কার্যক্রম যথাযথ ভাবে চলতে থাকে এবং তখন সঞ্চলনকে সচল রাখতে কম অর্থের প্রয়োজন হয়। এর অর্থ হলো, ঋণ-ভিত্তিক পদ্ধতি ততক্ষণ 'ভাল' ভাবে কাজ করে যতক্ষণ সঞ্চলনের মাধ্যম সাশ্রয়ী পথ হিসেবে কার্যকর থাকে।

কম অর্থ নিয়ে সঞ্চলনে চলতে থাকা লেনদেনকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালু রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝে 'সঞ্চলনে অর্থের সংকট' এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এটা এমন প্রকৃতির সমস্যা যাকে 'অর্থ সংকট' বলা হয়!

ঋণ পদ্ধতির কারণে, বিনিময় জগতে একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। কোন ব্যক্তি কাপড় কিনে যদি তাৎক্ষণিক ভাবে অর্থ পরিশোধ না করে, কোথা থেকে পরে সে ওই টাকাটা পাবে? সে এটা দিতে পারবে তার ভুট্টা বিক্রি করে। এর অর্থ হলো, ভুট্টা-ব্যক্তিকে তার নিজের পণ্য ভুট্টা বিক্রি করার আগেই কাপড় ক্রয় করতে হবে ওই অর্থ দিয়ে যা সে ভুট্টা বিক্রি করার পরেই কেবলমাত্র পাবে। এর অর্থ হলো, ভুট্টাকে দ্বিতীয় রূপান্তরটা সম্পূর্ণ করতে হচ্ছে এমনকি প্রথম রূপান্তরটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই।

অন্য একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি, কোন ব্যক্তি ধারে কিছু অর্থ নিল, এই বলে যে এর পরিবর্তে সে পরে তার নিজের পণ্য দিয়ে দেবে। সে ওই অর্থটা দিয়ে অন্য কিছু পণ্য কিনলো। সে পরে ওই ঋণ কীভাবে পরিশোধ করবে? সে এটা পরিশোধ করবে তার পণ্য দিয়ে, পণ্যটা তৈরি হওয়ার পরে। অর্থাৎ, কোন পণ্য তৈরি হওয়ার আগেই তার বিক্রয় এবং ওই টাকাটা দিয়ে অন্য পণ্য ক্রয়ের ঘটনা এখানে ঘটছে! এর অর্থ হলো, পণ্যের দুটা রূপান্তর এখানে সংঘটিত হচ্ছে, পণ্যগুলা তৈরি হওয়ার আগেই। ঋণের ভিত্তিতে যেসব বিনিময় সংঘটিত হচ্ছে, সেখানে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে যেখানে কিছু পণ্য প্রথম রূপান্তরের আগেই দ্বিতীয় রূপান্তর সম্পূর্ণ করছে এবং কিছু পণ্য দুটা রূপান্তরই সম্পূর্ণ করছে উৎপাদিত হওয়ার আগেই। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে, পণ্য-মালিকদের দেনা এবং পাওনা পণ্যসমূহের সমগ্র সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় একে অপরের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। পাওনাগুলো – সমগ্র সমাজে যা একে অপরকে বাতিল করে দিচ্ছে – মিটিয়ে দেওয়ার পরে সময়ের প্রতি বিরতিতে একটা 'অবশেষ' তৈরি হচ্ছে এবং তারপর ওই অবশেষ পরিশোধ করতে 'বাস্তব অর্থ'-এর প্রয়োজন হচ্ছে। যখন সঞ্চলনে থাকা অর্থের পরিমাণ ওই 'অবশেষ' পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট হয় না, 'অর্থ সংকট' এই সমস্যার তখন উদ্ভব ঘটে।

'পরিশোধ মাধ্যম' (ঋণ-ভিত্তিক পদ্ধতি) হিসেবে অর্থের ভূমিকায় দ্বন্দ্ব থাকে। এই পদ্ধতি অর্থের পরিমাণে একটা বৃহৎ পরিসরের ব্যয়-সংকোচন ঘটায়। কিন্তু এই একই পরিস্থিতি অর্থ সংকটের মতো একটা মারাত্মক সমস্যারও সৃষ্টি করে।

অর্থ সংকটের মতো এই সমস্যা এমন প্রকৃতির সমস্যা সৃষ্টি করে, যাকে আপতত অর্থের দিক থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু, বাস্তবে এটা এমন এক সমস্যা যা পণ্যসমূহের দিক থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের "সংকট" অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো।

৮. বিশ্বজনীন অর্থ (Universal Money)

যে-কোন দেশকেই আমরা বিবেচনায় নিই না-কেন, ওই দেশের 'সোনা-অর্থ' (gold-money) সরকারি ব্যাংকে সংরক্ষিত থাকে এবং 'কাগজের নোট' সঞ্চলনে চলাচল করে। যদি একটা দেশের অর্থের নাম হয় 'টাকা', অন্য একটা দেশের ক্ষেত্রে এই নামটা হতে পারে 'রুপি', অন্য আর একটা দেশের জন্য এই নামটা হতে পারে 'পাউন্ড' বা 'ডলার'। এভাবে, প্রত্যেকটা দেশের অর্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে।

কোন দেশের কাগুজে-টাকা অর্থ হিসেবে কেবলমাত্র ওই দেশের সীমান্তের মধ্যেই চলাচল করে। সীমান্ত অতিক্রম করলে এই কাগজের নোট সাধারণ কাগজের টুকরো হিসেবে গণ্য হয়। দেশের বাইরে অর্থ হিসেবে এর কোন স্বীকৃতি থাকে না। এর কারণ কী? কারণ, বিশ্বের সকল দেশের জন্য একটা সরকার, একটা কোষাগার এবং একটাই অর্থের হিসেব নেই। প্রত্যেক দেশের রয়েছে তার নিজস্ব অর্থের হিসেব। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে কোন দেশের কাগজের অর্থের নিজস্ব কোন মূল্য নেই, কিন্তু যখন এই কাগজের অর্থের বা নোটের পেছনে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে 'সোনার-মজুত' সংরক্ষণ করা হয়, এই কাগজের নোট তখন মূল্য পেয়ে যায়। সেহেতু, কোন দেশের কাগুজে নোট অন্য দেশে গেলে, ওই দেশে অর্থ হিসেবে কোন স্বীকৃতি পায় না।

একটা দেশের অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তির পণ্যসমূহ অন্য কোন ব্যক্তি যেমন ক্রয় করে থাকে, ঠিক তেমনিই একটা দেশের পণ্যসমূহ অন্য একটা দেশের নাগরিকরা ক্রয় করে থাকেন। ধরে নিলাম, 'টাকা-দেশ'-এর কোন নাগরিক 'ডলার-দেশ'-এর কোন নাগরিকের কাছ থেকে কিছু কাপড় ক্রয় করলেন। এক্ষেত্রে যিনি কাপড় বিক্রি করলেন, তার কাছে টাকা-দেশের নাগরিক 'টাকার নোট' দিলে, তা গৃহীত হবে না। তাকে কাপড়ের মূল্য অনুসারে অবশ্যই সোনা দিতে হবে। ওই বিদেশি নাগরিক যদি সোনা গ্রহণ করেন, এর মানে হবে তিনি কাপড়ের পরিবর্তে অর্থ পেয়ে গেলেন।

ধরে নিলাম, টাকা-দেশের নাগরিক ডলার-দেশ থেকে কিছু পণ্য ক্রয় করলেন। যদি টাকা-দেশে সোনার মুদ্রা চালু থাকে, ডলার-দেশের নাগরিককে ওই সোনার মুদ্রা দেওয়া হলে সেটা কি গৃহীত হবে? যেহেতু মুদ্রাগুলো সোনার তৈরি তাই ওগুলো দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু, ওই সোনার মুদ্রাগুলোকে গলিয়ে সোনার দলায় পরিণত করতে হবে। কারণ কী? কারণ টাকার ওই মুদ্রাগুলো তাদের নিজস্ব আকার, নাম ও প্রতীক নিয়ে বিদেশে সঞ্চলনে চলাচলের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হবে না। সেহেতু, কোন দেশ বিদেশি মুদ্রাকে নিজের দেশের মধ্যে সঞ্চলনে থাকতে দেয় না। যদি কোন দেশ অন্য দেশকে অর্থ দিতে চায়, ওই দেশকে একমাত্র 'সোনার বার বা

তাল' দিতে হবে। অথবা যদি মুদ্রাই দেওয়া হয়, বাইরের দেশ ওই মুদ্রাগুলোকে গলিয়ে সোনায় পরিণত করবে।

ধরা যাক, টাকা-কারেন্সির নাগরিকগণ ডলার-কারেন্সির দেশ থেকে নানা ধরনের জিনিস ক্রয় করলেন। এক্ষেত্রে ডলার-কারেন্সির নাগরিকগণও টাকা-কারেন্সির দেশ থেকে নানা ধরনের জিনিস ক্রয় করতে পারেন। ধরে নিলাম, এভাবে ক্রয় এবং বিক্রয় উভয় দেশে চলতে থাকলো। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, উভয়ের দেনা-পাওনার হিসেব মিটিয়ে দেওয়ার পরেও কোন একটা দেশের কিছু পাওনা অবশ্যই থেকে যাবে। এই পাওনা একমাত্র সোনা দিয়ে মেটাতে হবে।

ধরে নিলাম, বিশ্বের সকল দেশে সোনার মুদ্রা চালু রয়েছে, প্রত্যেকটা দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে। অথবা ধরে নিলাম, বিশ্বের সকল দেশে একই কাগজের কারেন্সি চালু রয়েছে, প্রত্যেকটা দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে।

কোন নির্দিষ্ট দেশের 'অর্থের আকার' (shape of money) হলো ওই দেশের পণ্যের 'মূল্যের রূপ'। টাকা-কারেন্সির কোন দেশের যে-কোন পণ্যের মূল্য একমাত্র 'টাকার রূপ' নিয়েই কার্যকর থাকে। ডলার-কারেন্সির কোন দেশের পণ্যের মূল্য 'ডলার রূপ' নিয়েই কার্যকর থাকে। এভাবেই, একটা দেশের পণ্যের মূল্য ওই দেশের অর্থ রূপেই কার্যকর হয়। অর্থাৎ, একটা দেশের মূল্যের রূপ অন্য দেশের মূল্যের রূপের মতো একই নয়। মূল্য প্রত্যেক দেশে পৃথক আকার ধারন করে।

ধরা যাক, একটা দেশের পণ্য ওই দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে বাইরের বিশ্বে প্রবেশ করলো। এই পণ্যের পরিবর্তে যদি সোনার তাল আসতো তখন এর অর্থ কী দাঁড়াতো? এর অর্থ হলো এই যে যেহেতু ওই পণ্যটা নিজ দেশের সীমান্ত আতিক্রম করেছে, ওই পণ্যটা নিজের দেশে যে মূল্য রূপ ধারন করে ছিল সীমান্ত অতিক্রমের সময় সে ওই মূল্য রূপ পরিত্যাগ করেছে এবং 'সাধারণ সমতুল' এই রূপ ধারন করেছে (এটা হলো বিশ্বের সকল দেশের পণ্যের জন্য সাধারণ মূল্য রূপ)। অর্থাৎ, পণ্য সোনার 'তাল'-এর রূপ ধারন করলো।

'বিশ্বজনীন' অর্থ হলো ওই অর্থ যা সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত। বিশ্বজনীন বা সার্বজনীন অর্থ হলো সোনা যা কোন মুদ্রার রূপ ধারন করতে পারে না। 'সার্বজনীন অর্থ' শুধুমাত্র সোনা নয় 'রূপা'-ও।

'বিশ্বজনীন অর্থ' সমগ্র বিশ্বের জন্য 'মূল্যের পরিমাপক' হিসেবে অবস্থান করছে। এই অর্থ 'সঞ্চলন মাধ্যম' এবং 'পরিশোধ মাধ্যম' হিসেবেও সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। এই অর্থ সমগ্র বিশ্বের পণ্যসমূহের জন্য 'মূল্যের রূপ' হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে।

পরিশিষ্ট-১

বিস্তারিত সূচিপত্র

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অংশ

অধ্যায় এক

মুনাফা

১. 'মুনাফা'র প্রকৃত উৎস কী?
২. স্বাধীন উৎপাদক
৩. 'মুনাফা' নয়, কিন্তু 'উদ্বৃত্ত মূল্য'
৪. উদ্বৃত্ত মূল্য এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদন
৫. কারা নিজেদের 'উদ্বৃত্ত মূল্য' মধ্যে বন্টন করে?
৬. গ্রস এবং নেট
৭. দুইটা গ্রুপ
৮. শোসকরাও যদি শ্রম সম্পাদন করে?
৯. উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা
১০. সম্পদ কী?
১১. পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ 'মুনাফা' সম্পর্কে কী বলেন?
১২. মার্কসকে জানা!
১৩. পুঁজিপতি যার আছে ৭টা পকেট
১৪. 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে এবং পরে

অধ্যায় দুই

শ্রমশক্তির মূল্য

১. 'শ্রমশক্তি' বলতে কী বুঝায়?
২. উদ্বৃত্ত শ্রমের গোপন রহস্য
৩. 'শ্রম'-এর জন্য কীভাবে 'মূল্য' গঠিত হয়?
৪. শ্রমশক্তির নির্ধারক
৫. 'দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন' কীভাবে হিসেব করতে হবে?
৬. 'অর্থ শ্রম'-এর মূল্য
৭. 'মানসিক শ্রম' অথবা 'শারীরিক শ্রম' থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত মূল্য
৮. মজুরি থেকে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়
৯. পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা 'মজুরি' সম্পর্কে কী বলেন?

১০. মোট মজুরি যা শ্রমশক্তির মূল্য
১১. এটা কি একটা দ্বন্দ্ব নয়?
১২. মালিক বনাম শ্রমিক
১৩. কাদের জন্য বেতন?
১৪. 'শ্রমশক্তি' ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভুলটা কী?
১৫. পুঁজিপতি এবং শ্রমিকর মধ্যে মোটের উপর কোন বিনিময় ঘটে না!
১৬. শ্রমিকরাও কি একসময় বিক্রেতা এবং একসময় ক্রেতা হিসেবে দাঁড়ায়
১৭. পুঁজিপতি এবং শ্রমিকরা কি সমান?
১৮. শ্রমের মূল্য অথবা শ্রমশক্তির মূল্যের বহিঃস্থ কারণ
১৯. সকল মজুরি কি উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করে?
২০. যদি সকল মানুষ কাজ করে, তবুও বৈষম্যের সমাধান হবে না!

অধ্যায় তিন

শ্রমদান প্রক্রিয়া (উৎপাদন প্রক্রিয়া)

১. পুঁজিবাদী শ্রমদান প্রক্রিয়া (পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া)
২. পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হচ্ছে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা
৩. একমাত্র পুঁজিবাদী পদ্ধতিতেই সময় জ্ঞান শুরু হয়
৪. শ্রমের উপায় থেকে শ্রমিক শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন
৫. 'নীতি নির্ধারণ' প্রক্রিয়া থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে যেভাবে 'বিচ্ছিন্ন' রাখা হয়
৬. পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো
৭. টাকার 'অর্থ' হিসেবে ভূমিকা এবং একই সাথে অর্থের 'পুঁজি' হিসেবে ভূমিকা

অধ্যায় চার

স্থির পুঁজি এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি;

স্থায়ী পুঁজি এবং সঞ্চরণশীল পুঁজি

১. স্থির পুঁজি
২. পরিবর্তনশীল পুঁজি
৩. স্থায়ী পুঁজি
৪. সঞ্চরণশীল পুঁজি
৫. অর্থ পুঁজি
৬. উৎপাদনশীল পুঁজি
৭. পণ্য পুঁজি
৮. অগ্রসর পুঁজি
৯. স্থির পুঁজি প্রসঙ্গে আরও কয়েকটা বিষয়

১০. 'পুঁজির বিভক্তিকরণ' সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা
১১. সামাজিক পুঁজি
১২. সামাজিক সম্পদ
১৩. ধনী ও গরিবের পার্থক্য শুধুমাত্র সমগ্র মানব সমাজের জন্য প্রযোজ্য, কয়েকটা অঞ্চল বা দেশের জন্য নয়

অধ্যায় পাঁচ

উদ্বৃত্ত মূল্যের হার (শোষণের মাত্রা)

১ উদ্বৃত্ত মূল্যের হার
২. মুনাফার হার

অধ্যায় ছয়

'পণ্যের অংশগুলোর' বিবেচনায় পণ্যের মূল্যের অংশগুলো দেখা

১. পণ্যের মূল্যের বিভিন্ন অংশ এবং পণ্যের বস্তুগত বিভিন্ন অংশ
২. উৎপাদন'-এর মূল্য এবং 'মূল্য'-এর উৎপাদন

অধ্যায় সাত

কর্মদিবস (শ্রমদিবস)

১. বদলি ব্যবস্থা
২. 'পরম' উদ্বৃত্ত মূল্য এবং 'আপেক্ষিক' উদ্বৃত্ত মূল্য
৩. কীভাবে 'উৎপাদনশীলতা'র বৃদ্ধি ঘটে?
৪. উৎপাদনী শক্তির জন্য লড়াই
৫. শ্রমের ঘনীভবন (শ্রমের প্রাগাঢ়ত্ব)
৬. উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটলে প্রয়োজনীয় শ্রম সময় এবং উদ্বৃত্ত শ্রম সময়ের পরিবর্তন ঘটে
৭. বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলাফল কী?
৮. উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা কী বলেন?
৯. উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ভাল না-কি খারাপ
১০. 'নতুন' সমাজে উৎপাদনশীলতা
১১. প্রতিযোগিতা : বিভীষিকার এক জগৎ
১২. 'উদ্বৃত্ত মূল্যের হার' নিয়ন্ত্রণ করে যেসব আইন
১৩. মজুরির বিভিন্ন রূপ বা ধরন
১৪. শ্রমদিবসের 'স্বাভাবিক' দৈর্ঘ্য কত হবে?
১৫. নতুন সমাজে কর্মদিনের কি দুটো ভাগ থাকবে?

পরিশিষ্ট-২

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অংশ : পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া

১. পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং এর বিভিন্ন ধরন
২. ম্যানুফ্যাকচার
৩. মেশিন ও আধুনিক বৃহৎ শিল্প
৪. পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপস্তরের শ্রম
৫. উৎপাদনশীল শ্রম এবং অনুৎপাদনশীল শ্রম
৬. পুঁজির সম্প্রসারণ

দ্বিতীয় অংশ : পুঁজিবাদী সঞ্চলন প্রক্রিয়া

১. সঞ্চলন ব্যয়
২. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'দাম' বলতে কী বুঝায়

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অংশ : পুঁজিবাদী বিপণন ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্পর্ক

১. বণিক পুঁজি
২. লাভ-উৎপাদনী পুঁজি
৩. ভূমি খাজনা
৪. সাম্রাজ্যবাদ
৫. সংকট
৬. শ্রেণীসমূহ

দ্বিতীয় অংশ : শ্রেণীহীন সমাজ

১. নতুন সমাজ
২. মার্কসবাদ : অর্থনীতি বিজ্ঞানই নয়, দর্শনও বটে
৩. প্রলেতারিয়েত
৪. কিছু প্রসঙ্গ
৫. একটা কল্পলৌকিক চিত্র
৬. তুমি কি মার্কসবাদী হতে চাও?

প্রকাশের পথে

১. কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল : *প্রাথমিক পাঠ*, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অংশ –রঙ্গনায়াকামা

২. *ধর্ম ও বিজ্ঞান : দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস* – জন উইলিয়াম ড্রেপার

৪. *প্রচণ্ড : এক অজানা বিপ্লবী* –অনির্বাণ রায়

৫. *নেপাল বিপ্লব : গণতন্ত্র ও সংবিধান অর্জনের সংগ্রাম* –শেখর রহিম

৬. *বর্ণপ্রথামুক্তির প্রশ্নে গান্ধী, আম্বেডকর এবং মার্কস* –রঙ্গনায়াকামা

কার্ল মার্কসের বংশধারা

পিতা
হাইনরিখ মার্কস
(১৭৮২-১৮৩৮)

+

মাতা
হেনরিয়েটে প্রেসবোর্ক
(১৭৮৭-১৮৬৩)

মোরিৎসডেভিড
(জন্মের কয়েক মাস পরেই মৃত্যু)

সোফি
(১৮১৬-১৮৮৩)



কার্ল মার্কস
(১৮১৮-৮৩)

+



য়েনী (স্ত্রী)
(১৮১৪-৮১)

হারমান
(১৮১৯-১৮৪২)

হেনরিয়েটে
(১৮২০-১৮৫৬)

লুইসি
(১৮২১-১৮৬৫)



জেন্নী
জ্যেষ্ঠা কন্যা
(১৮৪৪-১৮৮৩)
+
চার্লস লঙগুয়েট
স্বামী (১৮৩৩-১৯০৩)
ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী



লরা
দ্বিতীয়া কন্যা
(১৮৪৬-১৯১১)
+
পল লাফার্গ
স্বামী (১৮৪২-১৯১১)
ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী



এডগার
(পুত্র)
(১৮৪৭-১৮৫৫)

গিডো
(পুত্র)
(১৮৪৯-৫০)

ফ্রানৎজিস্কা
(কন্যা)
(১৮৫১-১৮৫২)



এলেওনোরা
(কনিষ্ঠা কন্যা)
(১৮৫৬-১৮৯৮)
+
আভেলিং এডুয়ার্ড
স্বামী (১৮৫১-৯৮)
ইংরেজ সমাজতন্ত্রবাদী

সপ্তম সন্তান
(১৮৫৭-জন্মের কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়)

প্রিয় কার্ল, তুমি শুধু আমার জন্যই ভালো থেকো। –য়েনী

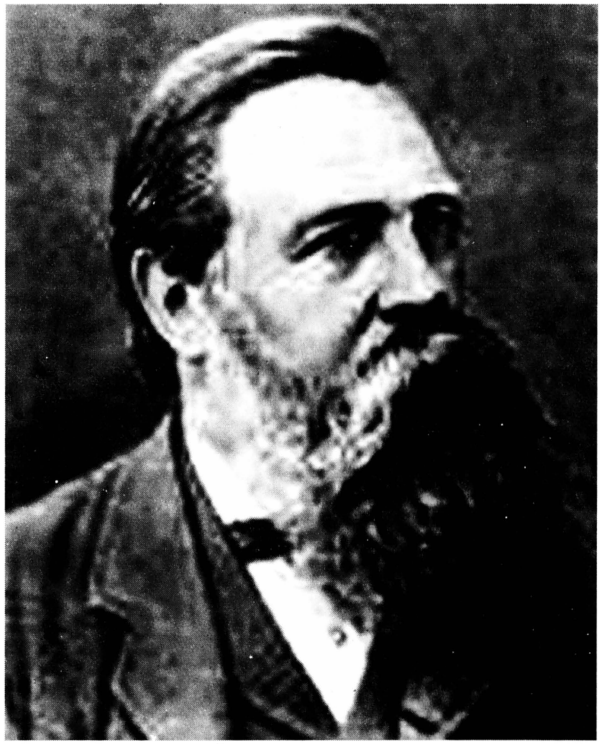
মার্কস-পত্নী য়েনী (জেনী)

জন্ম : ১৮১৪ / বিবাহ : ১৮৪৩ / মৃত্যু : ২ ডিসেম্বর, ১৮৮১

মার্কসের বিবাহিত জীবন ৩৮ বছর। জীবিতকালে দেখতে হয় স্ত্রীর যক্ষ্মায় মৃত্যু, ২ পুত্রের মৃত্যু (গিডো ১ বছরে, এডগার ৮ বছরে), ২ কন্যার মৃত্যু (ফ্রানৎজিস্কা) ১ বছরে, জ্যেষ্ঠা কন্যা জেন্নী ৩৮ বছরে)। এছাড়া সপ্তম সন্তানও ১৮৫৭ সালে জন্মের কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়।

পুত্র এডগার ও কন্যা ফ্রানৎজিস্কার মৃত্যুর পর সৎকারের অর্থ ধার করতে হয়। দারিদ্র্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্যহানি তো করেছেই সঙ্গে রোগগ্রস্তও করেছে। প্রায়ই অনাহার, অর্ধাহার অথবা রুটি ও আলু হতো পরিবারের একমাত্র খাদ্য।

এসব নিয়েই স্ত্রীর মৃত্যুর দেড় বছর বাদে ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ আরাম কেদারায় শান্তভাবে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ৬৫ বছর বয়সের কার্ল মার্কস।



অভিন্নহৃদয় বন্ধু এঙ্গেলস

মার্কস কর্তৃক এঙ্গেলসকে লিখিত চিঠি

১৬ আগস্ট, ১৮৬৭, রাত ২টা

প্রিয় ফ্রেড,

বইটির শেষ পাতাটা (৪৯ তম) সংশোধন করা এইমাত্র শেষ করেছি। পরিশিষ্টের জন্য— মূল্যের রূপ— লাগবে ছোট হরফে ১½ পাতা।

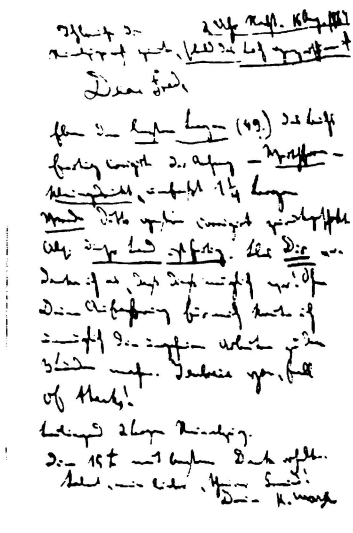
ঐটারই পূর্বভাষ সংশোধন করে গতকাল পাঠানো হয়েছে। তা হলে এই খণ্ডটা শেষ হল। শুধু তোমারই কল্যাণে এটা সম্ভব হল। তোমার আত্মত্যাগ ছাড়া আমি একা তিন খণ্ডের জন্য বিপুল কাজ সম্ভবত কখনোই করে উঠতে পারতাম না। তোমাকে আমি ধন্যবাদ সহকারে আলিঙ্গন করছি!

এই সঙ্গে সংশোধিত প্রুফের দুটি পাতা সংলগ্ন করা হল।

পরম ধন্যবাদের সঙ্গে ১৫ পাউণ্ডের প্রাপ্তিস্বীকার করছি।

অভিনন্দনসহ, প্রীতিভাজন, প্রিয় বন্ধু আমার!

তোমারই কার্ল





রঙ্গনায়াকামা